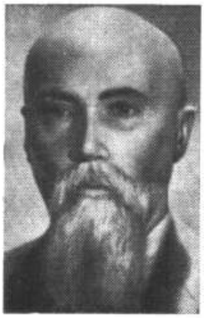
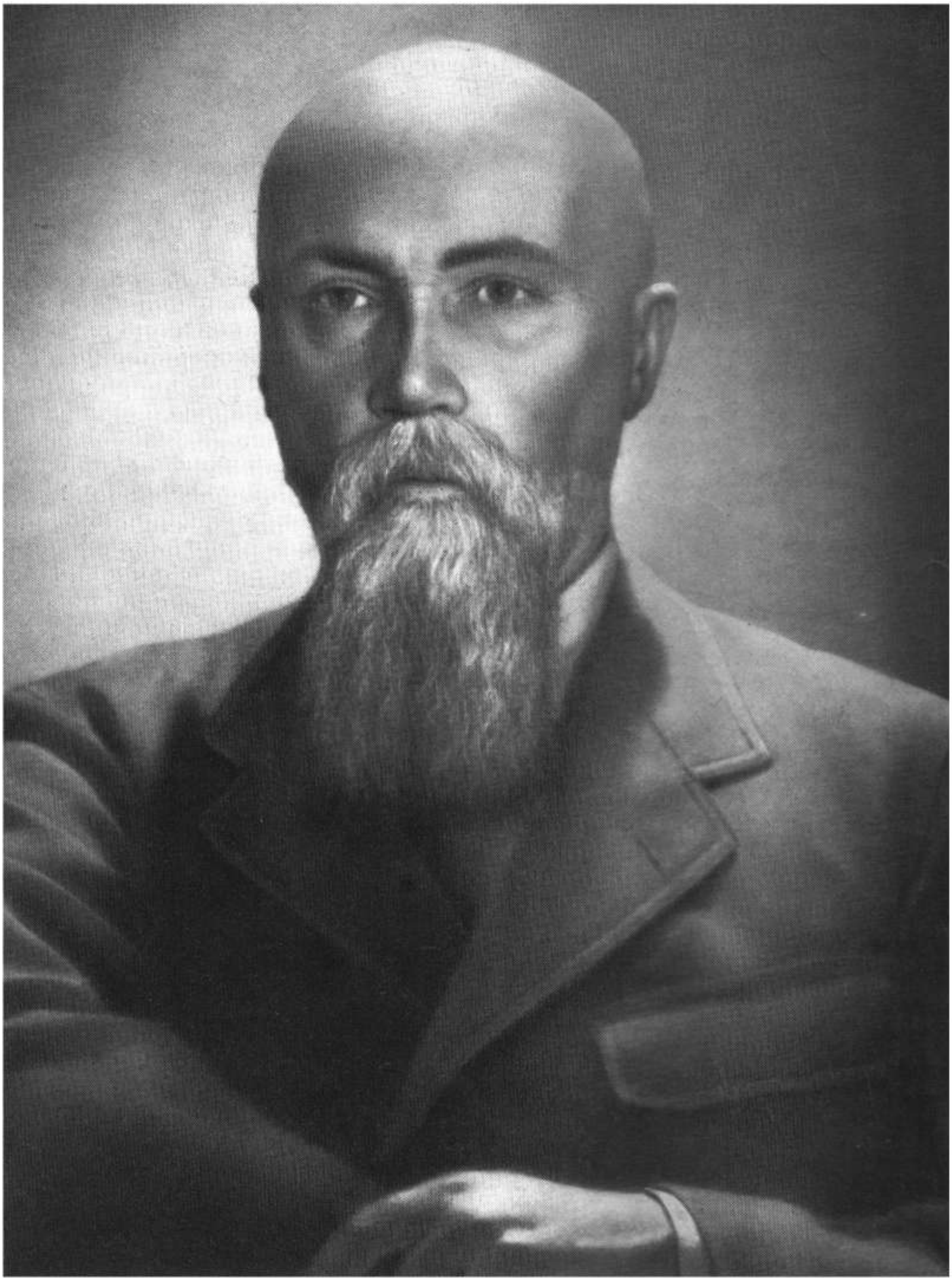
প. বেলিকভ
ভ. ক্‌নিয়াজেভা

নিকোলাই রোয়েরিখ





প্রগতি প্রকাশন · মস্কো



প. বেলিকভ
ভ. ক্‌নিয়াজেভা

নিকোলাই রোয়েরিখ

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: ভ্লাদিমির ইয়েরেমিন

П. Беликов, В. Князева
НИКОЛАЙ РЕРИХ
на языке бенгали

Б $\frac{80102-980}{014(01)-79}$ 754—79 4901000000

সূচি

ভূমিকা

রুশ শিল্পী নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। বহু দেশের সেরা মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে তাঁর ছবি, তবে শুধু তাই দিয়েই নয়, লোকে তাঁকে চেনে তাঁর ব্যাপক বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্যও, যা এ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে নিজের স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করে গেছে। বিপুল তাঁর অবদান। প্রায় সাত হাজার ক্যানভাস, তিরিশ খানেক বই; নানান ভাষায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত শত শত প্রবন্ধ ও রেখাচিত্র। গুরুত্ব তার অপরিসীম। মহাফেজখানা আর গ্রন্থাগারের তাকে তা নিষ্প্রাণ ভার মাত্র নয়, নয় অর্ধালোকিত মিউজিয়ম কক্ষে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। রোয়েরিখ রেখে গেছেন চিত্রের অক্ষয় লাবণ্য, বৃহৎ সর্বমানবিক সত্যের অন্বেষী এক উৎসুকের চিরজীবী চিন্তা। শান্তির জন্য সংগ্রামে তাঁর অক্লান্ত কর্মোদ্যোগ, জাতিতে জাতিতে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাঁর চরিতার্থ ক্রিয়াকলাপ ধারণ করে আছে ভবিষ্যৎ।

তিরোধানের পরেও রোয়েরিখের মানবিক ধ্যানধারণার বিকাশ ও প্রয়োগ অব্যাহত। ১৯৫৪ সালে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে জাতি সঙ্ঘের যে হেগ সম্মেলন বসে, তাতে গৃহীত হয় 'সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মূল্য রক্ষার আন্তর্জাতিক চুক্তি'। এই ধরনের চুক্তির কথা রোয়েরিখ প্রথম ভেবেছিলেন ১৯০৪ সালেই। তাঁর বহু বছরের অনবসন্ন প্রয়াসে তা ক্রমেই স্বীকৃতি লাভ করে অর্ধশতক পরে স্থান করে নিয়েছে আন্তর্জাতিক আইনে।

রোয়েরিখের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ ও সৃষ্টিকর্ম তাঁর সমকালীনদের এবং বিশ্বের জনসমাজের কাছে উদ্দীপ্ত সাড়া জাগায়। বড়ো দরের শিল্পী ও মনস্বী হিশেবে ক্ষণিকের মধ্যে শাশ্বতকে, অল্পের মধ্যে ভূমাকে, অংশের মধ্যে সাধারণকে তুলে ধরার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল রোয়েরিখের। স্লাভ রুস আর প্রাচ্য জনগণের সুদূর অতীত শিল্পীর তুলিতে নেয় তীক্ষ্ম বাস্তবের রূপ। রোম্যান্টিক বিভব, রূপ, যাদুকরী ওস্তাদিতেই শুধু নয়, তাঁর চিত্র দর্শকদের মুগ্ধ করে মানবিক শুভাদর্শের অন্তিম বিজয়ের বিশ্বাসেও।

যে বিশ্ব সংস্কৃতির ব্রত মানবাত্মা গড়ে তোলা, জনচেতনা জাগানো, রোয়েরিখের বহুমুখী সৃষ্টিকর্ম সেখানে স্বাধিকারে একটা শ্রদ্ধেয় স্থানের অধিকারী। ১৯৪৭ সালে দিল্লিতে রোয়েরিখের প্রদর্শনী উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রনায়ক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী জওহরলাল নেহরু বলেন: 'নিকোলাই রোয়েরিখের কথা ভাবতে গিয়ে আমি তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও

সৃষ্টিপ্রতিভার পরিসর ও ঐশ্বর্যে অভিভূত হয়ে পড়ি। বড়ো দরের শিল্পী, বড়ো দরের বিজ্ঞানী ও লেখক, পুরাতত্ত্ববিদ ও গবেষক ইনি, মানবিক প্রয়াসের বহু দিক তাঁর স্পর্শে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চিত্রের শুধু সংখ্যাটাই বিস্ময়কর, হাজার হাজার ক্যানভাস, তার প্রত্যেকটিই অপরূপ শিল্পকর্ম। রোয়েরিখের বহু ছবিতেই হিমালয় চিত্রিত, তা যখন দেখি, তখন এই যেসব পর্বত যুগ যুগ ধরে সমভূমির ওপর মাথা তুলে আছে, বহুকাল হতে যা আমাদের শান্ত্রী, তার প্রাণস্পন্দন যেন ধরা পড়ে। শিল্পীর ছবিগুলি আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধ্যানধারণা, আমাদের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক উত্তরাধিকারের এত কিছু মনে করিয়ে দেয়, এত কিছু যা শুধু অতীত ভারতের নয়, কেমন যেন চিরন্তন ও শাশ্বত, তাতে নিকোলাই রোয়েরিখের কাছে প্রভূত ঋণী বোধ না করে পারা যায় না, যিনি এ প্রাণস্পন্দনকে মুদ্রিত করেছেন তাঁর অপরূপ রচনায়।'

রোয়েরিখের 'অপরূপ একাকীত্ব' বইয়ের ভূমিকায় প্রখ্যাত ভারতীয় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: 'শিল্পের কদর যারা বোঝে, সম্ভবত তাদের মধ্যে সবচেয়ে যা মহত্তম সেই জীবনশিল্প, তা আমার সুহৃদ নিকোলাই রোয়েরিখ পরবর্তী পাতাগুলোয় প্রকাশ করেছেন বলে আমি আনন্দিত।'

জীবনশিল্প... রোয়েরিখ এটাকে তোলেন এক আশ্চর্য উচ্চতায়, বহু লেখক, শিল্পবেত্তা, গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিভিন্ন দেশের নানান মতাবলম্বী লেখক ও গবেষকদের বহু বই ও প্রবন্ধ আছে এবং লেখা হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। তাতে তুলে ধরা হয়েছে রুশী শিল্পী, বিজ্ঞানী ও মনস্বীর বহুমুখী সৃজনকর্ম, তাঁর অসাধারণ কর্মক্ষমতা। সবাই তাঁরা একটা বিষয়ে একমত — সৃজনকর্ম ও তাৎপর্যের দিক থেকে রোয়েরিখের জীবন একটা আয়ত্তে আঁটে না। তবে তার কারণ কী, সে ব্যাখ্যায় অধিকাংশ লেখকের মতামত বিভিন্ন। রোয়েরিখ বিষয়ে বিস্তীর্ণ সাহিত্যে নানাভাবে তিনি চিত্রিত, তবে কোনো কোনো বর্ণনাকে বাস্তব রোয়েরিখের প্রত্যক্ষ, অখণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মেলানো কঠিন।

লোকের, বিশেষ করে অসাধারণ গুণী লোকের অন্তর উদ্ঘাটন সহজ নয়। সাধারণ ঘটনাগুলো নিয়ে অথচ তাদের পারস্পরিক যোগাযোগের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো ভুলে গিয়ে সমার্থক যেসব সূত্রায়ন, তাতে এক্ষেত্রে কিছুই খোলসা হয় না।

ভ্রমণলিপিতে রোয়েরিখ লিখেছেন, তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা আগ্রার রাস্তায় একবার দেখেছিলেন এক বৃদ্ধ ভারতীয়কে, গালিচা পেতে তার ওপর নানান ধরনের মূর্তি রেখে সে কী একটা যন্ত্রে মন-মাতানো সুর বাজাতে থাকে। সুরের তালে তালে সেপাই, রাজা, দেবদাসী, হাতি, বাঘ, সবাই জটিল নাচে মাতল। হঠাৎ দর্শকদের একজন বললে: 'আপনার কারসাজি আমি ধরে ফেলেছি। প্রত্যেকটা পুতুলের তলায় সুতো বাঁধা আছে যে, বাজাতে বাজাতে তা আপনি নাড়াচ্ছেন।' পরে রোয়েরিখ লিখেছেন: 'অবশ্যই এটা পরিষ্কার যে পুতুলগুলো নড়াচড়া করতে পারত কেবল সুতোর জোরে, যা রঙচঙের গালিচায় অদৃশ্য... কিন্তু মায়াটা ভেঙে গেল...'

বৃদ্ধ বাজীকরের জায়গায় গালিচায় যদি বসত চাক্ষুষ সত্যের কোনো আগ্রহী, তাহলে নাচিয়ে পুতুলগুলো চুপসে যেত হতাশ হয়ে। সত্যিকারের প্রতিটি শিল্পীর আছে 'অনির্বচনীয়ের' কিছুটা অংশের অধিকার, যদিও তার সৃষ্টি, তার ক্রিয়াকলাপ স্বকালের বাস্তব সূত্রে গ্রথিত।

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখের জীবন, তাঁর বহুমুখী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক

ক্রিয়াকলাপ বিস্তৃত, তাঁর বিপুল শিল্পভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে, যেমন ছড়িয়ে আছে তাঁর সম্পর্কিত দলিলপত্র যা আজো পর্যন্ত বিশদে অনুধাবিত হয় নি। তাঁর সৃষ্টি, দার্শনিক বিশ্ববীক্ষা, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মতবিভিন্নতার আংশিক কারণ এইখানে। তাহলেও আগ্রার বিদ্বেষপরায়ণ ওই মোহনাশকের সঙ্গে এক কোঠায় পড়ার আশংকা না রেখেই বলা যায় যে রোয়েরিখ ব্যক্তিত্বের সত্যকার ধারণা মিলবে কেবল রাশিয়া যেখানে তাঁর জন্ম আর ভারতবর্ষ যেখানে তাঁর দেহাবশেষ, এই দুটি দেশের গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও তার ভবিষ্যৎ বিকাশের অধ্যয়নে।

রাশিয়ার বড়ো মানুষেরা সর্বদাই ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির অশেষ গুণগ্রাহী।

রুশ-ভারত সহযোগিতায় আমাদের দেশের বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পের বহু যশস্বী যে অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে নিকোলাই রোয়েরিখ ও তাঁর গোটা পরিবার একটা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। 'দিনলিপির পাতায়' রোয়েরিখ লিখেছেন: 'ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের সংকল্প আমার শৈশব থেকেই। 'ইজভারা' (ঈশ্বর) নামটা রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত বলে মেনেছিলেন। ইয়েকাতেরিনা'র যুগে আমাদের কাছাকাছি থাকত কে একজন হিন্দু রাজা, এই সেদিনও পর্যন্ত ছিল মোগল বাগিচার চিহ্ন। সুমহিম কী একটা পর্বতের পুরনো ছবি ছিল আমাদের বাড়িতে, সর্বদাই তা আমাকে টানত। কেবল পরে, ব্রাইন-হাডসনের বই থেকে জানতে পারি যে সেটা সুবিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘা... ১৯০৫ সাল থেকেই বহু ছবি আর স্কেচ করেছি ভারতবর্ষ নিয়ে।'

স্লাভ উপজাতিদের ইতিহাস অধ্যয়ন এবং প্রত্নবিদ্যার চর্চা প্রসঙ্গে রোয়েরিখ রাশিয়া ও প্রাচ্যের জনগণের মধ্যে যুগ-যুগের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র অনুধাবন করেছেন এবং চেয়ে দেখেছেন সুদূর দিগন্তে যার ওপাশে তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে হাতছানি দিয়েছে অপরূপ ভারতবর্ষ। শুধু তাই নয়, তিনি এও চমৎকার বুঝেছিলেন যে ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় জনগণের নিরলস সংকল্পে, প্রতিটি নতুন যুগ লোকের সামনে হাজির করে তাদের জরুরী কর্তব্য। পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিকতার জোয়াল থেকে জনগণের সৃজনী শক্তির মুক্তিকে স্বকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য জ্ঞান করেছিলেন তিনি, দূরদৃষ্টিতে দেখেছিলেন তাদের বীর্যবান বিজয়, বিশ্বাস করতেন যে তাঁর স্বদেশ ও ভারতের জনগণ হাতে হাত মিলিয়ে যাবে উত্তম ভবিষ্যতে।

তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রথম থেকেই ভারত তার হাজার হাজার বছরের মহান সংস্কৃতি নিয়ে অবিরাম টেনেছে রোয়েরিখকে। এ দেশের জন্য তাঁর উদগ্র আকর্ষণে স্বদেশের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসায় ব্যাঘাত হয় নি। রাশিয়া নাকি ভারতবর্ষ — এ বিকল্পের অস্তিত্ব ছিল না তাঁর কাছে। তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, সমস্ত সৃষ্টি দিয়ে তিনি রাশিয়া ও ভারতের জনগণের রাখীবন্ধনে সহায়তা করেছেন। স্বদেশে রোয়েরিখ সাধারণত স্মরণীয় ভারত প্রসঙ্গে আর ভারতে তাঁকে প্রায়ই বলা হয় 'রুশী গুরু'। তাঁর কথায় সুপণ্ডিত কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'তুষারাদ্রি হিমাচলের উজ্জ্বল মহাদৃশ্য তুলে ধরেছেন বলে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। রোয়েরিখ ছিলেন রুপের প্রথম রুশী রাজদূত যিনি সাম্প্রতিক ভারতের জন্য এনেছেন শিল্পের অবিনশ্বর অঞ্জলি। তাঁর অনুপ্রাণিত ভাবনা এবং রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে নৈকট্যসাধনে তাঁর সহযোগিতার জন্য আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।'

স্বয়ং রোয়েরিখ সঙ্গত কারণেই এর সঙ্গে যোগ করতে পারেন: 'আমার ছবিতে হিমালয়ের প্রশস্তি

উচ্চারণের সৌভাগ্য পেয়েছি বলে আমি গর্বিত। ভারতকে ভালোবেসে এবং নিজে রুশী হয়ে আমি এই কারণে আনন্দিত যে রুশী শিল্পে সানুরাগে শ্রদ্ধাভরে মুদ্রিত হল হিমালয়।'

রোয়েরিখ ভারতে ছিলেন তার সুকঠিন ও সগৌরব একটা যুগে, জনচেতনার জাগৃতি এবং বৈদেশিক শাসন উৎপাটনের জন্য সংগ্রামের কালে। ঔপনিবেশিকদের কবলে পড়তে হয়েছিল তাঁকে, কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। বোঝাই যায় যে তাঁর বহু সাধনাই তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, দেখে যান নি তার বাস্তব রূপায়ণ। ১৯৪৭ সালে তাঁর জীবনাবসান হয় তাঁরই জয়ধ্বনিত হিমালয়ে। তবে স্বদেশ সেবার আকুতি তাঁর সার্থক হয়েছে। স্বদেশের লোকেদের কাছে তিনি ফিরে এসেছেন তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনায়, শত শত অপূর্ব চিত্রে, এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে যে ''শেখো, শেখো, শেখো' এই নির্দেশে লেনিন মহান'। গতির জন্য, চিরন্তন দ্বান্দ্বিকতার জন্য আহ্বানে তিনি মহান। এই সচলতা, অকুতোভয়তা, অজ্ঞতা জয় — এই হল সত্যকার স্রষ্টার অনুশাসন। বিশ্বকে তার অবিরাম রূপলাভে, অনিরুদ্ধ গতিতে আমরা অধ্যয়ন করি দ্বান্দ্বিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। 'নিষ্প্রাণ কিছু একটা দিয়েই জীবনবোধকে বিষণ্ণ হতে দেওয়া চলে না।' সমস্ত মানবজাতির পক্ষে অক্টোবর বিপ্লবের নির্ধারক তাৎপর্যের কথা রোয়েরিখ তুলে ধরেছেন সর্বদাই, এ বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে প্রাচ্য জনগণের মুক্তির, তাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক দেখিয়েছেন। এই ভবিষ্যৎকে স্মরণ করেই তিনি উত্তরপুরুষদের ডেকে বলেছেন: 'যা ছিল, ছিল, ভবিষ্যৎকে তা যেন আচ্ছন্ন না করে। নৈরাশ্যবাদী হওয়া কলঙ্কের কথা। পরিপূর্ণ আস্থায় তাকাব ভবিষ্যতের দিকে। উত্তম ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখেছি বৃথা নয়। প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা তাকে আহ্বান করি। অনুভব করি যে এই অপরূপ ভবিষ্যৎটা সম্ভবপর। সম্ভবপর তা বাস্তবতার অমোঘতায়, দৈনন্দিন শ্রমের উৎকর্ষ, আনন্দিত সৃজন ও লোকহিতের প্রয়াসে। আর সাধারণের কল্যাণ, সাধারণের অরুণোদয়ের জন্য মানবিক প্রয়াস রয়েছে কম নয়। প্রতিটি উদয়ই ডাক দিচ্ছে চলো আগে, আগে, আগে!' তাঁর অটল আশাবাদ সার্থক হয়েছে পুরোপুরি, কেননা স্বীয় ঐতিহাসিক ভাগ্যের প্রতি জনগণের সক্রিয়, জীবনধর্মী মনোভাবই তার ভিত্তি। এই আশাবাদের সহচর তাঁর ভাবাদর্শীয় অনুপ্রাণনা, যাতে তাঁর ভাবদ্যোতক কাব্যাশ্রিত গোটা শিল্পভাষাই অনুরণিত। শিল্পী প্রায়ই বলতেন, 'বীরহীন জীবন দীনহীন'; তিনি লেখেন: 'আপনারা আমার শিল্পকে বলেছেন বীরশোভন বাস্তবতা। এ সংজ্ঞা আমার পক্ষে আনন্দের কথা। শৌর্য, বীর্য সর্বদাই ডাক দেয়। সত্যকার যে বাস্তববাদ জীবনের মর্মার্থকে প্রতিষ্ঠিত করে, সৃজনের পক্ষে তা অপরিহার্য। ...মানবজাতি বীর্যের সন্ধানী, লড়ে তারা, দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্যে দিয়ে যায়। ...প্রাণ চায় অপরূপের সঙ্গীত। প্রাণ সৃজন করে শ্রমে, ঋদ্ধির অন্বেষায়।'

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখ যে সম্পদ রেখে গেছেন, তার ভাগ্যচক্র চিত্তাকর্ষক। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফেরেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউরি নিকো-লায়েভিচ রোয়েরিখ। স্বদেশে পাঠাবার উদ্দেশ্যে পিতা নিজেই বাছাই এবং প্যাক করে যা রেখেছিলেন, তেমন চার শতাধিক ক্যানভাস তিনি আনেন সোভিয়েত মিউজিয়মের জন্য।

হালে সোভিয়েত ইউনিয়নে রোয়েরিখের রচনা এবং তাঁকে নিয়ে সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে অনেক। তাঁর চিত্রকর্ম ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে প্রদর্শনী, জয়ন্তী, বিদ্বৎসভার অনুষ্ঠান হয়েছে

একাধিক বার। অনন্যসাধারণ এক স্বদেশবাসীর সৃজনী ঐতিহ্যকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে সোভিয়েত জনগণ।

ভারত সম্পর্কেও সেই একই কথা। হিমালয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড, বড়ো দরের এক শিল্পীর খ্যাতি, অগ্রগণ্য মানবিক মতামত এবং ভারতের মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি তাঁর সমর্থন রোয়েরিখকে করে তুলেছে ভারতের প্রগতিশীল জনসমাজের আত্মীয়, সে দেশে তিনি লাভ করেছেন সমুচিত জনপ্রিয়তা। রোয়েরিখের নির্জন পার্বত্যাবাস নগরে বিভিন্ন কংগ্রেস ও সম্মেলনের প্রতিনিধিরা আমন্ত্রণ ও অভিনন্দন পাঠিয়েছে তাঁকে। ভারতের বহু পন্ডিত, লেখক, শিল্পী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ও যোগাযোগ রেখেছেন। ভারতীয় পত্র-পত্রিকার দরজা রোয়েরিখের জন্য ছিল সর্বদাই অবারিত। ভারতে রোয়েরিখের রচনা এবং রোয়েরিখকে নিয়ে রচনার তালিকা দিতে হলে পাতা দশেক লাগবে। সেখানে পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভূমিকা সহ 'শিল্পে আনন্দ', বি. গার্গীর ভূমিকা এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখবন্ধ সহ 'অপরূপ একাকিত্ব', রুশ প্রসঙ্গ এবং সমরকালীন দেশপ্রেমিক প্রবন্ধমালা নিয়ে 'রুশাখ্যায়িকা' নামে একটি বিশেষ অধ্যায় সহ 'হিমবাত' সংকলন, এবং 'আলোর নিলয় হিমালয়', শেষেরটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সাহিত্যকীর্তি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতবর্ষের তরফ থেকে রোয়েরিখের সৃষ্টি ও ক্রিয়াকলাপের উচ্চ মূল্যায়নে মতৈক্য খুব স্পষ্টাকারে দেখা গেছে ১৯৭৪ সালের জয়ন্তী বর্ষে যখন সারা বিশ্বে পালিত হয় এই যশস্বী শিল্পী ও মানববাদীর জন্মশতবার্ষিকী। এই উপলক্ষে বেতারে সম্প্রচারিত এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে লেখা হল:

'আধুনিক বিজ্ঞানী ও প্রাচীন প্রাজ্ঞের মিলন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। বহু বছর তিনি হিমালয়ে বাস করেছেন, এ পর্বতের প্রাণ ধরা পড়েছে তাঁর কাছে, তার বিচিত্র মেজাজ ও বর্ণসম্পাৎ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। নিকোলাই রোয়েরিখের চিত্রে আমাদের শিল্পীদের বহু নতুন ধারা অনুপ্রাণিত। এই যে মহান শিল্পী ও প্রাজ্ঞের কাছে ভারত হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ, তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলির সুযোগ আমরা পেলাম তাঁর জন্মশতবর্ষের জয়ন্তীতে।'

ভারতে এ জয়ন্তী পালিত হয়েছে সভা-সম্মেলন, বহু প্রকাশন, জয়ন্তী ডাক টিকিট এবং হিমালয়ে রোয়েরিখের গৃহাভিমুখী রাস্তাকে তাঁর নামাঙ্কিত করার মধ্যে দিয়ে।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সভাপতি, ১৯৫২—১৯৬১ সাল যাবৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত কে. পি. এস. মেনন 'ভারত' পত্রিকার জন্য লিখিত তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন এই কথায়: 'রোয়েরিখের জীবনাবসান হয় ১৯৪৭ সালে, যখন স্বাধীনতা লাভ করে ভারতবর্ষ। আরো পঁচিশ বছর বাঁচলে মানবিক ক্রিয়াকলাপের সর্বক্ষেত্রে ভারত ও রাশিয়ার নৈকট্য দেখে কী সুখীই না তিনি হতেন। এই নৈকট্যের কল্যাণেই ভারতীয় ইতিহাসের অতি সুকঠিন পর্বে স্বাক্ষরিত হয় শান্তি, মৈত্রী, সহযোগিতার ভারত-সোভিয়েত চুক্তি। জীবনের মহারণ্যে রোয়েরিখ শান্তি ও শোভার পথ কেটেছেন তুলি ও লেখনী দিয়ে যা খড়্গের চেয়ে খরতর, আমাদের এ নিষ্করুণ যুগে তাঁর জীবন তাঁর জীবৎকালের চেয়েও আমাদের কাছে বেশি অনুপ্রেরণার উৎস।'

স্বদেশভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছে একটু বিশেষ রকমের সমারোহের সঙ্গেই। মস্কোর মৈত্রী ভবনে বিদেশের সঙ্গে মৈত্রী

ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইউনিয়ন কর্তৃক সংগঠিত অধিবেশন, বলশয় থিয়েটারে সমারোহ সভা, মস্কোয় সোভিয়েত শিল্পী সঙ্ঘ এবং লেনিনগ্রাদে রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম কর্তৃক আহূত বিদ্বৎ-সমাবেশ ছিল এ জয়ন্তীর কয়েকটি অঙ্গ। এতে যোগ দেন সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিরা, সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং দূতবাসের লোকেরা, বিদেশাগত অতিথিবৃন্দ, যাঁদের মধ্যে ছিলেন পত্নী দেবিকা রাণী সহ শিল্পীর পুত্র স্‌ভিয়াতোস্লাভ রোয়েরিখ এবং বিশিষ্ট সোভিয়েত পণ্ডিত, শিল্পী, সমাজকর্মী।

জয়ন্তী উপলক্ষে রোয়েরিখের সম্মানে বেরিয়েছে পদক ও ডাক টিকিট। তাঁর জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের কাজও শুরু হয়েছে। সোভিয়েত সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিজন থেকে প্রকাশিত ও পরিবেশিত হয়েছে বহু প্রবন্ধ ও অনুষ্ঠান। রোয়েরিখের জয়ন্তী প্রদর্শনী এ দেশের শিল্পজীবনে একটা বড়ো ঘটনা। দেখানো হয়েছে তা মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, মিনস্ক, নভোসিবির্স্ক, রিগায়। স্‌ভিয়াতোস্লাভ রোয়েরিখের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে যে ১৩০টি ক্যানভাস সোভিয়েত ইউনিয়নে এই প্রথম দেখানো হল, সেটা ছিল প্রদর্শনীর একটা বিশেষ আকর্ষণ।

বড়ো রকমের জয়ন্তী প্রকাশন হিশেবে রোয়েরিখের নির্বাচিত রচনা সংকলন 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' খুবই উল্লেখযোগ্য। এতে আছে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প অকাদেমির ললিতকলার তত্ত্ব ও ইতিহাস ইনস্টিটিউট থেকে প্রস্তুত বিস্তৃত তথ্যাদির একটি পরিশিষ্ট। সংকলনের অধিকাংশ রচনাই প্রকাশিত হল এই প্রথম, তাতে শিল্পীর জীবন, ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক মতামত সম্পর্কে খবর জানা যাবে অনেক। 'বিশ শতক: পর্যটন, আবিষ্কার, গবেষণা' নামক গ্রাহক গ্রন্থমালায় রুশ ভাষায় প্রথম বেরুল রোয়েরিখের 'আলতাই-হিমালয়', ১৯২৩—১৯২৮ সালে তাঁর ভারত ও মধ্য এশিয়া ভ্রমণের ডায়েরি এটি।

ন. ক. রোয়েরিখের শিল্প, তাঁর বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকার এবং অবশ্যই তাঁর জীবন নিয়ে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের একটা উজ্জ্বল প্রকাশ তাঁর শতবর্ষ জয়ন্তী। জীবন, কেননা এই রুশী শিল্পীকে ঘিরে জমে উঠেছে বহু চমকপ্রদ জল্পনা ও কিংবদন্তী।

এই বইখানায় পাঠকেরা রোয়েরিখকে দেখবেন যে তিনি মানুষ, তাঁর সত্যি করেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে যত জনশ্রুতি ও অসিদ্ধ অনুমান আছে, তা বর্জিত হয়েছে এতে। 'অসাধারণ লোকেদের জীবনী' নামে রুশ ভাষায় যে জনপ্রিয় গ্রন্থাবলি বেরয় এটি তার অন্তর্গত। ইতিপূর্বে অজ্ঞাত দলিলপত্র, আত্মজীবনীমূলক নোট, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের স্মৃতিচারণা অবলম্বন করে খুঁটিয়ে যাচাই করা তথ্যের ভিত্তিতে ন. ক. রোয়েরিখের প্রথম জীবনী এটি। এ গ্রন্থ রচনায় স্‌ভিয়াতোস্লাভ রোয়েরিখ যে সাহায্য করেছেন তা বলার নয়। নিজের মহাফেজখানার কাগজপত্র তিনি অকাতরে তুলে দিয়েছিলেন লেখকদের হেফাজতে। সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতার ভবিষ্যৎ, যা সারা বিশ্বে শান্তি রক্ষার সহায়ক, তার সঠিক উপলব্ধি যে রোয়েরিখের ছিল, তাঁর সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের এই সম্মানীয় ক্ষেত্রটায় তিনি যে কতখানি করেছেন এসব কাগজপত্র তার পরিচায়ক।

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখের জীবন উদ্দেশ্যময়তায় অপূর্ব, বাক্যচ্ছটায় বর্ণলেপনের অপেক্ষা রাখে না তা, তাঁর নিজের এই কথাই তা ঘোষণা করে: '...জীবন সর্বদাই প্রোজ্জ্বল। জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু ভাবা যায় না।'

প. বেলিকভ

১। সবচেয়ে আগে

পিটার্সবুর্গে নামকরা লেখ্যপ্রমাণক কনস্তান্তিন ফিয়োদরোভিচ রোয়েরিখের সংসারে ১৮৭৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর (৯ অক্টোবর) নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখের জন্ম। মা মারিয়া ভাসিলিয়েভনা কালাশনিকোভা সদাগর পরিবারের লোক।

১৯৩৭ সালে নিকোলাই রোয়েরিখ যখন আত্মজীবনীমূলক রচনার কথা ভাবেন, তখন তিনি লিখেছিলেন:

'সবচেয়ে প্রথম, সবচেয়ে আগের কিছু একটা স্মরণ করতে পারলে হয়!..'

রোয়েরিখের জীবন অসংখ্য বড়ো বড়ো ঘটনায় ঠাসা, তার মধ্যে শৈশবের জবলজবলে স্মৃতি তাঁর মুছে যায় নি। তা থেকেই বোঝা যায় তাঁর অসামান্য সৃষ্টিশক্তি এসেছে কোথা থেকে।

নেভা তীরের বাড়িতে ছেলেবেলা কেটেছে রোয়েরিখের। পুরনো গানের এই কথাগুলো মিলিয়ে যায় নি তাঁর স্মৃতিতে:

> ভাসিলিয়েভ দ্বীপে রে ভাই
> মাচায় ওঠার মতো করে
> জাহাজী এই ছোকরা ছেলে
> পাল খাটাল বারোখানা।

গাইত এক বুড়ি, ছেলেমেয়েদের পরিচারিকা। দৃশ্যের দ্রুত বদলে নদীটা টানত কৌতূহলী ছেলেটিকে। জাহাজ চলে গিয়ে জলের বুকে আঁকত ছুটন্ত নকশা, অ্যাডমিরালটির দিক থেকে আসত বড়ো বড়ো বজরা। আর অন্য দিকে, সমুদ্র যেখান থেকে পাঠাত হু-হু করা বাতাসের ঝাপটা, সেখানে দেখা দিত মাস্তুলের গোলমেলে আঁকিবুঁকি। কখনো কখনো আবার দেয়াল কেঁপে উঠত, ঝনঝন করত শার্সি, জানলা দিয়ে দেখা যেত তোপ দাগার শাদা ধোঁয়া। ওটা সদ্য জলে ভাসা নতুন অনুজের জন্য যুদ্ধ জাহাজের অভিনন্দন। নদীতে গতির অবিরাম চঞ্চলতায় দেখা দেয় একদৃষ্টে দূরে তাকিয়ে থাকার অভ্যেস, দেয় বিশ্বের অসীমতার চিন্তা।

কল্পনার উন্মেষ প্রচুর খোরাক পায় গাৎচিনার ওধারে ভলোসভো স্টেশন থেকে কিছু দূরে পৈত্রিক মহাল ইজভারায়। মহালের চারিধারে ঘন বন, আপনা থেকেই চোখ চলে যায় গগনচুম্বী চুড়োগুলোর দিকে। শেষ বয়সে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ লিখেছেন: 'শৈশবের প্রথম স্মৃতিগুলোর মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে মেঘের অপরূপ নকশা। নিরন্তর গতি, অকুণ্ঠিত গঠন, প্রবল সৃজন ঊর্ধ্বে চোখ টেনে রাখত অনেকক্ষণ। অদ্ভুত সব জীবজন্তু, ড্রাগনের সঙ্গে যুধ্যমান মহাবীর, ঢেউ তোলা কেশর দোলানো শাদা ঘোড়া,

রঙীন সোনালী পাল তোলা নাও, হাতছানি দেওয়া অপচ্ছায়া পাহাড় — কী না ছিল এই অফুরন্ত, অপরিসীম ঐশ্বর্যের আকাশ-ছবিগুলোয়।'

মহাল বাড়ির কাছেই ছিল তুহিন প্রস্রবণের একটা সায়র। বরফে ঢাকা পড়ত না তা। গোটা এলাকাটাকে কাকলীতে ভরিয়ে তুলত যাযাবর পাখিরা। রোজ সকালে ঘণ্টি বাজিয়ে চরতে বেরুত গরুর পাল আর সূর্যাস্তের আগে খাশা চাবুক হাঁকিয়ে বুড়ো রাখাল তাদের ফিরিয়ে আনত আঙিনার পুরনো লম্বা গোয়ালটায়। শেকলে বাঁধা ষাঁড়গুলো তর্জন করত সেখানে। তাদের কাছে যাওয়া ছিল মানা। তবে আস্তাবলে অন্যান্য ঘোড়াদের মধ্যে থাকত ছোট্ট সোহাগী দুই টাট্টু, বেড়িয়ে আনার জন্য সর্বদাই তৈরি। মাঠ আর বনের রহস্যময় বিস্তার ছেলেটিকে টানত, বেশ লাগত আশেপাশের গ্রামগুলোর অদ্ভুত নাম: ভলোসভো, জাখোনিয়ে, জাপোলিয়ে।

ইজভারার পুরনো বাড়িটাও নিজের মতো করে মন জুগিয়েছিল, কেল্লার প্রাচীরের মতো তার মোটা মোটা দেয়াল। বড়ো হলঘরটার কোণে কোণে লাল মখমলের ডিভান। দেয়ালে ছবি। তাদের একটার সামনে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকত বালক রোয়েরিখ। সূর্যাস্তের আলোয় বহ্নিমান এক পর্বতের ছবি তাতে। পরে 'দিনলিপির পাতায়' শিল্পী লিখেছেন: '...দেখা গেল ওটা আর কিছু নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘাই। এল কোত্থেকে? কী ভাবে? হাডসনের* বইয়ে অমনি একটা কাঠ-খোদাই দেখেছি। ছবিটা কাঠ-খোদাই থেকে, নাকি কাঠ-খোদাইটাই ছবি থেকে?' সম্ভবত হিমালয় দৃশ্যটা পুরনো মহাল বাড়িতে হঠাৎ এসে পড়ে নি। দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনার সময়ে এর কিছু দূরে থাকত এক হিন্দু রাজা। তাছাড়া কারো কারো মতে 'ইজভারা' নামটারই উৎস ভারতীয়।

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ, বোন **লিদিয়া** আর ছোটো দুভাই বরিস আর ভ্লাদিমিরকে নিয়ে পিটার্সবুর্গ থেকে প্রায়ই সফরে বেরত তাঁর মা-বাপেরা। যেত ঠাকুমা আর কাকার কাছে প্রাচীন প্স্কোভ আর অস্ত্রোভ শহরে। ছোটোতেই ভবিষ্যৎ শিল্পীকে মুগ্ধ করেছিল ভেলিকায়া নদীর বারিবিস্তার, প্রাচীন ক্রেমলিনের দেয়াল, পুরনো গির্জার সিলুয়েট আর ঠাকুমার বাড়িতে রূপকথা যেমন দোলা দিত তেমন আর কোথাও হয় না। দেবপটের ছবিকে সজীব করে তোলা বাতির টিমটিমে আলোয় আধো আঁধারে ঠাকুমা এসব কাহিনী শোনাতেন।

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের একটা অনপনেয় স্মৃতি তাঁর পাঁচ বছর বয়সের ভ্রমণ। চার ঘোড়ার একটা বড়ো গাড়িতে করে তাঁরা রওনা দেন ইজভারা থেকে। সপরিবারে পৌঁছন বলটিক সাগরতীরের নামকরা স্বাস্থ্যাঞ্চল গাপসালে। পথে থামেন ইভানগোরদ কেল্লা আর নার্ভায় কঠোরদর্শন দুর্গপুরী দেখার জন্য। রেভেল শহরের টালিতে ছাওয়া খাড়াই বুরুজগুলোও অবাক করেছিল।

গাপসালে শোনা গেল কবে যেন নাইটের কেল্লার দেয়ালে গেঁথে দেওয়া একটি মেয়ের কাহিনী। সেই থেকে কেল্লা চত্বরের বিষণ্ণ মন্দিরের বাতায়নে সে দেখা দেয় কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে। নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের মা-বাপেরাও শুক্লা সুন্দরীর ছায়ামূর্তি দেখতে যান। বড়োরা অবিশ্যি পাশের জানলা দিয়ে ভেতরকার দেয়ালে এসে পড়া জ্যোৎস্না নিয়ে কীসব বলাবলি করছিলেন, তবে পুত্রের কাছে সে ব্যাখ্যা মনে হয়েছিল অস্পষ্ট ঝাপসা। তার কাছে অনেক বোধগম্য লেগেছিল মেয়েটির প্রেমে পড়া মঠের তরুণ শ্রমণ, কুটিল মঠাধ্যক্ষ, প্রেমিক যুগলের

* ব্রাইন-হাডসন ছিলেন নেপালের কাটমাণ্ডুতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট।

শোকাবহ বিয়োগ — শ্রমণের মৃত্যুদণ্ড আর জীবন্ত প্রোথিত মেয়েটির কাহিনী যা সে শুনেছিল গির্জার দ্বাররক্ষীর কাছে।

রুদ্র মধ্যযুগে এই ভ্রমণের পর ছেলেদের খেলনাপাতির মধ্যে দেখা দিতে থাকল তরোয়াল, বর্শা, বর্ম। সেগুলো কার্ডবোর্ড বা কাঠের হলেও বীরব্রতীদের নির্ভয় দ্বৈরথে বাধা হত না।

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ পড়তে শিখেছিলেন খুবই ছোটোতে। বিশেষ করে তাঁর মনে ছিল শস্তা প্রিন্টের ছবি দেওয়া কাহিনী আর স্বদেশের ঐতিহাসিক ঘটনা ও বীরপুরুষদের নিয়ে গল্পগুলো। শিশু নাট্যালয়ে গিয়ে আনন্দ মিলত প্রচুর। 'যাদু বাতি'র কুহেলি মাখা ছবিগুলো মন টানত। সহজাত সৃজনী কল্পনার বিকাশে যা প্রয়োজন তা দিতে কার্পণ্য করে নি জীবন।

নিশ্চিন্ত দিনগুলো কেটে গেল অলক্ষ্যে, আট বছর বয়সে বিদ্যালয়ের বেড়া ডিঙোলেন রোয়েরিখ। সমঝদারের দৃষ্টিতে ছেলেটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ক. ই. মাই তখন বলেছিলেন, 'প্রফেসর হবে।' বৃদ্ধ শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি ফলে যায়। বিদ্যালয় থেকেই নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের আগ্রহগুলো সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে, যেখান থেকে সূত্র গেছে চিত্রকলা, রঙ্গমঞ্চ, ইতিহাস, প্রত্নবিদ্যা, পর্যটনে। বিদ্যালয়ে আঁকা হত সাহিত্যিকদের প্রতিকৃতি, স্কুলের থিয়েটারের জন্য খসড়া রচিত হত, মানচিত্র এঁকে রঙ দেওয়া হত তাতে। 'দিনলিপির পাতায়' শিল্পী বলেছেন: 'হলুদ রঙে চিত্রিত হত গোবি মরুভূমির বালি, নরম পেন্সিলে ফোটানো হত আলতাই, তরবাগাতাই, আলাতিন-তাগ, কুন-লুন পর্বত... শাদায় রাঙানো হিমালয়ের হিমবাহ।' অভিজ্ঞ শিক্ষক ক. ই. মাই ভূগোলের ক্লাসে সুদূরের দেশ-দেশান্তর আর দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের কাহিনী শুনিয়ে পর্যটনের পিপাসা জাগিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে আর প্রায়ই রোয়েরিখ ভবনে প্রাচ্যবিদ ক. গলস্তুন্স্কি ও আ. পোজ্দ্নেয়েভের আগমনে ছেলেটির মন যায় প্রাচ্যের দেশে।

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের যখন নয় বছর পূর্ণ হয় তখন ইজভারায় আশেপাশে সন্ধান চালাবার জন্য সেখানে এসেছিলেন প্রখ্যাত প্রত্নবিদ ল. ইভানোভ্স্কি। উৎসুক ছাত্রটিকে তাঁর ভালো লেগেছিল, খননকার্যে তাঁকে সঙ্গে নিতে থাকেন। নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের কাছে প্রাচীন কালের রহস্য হয়ে দাঁড়ায় আরো বেশি আকর্ষণীয়। ইজভারার টিলাগুলো স্মরণ করে শিল্পী পরে লিখেছেন: 'নিজের হাতে খোঁড়া ছাড়া আর কিছুই কোনো উপায়েই প্রাচীন জগতের অমন অনুভবের কাছে পেণছে দিতে পারে না।'

ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ পড়াশুনা করেছেন জার্মান ভাষায়। লাতিন ও ফরাসি ভাষাও পড়ানো হত সেখানে।

থিয়েটারও রোয়েরিখকে টেনেছে ছোটো থেকেই। খেলনা নাট্যমঞ্চ বানানো হয়েছিল, তার জন্য কেনা হত নাটকের ছবি। কিন্তু তৈরি জিনিসে বেশি দিন মন উঠল না কিশোর প্রযোজকের। শিগগিরই অনুষ্ঠানের ঝুলিতে দেখা দিল শিল্লার অনুসারে স্বপ্রযোজিত 'উন্দিনা,' 'আইদা', 'আইভান্হো', আলোকসম্পাতেরও ব্যবস্থা হত, মোমবাতি আর রঙীন কাগজ লাগত সে কাজে।

সাহিত্যের প্রতি, বিশেষ করে কবিতার প্রতি অনুরাগ দেখা দেয় খুব ছোটোতেই। টুকে রাখতেন গাথা, কিংবদন্তি, লোককাহিনী, কবিতা, যা পরিণত বয়সেও মুখস্থ বলতে পারতেন রোয়েরিখ। আর নিজের রচনায় ভরিয়ে তুলতেন খাতার পর খাতা। শিকার নিয়ে তাঁর স্কেচ প্রকাশিত হত পত্রিকায়। প্রথম প্রকাশের সময় রোয়েরিখের বয়স ছিল মাত্র পনের।

পিতামহ কিছু প্রাচীন মুদ্রা দিয়েছিলেন তাঁকে, সেটা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর মুদ্রা সংগ্রহের ভিত্তি। রাস্তা পাতার জন্য পাথর ভাঙা হত, সেটাই একটা বৃহৎ মণিক ভাণ্ডারের সূত্রপাত। মহালে আসেন বিজ্ঞানী বনবিদ, ফলে বৃক্ষবিদ্যা নিয়ে মাতেন কিশোর রোয়েরিখ।

কনস্তান্তিন ফিয়োদরোভিচের নোটারি আপিস ছিল বড়োসড়ো একতলা বাসাবাড়ির সঙ্গেই, শিল্প অকাদেমি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই। তাই তাঁর মক্কেলদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পকর্মী। পারিবারিক পরিচিত মহলও গড়ে ওঠে সেই অনুসারে। ঐতিহাসিক ন. কস্তমারোভ আর বিশিষ্ট কৃষিবিদ আ. সোভেতভ, তম্স্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর করকুনোভ, পিটার্সবুর্গের প্রাচ্যবিদদের দেখা পাওয়া যেত রোয়েরিখদের বৈঠকখানায়। সেখানে শোনা যেত মেন্দেলেয়েভের গলা, সোৎসাহে তিনি শোনাতেন স্বদেশী শিল্পের বিকাশ, বেলুনে উড্ডয়ন, তাঁর নিজ 'মহলের' কথা যেখানে আসতেন শিল্পীরা। প্রায়ই তিনি বলতেন: 'সর্বোচ্চ বিকাশ হল সৃজনে, যদি শুধু অনুকরণ আর পরিভোগ করেই চলি, তাহলে মানবজাতি টিকে থাকতে পারবে না, যেমন টিকে থাকে নি ম্যামথেরা।'

রোয়েরিখদের পারিবারিক বন্ধু শিল্পী ম. মিকেশিন ১৮৯১ সালে প্রথম আঁকার দিকে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের ঝোঁকের প্রতি মনোযোগী হন। প্রতিভাবান গুরুর পরিচালনায় নিয়মিত শিল্পচর্চার শুরু তখন থেকেই। নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের নিজেরই স্বীকৃতি অনুসারে, শিল্প অকাদেমিতে ভর্তি হওয়ার কথা তিনি ভাবতে থাকেন ষোল বছর বয়স থেকেই। কিন্তু তাই বলে তাঁর আগ্রহের অন্যান্য ক্ষেত্র — ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শনের চর্চা তাঁর ছাড়া উচিত এমন কথা তরুণ রোয়েরিখ মানতে পারেন নি। একই সময়ে শিল্প অকাদেমি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস অনুষদে ভর্তি হবার সংকল্প নেন তিনি। এটাই তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল এবং পিতাকে তা বোঝাবার চেষ্টা করেন।

তবে বিদ্যালয়ের স্নাতককে কড়া করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে লেওনার্দো দা ভিঞ্চির পিতা ফ্লোরেন্সের নোটারির দৃষ্টান্ত নিকোলাই রোয়েরিখের পিতা কনস্তান্তিন ফিয়োদরোভিচের কাছে যথেষ্ট রকমের নজির নয়। তিনি, পিটার্সবুর্গের নোটারি ছেলেকে, আইন শেখাতে কৃতসংকল্প, তাঁকে করতে চান নিজের পেশার উত্তরাধিকারী, তাতে সে সংসারে দাঁড়াতে পারবে এবং দেশের কাজে লাগবে। ছবি-আঁকিয়ে নয়, রাশিয়ার প্রয়োজন সামাজিক কর্মের লোক। অতএব শিল্প অকাদেমি একেবারে খারিজ।

এই পারিবারিক সংঘাত নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের জীবনে প্রথম একটা গুরুতর পরীক্ষা। আর সেটা তিনি উত্তীর্ণ হন। আইনের অনুকূলে ইতিহাস অনুষদকে বিসর্জন দিলেও তরুণ রোয়েরিখ পিতার কাছে শিল্প অকাদেমির দাবি ছাড়েন না। একটু আগে বেড়ে বলা যাক যে তাহলেও আইন অনুষদের চেয়ে ইতিহাস অনুষদেই রোয়েরিখকে দেখা যেত বেশি, যদিও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা দিতেন প্রথমটাতেই।

১৮৯৩ সালে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ বিদ্যালয় শেষ করেন এবং সেই বছরেরই শরতে শিল্প অকাদেমির প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন, পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও ঢোকেন। শুরু হল উচ্চ শিক্ষার কাল, জীবনের প্রথম দিশাচিহ্ন যেন স্থির হয়ে গেল।

সে সময় রোয়েরিখের দৈনিক রুটিন ছিল মোটামুটি এই রকম: সকাল নটায় শয্যাত্যাগ, দশটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত শিল্প অকাদেমি, একটা থেকে তিনটে অবধি বিশ্ববিদ্যালয়, তিনটে

থেকে পাঁচটা — স্কেচ আঁকা, পাঁচটা থেকে ন'টা — সান্ধ্য ক্লাস এবং অকাদেমিতে হাতে-কলমে কাজ, ন'টা থেকে রাত বারোটা — পুস্তক পাঠ, সাহিত্য চর্চা, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, ছাত্রচক্রে অংশগ্রহণ। ছুটির দিনগুলো কাটত প্রকৃতির কোলে, প্রত্নতাত্ত্বিক খননস্থলে, শিকারে।

পরিপাটি আচার-ব্যবহার, খোলামেলা চাউনি আর অমায়িক হাসিতে ছাত্র রোয়েরিখকে বলা যেত মিশুকে। লোকের সঙ্গে তিনি আলাপ জমাতেন সাগ্রহে, ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনে কথা চালিয়ে যেতে পারতেন, লোকের সম্পর্কে বয়সোচিত কৌতূহল তাঁর ছিল, খুঁজতেন সমবয়সীদের বন্ধুত্ব। তবে বন্ধুত্বলাভ সহজ হয় নি। অত্যন্ত মিশুক হলেও নিজের 'পূততমে' প্রবেশের অধিকার তিনি এমনিতে দিতেন না অন্যকে। নীরন্ধ্র একটা দেয়ালে ধাক্কা খেত সম্ভাব্য বন্ধুরা। এ দেয়াল ভেদ করার আশকারা ছিল না 'ভিন্নধর্মীদের' জন্য। আর সে ধর্ম বড়ো বেশি কঠোর, তা গ্রহণে ইচ্ছুক মিলেছিল অল্পই।

দার্শনিক মানসিকতা আর নিজস্ব লক্ষ্যে অবিচলতার জন্য তরুণ রোয়েরিখের হাবভাব মনে হত বড়ো বেশি যুক্তিপ্রবণ, সমবয়সীদের অনাস্থা সইতে হয়েছে তাঁকে। বন্ধু লিয়ন আন্তকোল্স্কি, প্রখ্যাত ভাস্করের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁকে বলতেন: 'তুই আমাদের, অকাদেমির ছাত্রদের মতো ন'স, অবসর সময়ে সবাই যখন ঘরে বসে চা খায় কি গল্পগুজব করে তুই তখন কীসব নিয়ে কেবল খাটিস আর ভাবিস।'

অকাদেমি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থদের অবজ্ঞা থেকে যে বিবিক্তি দেখা দিয়েছিল তা বেড়ে ওঠে তাঁর চিত্রকলাচর্চায় পিতার সন্দিহান মনোভাবে। ছেলের স্কেচগুলো দেখে তিনি বলেছিলেন: 'তোরগুলো একেবারেই অন্যদের মতো নয়।' তুষারকণা যে কেবল শাদাই হবে, আকাশ হবে নীল, এ নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে হয় নি। পিতার সঙ্গে বিতর্ক তো শেষ অবধি দাঁড়াবে কেবল চিত্রকলার সমস্যায় নয়, সমাজের হিতসাধন করেই 'স্বাধীন শিল্পীর' স্বাধিকারে থাকার সম্ভাবনা আলোচনায়। আর সেটা প্রমাণ করা দরকার সর্বাগ্রে নিজের কাছেই।

তারুণ্যে অন্নের চিন্তা নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের প্রয়োজন ছিল না, তাহলেও শিল্প অকাদেমিতে ঢুকে টাকার কথাটা প্রায়ই ভাবতে হয়েছে তাঁকে। বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিটি রুবলের জন্য তাঁরই কাছে হাত পাতাটা অস্বস্তিকর, অথচ সামান্যভাবে দিনযাপনেও টাকার প্রয়োজন বেশ বেড়ে গিয়েছিল। দরকার রঙ-ক্যানভাস, বই, মুদ্রা সংগ্রহ আর মণিক ভাণ্ডার বাড়ানো, থিয়েটার কনসার্টের টিকিট। তাই ছাত্রাবস্থাতেই রোজগারের কথা ভাবতে হয় তাঁকে। কিছুটা লাভে ছবি বিক্রির মোহ তাঁকে পেয়ে বসে নি, বহু রুশ চিত্রকর যা থেকে শুরু করেছিলেন, দেবপট আঁকার সেই কাজটাই তিনি বেছে নেন।

দেবপট আঁকা ছাড়াও রোয়েরিখের উপার্জন হয় সাহিত্যকর্ম থেকে। নানা ধরনের রচনায় তিনি হাত দেন। সাহিত্যচর্চার সময় বিশেষ থাকত না, রোয়েরিখ তাই ছোটো ছোটো গল্প, স্কেচ, রূপক কাহিনী, কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হতেন না।

তরুণ রোয়েরিখের আগ্রহের কথা বলতে গিয়ে তার সঙ্গীতানুরাগের উল্লেখ না করলে চলে না। অতি শৈশবেই তার শুরু। পিতৃগৃহে আসমানী রঙের ড্রইং-রুমে ছিল পিয়ানো। তার সুর বাঁধার জন্য মাঝে মাঝে এক অন্ধ বৃদ্ধকে হাত ধরে নিয়ে আসত একটি পলকা মেয়ে। সুর বাঁধার পর বৃদ্ধ পিয়ানো বাজাত। আচ্ছন্ন করত সে সঙ্গীত, জাগিয়ে তুলত অস্পষ্ট নানা কল্প-প্রতিমা, দাবি করত তার চাক্ষুষ রূপায়ণ।

আর উচ্চশিক্ষাকালে সঙ্গীতরুচিটা নেয় সুস্পষ্ট রূপ। রিম্‌স্কি-করসাকোভ, গ্লাজুনোভ, লিয়াদোভ, আরেন্‌স্কির সঙ্গীত তাঁকে তন্ময় করত। অভিজাত সমাবেশে প্রখ্যাত বেলিয়ায়েভ সিম্ফনি কনসার্টের বরাবরকার শ্রোতা হয়ে দাঁড়ান রোয়েরিখ। নিয়মিত যেতেন সঙ্গীত ভবনে রুশ সঙ্গীত সমিতির অনুষ্ঠানে। পরে আসে ভাগনার, স্ক্রিয়াবিন, প্রকোফিয়েভের যুগ। বয়স হলেও সঙ্গীতের এ আকর্ষণ মরে নি। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে বৈজ্ঞানিক অভিযানে যাবার সময় অতিরিক্ত প্রতিটি কিলোগ্রাম বোঝা নির্মমে পরিত্যাগ করলেও রোয়েরিখ সঙ্গে নিয়েছিলেন রেকর্ড আর গ্রামোফোন।

ছাত্রাবস্থায় রোয়েরিখের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি তখনো পরিণতি পায় নি। কিন্তু অকাদেমিতে তিনি এসেছিলেন প্রাচীন রুসের প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস চর্চার জ্ঞান নিয়ে। শিল্প নাকি বিজ্ঞান, কোনটার প্রতি বেশি আকর্ষণ ছিল তরুণ রোয়েরিখের বলা কঠিন, তবে দুইয়ের মিলনে স্বকীয় শিল্পসত্তার স্বাতন্ত্র্য যে দ্রুত বিকশিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কদাচ স্বস্তি ছিল না নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের উৎসুক মানসিকতার। সামনে যে জগৎটা অবারিত তা রূপ নিতে চায় ক্যানভাসে, আবার দাবি করে আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ। অকাদেমি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা কর্মসূচিতে তাঁর তৃষ্ণা মেটার কথা নয়। বিবিধ বিষয়ে আগ্রহ তাঁর যেন অপরিসীম। পারস্যের রহস্য, দক্ষিণ আমেরিকার কুমির, গ্রীক ক্লাসিক, সবেতেই ছিল তাঁর মনোনিবেশ, পড়তেন বাল্জাক, আ. ফ্রাঁস, তলস্তোয়ের রচনা, আইনশাস্ত্র, সাধারণ ইতিহাস, শিল্পের ইতিহাস, সঙ্গীততত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে গ্রন্থ।

শিল্পী রোয়েরিখকে বিষয়বস্তুর সন্ধানে মাথা ঠুকতে হয় নি। ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ তাঁকে আক্ষরিক অর্থেই প্লাবিত করেছিল। অকাদেমিতেই কল্পিত হয়েছিল 'ভলগায় ঈগল', 'গোলন্দাজ', 'প্রার্থনায় দেয়াশিনী', 'নেতা নির্বাচন', 'অনাথ', 'ফরাসী রাজার বধূ বরণ'। এ নিয়ে অক্লান্ত কাজ শুধু ইজেলের ব্যাপার নয়, সর্বদা সেটা তাঁর কল্পনার সঙ্গে মেলে নি। রেপিনকে দেখানো একটা স্কেচ প্রসঙ্গে তাঁর তিরস্কার প্রায়ই মনে পড়ত তাঁর। অকাদেমির ছাত্রেরা তাঁকে বলত 'অর্ধদেব'। প্রায় তাণ্ডব ঘটিয়ে তিনি বলেছিলেন: 'এতেই থেমে যাওয়া চলে কি? এই রকম একটা সূত্রপাতের পর খাটতে হয় আর আপনি থেমে গেলেন! আশ্চর্য ব্যাপার যে লোকে পারে অথচ করছে না। এ যে শিল্প নয়, নেহাৎ সাধনাহীনের শখ। বড়োজোর কোনো একটা ভাব তাতে প্রকাশ পেতে পারে, তাতেও সন্দেহ আছে। ষাঁড়ের শিঙ কি এইভাবে ধরতে হয়। প্রতিটি অংশ যা আপনি একদিনে সেরেছেন, সত্যিকারের শিল্পী তা নিয়ে খাটতেন বছর, পুরো বছর!'

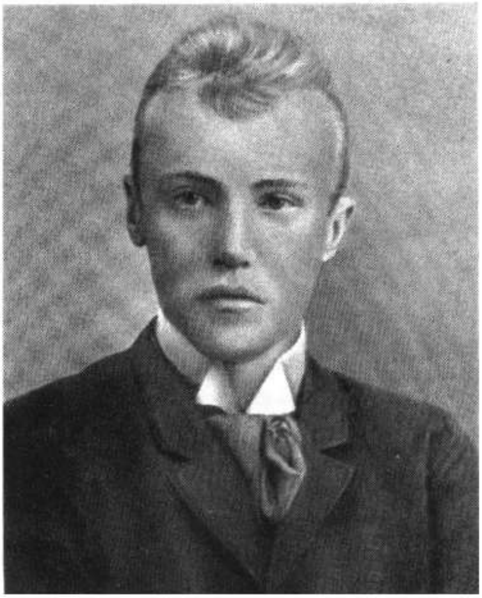
'আদর্শ' নিয়ে মাতলেও তরুণ রোয়েরিখ তাঁর বৃত্তির কৃৎকৌশলকে ছোটো করে দেখেন নি। 'হ্যাঁ, বেশ এগিয়েছেন। এখন এটা দিব্যি দাঁড়িয়েছে, খুবই আনন্দের কথা! এতখানির আশা ছিল না আমার' — রেপিনের এই কথা না শোনা পর্যন্ত তিনি অসফল স্কেচ নিয়ে খেটেছেন অবিরাম।

১৮৯৫ সালের হেমন্তে প্রকৃতি অঙ্কনের ক্লাস শেষ করে তিনি চলে আসেন আ. কুইঞ্জির স্টুডিওতে। এ'র সম্পর্কে পরে তিনি বহুবার বলেছেন: 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ নেওয়া হল অত্যন্ত সহজে। আরখিপ ইভানোভিচ হয়ে উঠলেন শুধু চিত্রকলার নয়, গোটা জীবনেরই গুরু।'

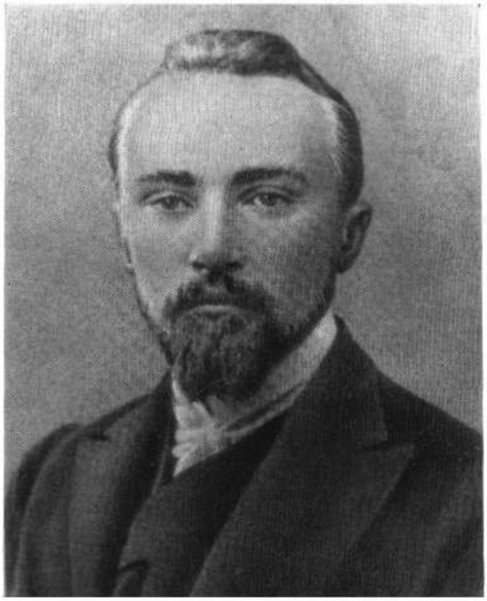
সত্যিই, শিক্ষক শিল্পী আর মানুষ হিশেবে কুইঞ্জি ছিলেন রোয়েরিখের মনের মতো। শিক্ষাদানের কোনো একটা গোঁড়া রকমের পদ্ধতি



ন. রোয়েরিখ। স. ন. রোয়েরিখ অঙ্কিত প্রতিকৃতি।



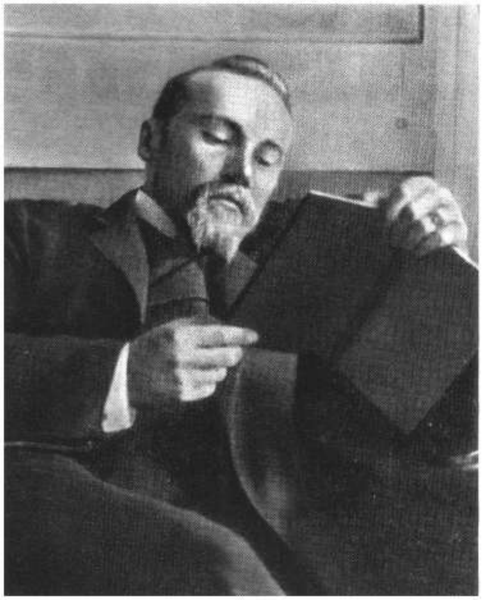
ন. রোয়েরিখ। ১৮৯৬ সাল।



ন. রোয়েরিখ। ১৯০১ সাল।



ইয়ে. ই. রোয়েরিখ। ১৯০১ সাল।



ন. ক. রোয়েরিখ। ১৯০৪ সাল।

তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। বরং যতগুলি ছাত্র, শিল্পরীতিও ততগুলি — এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। সুপ্রকট সৃজনী স্বাতন্ত্র্যে তাঁর প্রতিটি শিষ্যই যে বিশিষ্ট, সেটা অকারণে নয়। তাদের কাছ থেকে তিনি দাবি করতেন 'আভ্যন্তরিক', অর্থাৎ এমন স্বাধীন চিন্তা যাতে শিল্পকর্মের মৌলিক সম্পাদনের হদিশ মেলে।

প্রকৃতি থেকে আঁকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন কুইঞ্জি। তাঁর চেষ্টা ছিল, শিষ্যরা যেন নিসর্গের মহাগ্রন্থ পাঠের জটিল বিদ্যা আয়ত্ত করে। তবে তাঁর মতে, নিসর্গের খাতিরে শিল্পীর সৃজনী স্বাধীনতা হারানো উচিত নয়। এমনভাবে স্কেচ করার উপদেশ দিতেন তিনি, যাতে প্রকৃতি মনে গেঁথে যায়, আর আসল ছবিটা যেন আসে স্কেচ থেকে নয় 'আপনা থেকে'। শিল্পীকে নকল নয়, সৃষ্টি করতে হবে।

কুইঞ্জির এইসব ভাবনা সোৎসাহে গ্রহণ করেন নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ। 'চিন্তাপ্রতিমা' সংগ্রহের প্রথম পাঠ তিনি পান তাঁর কাছেই, বছরে বছরে যা পরিশীলিত হয়েছে ভবিষ্যৎ কম্পোজিশনের জন্য।

তাঁর শিল্পভাবনার রোম্যান্টিক উল্লাসেও উচ্ছ্বসিত হত শিষ্যরা। জীবনে ও শিল্পে সত্যের পূজারী ছিলেন তিনি, ছাত্রদের বলতেন: 'মানে... রাস্তার কাদা ফুটিয়ে তুললেই বাস্তবতা হয় না।' চিত্রকলা সর্বদাই তাঁর কাছে জীবনের কাব্যাভিব্যক্তি।

তবে তরুণদের কাছে সবচেয়ে প্রধান, সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল কুইঞ্জির মানসজগত। স্মৃতিচারণে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ লিখেছেন: 'পরাক্রান্ত কুইঞ্জি শুধু মহান শিল্পী নন, জীবনের মহাগুরুও ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অসচরাচর, একাকী, কেবল তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যরাই জানত তাঁর অন্তরের গভীরতা। ঠিক দুপুরে তিনি বাড়ির চালে গিয়ে উঠতেন আর কেল্লায় দ্বিপ্রহরের তোপ পড়তেই হাজার হাজার পাখি ছেঁকে ধরত তাঁকে। নিজের হাতে তিনি খাওয়াতেন তাঁর এই অসংখ্য সাথীদের: পায়রা, চড়ুই, দাঁড়কাক, ভারুই। মনে হত রাজধানীর সমস্ত পাখি এসে তাঁর কাঁধ, হাত, মাথা ছেয়ে ফেলেছে। আমায় বলতেন: 'কাছে আয়, আমি ওদের বলে দেব যেন ভয় না পায় তোকে।' পাখ-পাখালির কিচিরমিচিরে ভরা পলিতকেশ হাস্যময় লোকটির সে দৃশ্য অবিস্মরণীয়। আমার সবচেয়ে মূল্যবান স্মৃতির মধ্যে তার স্থান। কুইঞ্জির একটা বড়ো আনন্দ ছিল দানটা কোথা থেকে এল না জানিয়ে গরিবকে সাহায্য করা। অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর গোটা জীবন...'

'দিনলিপির পাতা'য় নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ প্রায়ই বলেছেন কুইঞ্জির কথা। তাঁর এবং পরিণত রোয়েরিখের মধ্যে মিল দেখা যাবে অনেক। সমকালীনদের কাছে দুজনেই একটা প্রহেলিকা, দুজনের ক্ষেত্রেই নিজেদের গহন মর্মানুভূতি ছিল অপরের কাছে রুদ্ধদ্বার। সমালোচনায় প্রায়ই একথা উল্লিখিত হয়েছে যে এঁদের প্রতিটি কর্মের পেছনে ছিল সুচিন্তিত লক্ষ্য। তবে তা উদ্ঘাটন প্রয়াসের স্থান নিয়েছে সাধারণত একান্ত অবিশ্বাস্য রকমের অনুমান। 'আপনার মধ্যে' কুইঞ্জির যে জগত, রোয়েরিখ অবশ্যই তার উত্তরাধিকারী ছিলেন না। গুরু ও শিষ্যের জীবনযাপন এতটা বিভিন্ন যে অভিন্ন বিশ্ববোধ সম্ভব নয়। তবে 'আপনার মধ্যে জগত' ছাড়া যে সৃজনের কথাই ওঠে না, রোয়েরিখের এ বিশ্বাস দানা বেঁধেছে কুইঞ্জির প্রভাব বিনা নয় আর সেজন্য শিষ্য চিরকাল ছিল গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞ।

২। আপন পথের সন্ধানে

১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ ভল্‌গা অঞ্চল, ক্রিমিয়া আর কিয়েভ সফর করেন। ছুটির খানিকটা কাটে পিটার্সবুর্গের আশেপাশে প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধানে। প্রতি গ্রীষ্মেই তরুণ রোয়েরিখকে দেখা যেত পিটার্সবুর্গ, প্স্কোভ, নভগোরদ গুবের্নিয়ার গ্রাম্য পথে। ক্যাঁচকেঁচে গাড়ির চালকের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে হাঁটতে এলাকার কথা, বাপ-ঠাকুর্দাদের রেওয়াজ, পরিত্যক্ত কবরখানা, পুঁতে রাখা গুপ্তধন নিয়ে আলাপের সুযোগ ছাড়তেন না কখনো।

ভালো অবস্থায় টিকে আছে এমন একটা সমাধিক্ষেত্র বা কোনো প্রাচীন শহরের চিহ্ন পাওয়া ছিল একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। সামান্য পয়সাতেই সাহায্যকারী মিলত গাঁয়ের ছোকরাদের মধ্যে। শুরু হত খোঁড়াখুঁড়ি।

আর আবিষ্কার কম এমন অনুযোগের প্রয়োজন হয় নি। হপ্তা খানেক কি দুয়েকের মধ্যেই জমে উঠত যথেষ্ট। অনস্তিত্বের তিমির থেকে উদ্ধৃত সামগ্রীগুলোয় চারিপাশের চেহারা যেত বদলিয়ে। কল্পনায় ডিঙি ভাসত নির্জন নদীতে। তার খাড়া পাড়ে খুঁটিতে খুঁটিতে করোটির মালা গাঁথা।

রোয়েরিখ লিখেছেন: 'মেঘের তল থেকে সবই দেখে কাক, দেখে পাশের টিলায় উঁচিয়ে থাকা বেড়ার ওপর দিয়ে। উজ্জ্বল ফিতের মতো এঁকেবেঁকে গেছে খরস্রোতা নদী। একটা পাড় সমতল, মেদুর শষ্প আর ঘন বনে সমাচ্ছন্ন। অন্য পাড়টা উঁচু। নদীতে নেমে গেছে খাড়াই ঢাল, ধস। ...নেহাৎ বিরল কিছু স্থানেই প্রকৃতি এমন নিপুণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে দেয়! টিলাটার ওপরেই শহর বসানো হয়... শহরটা যুদ্ধস্থল, শান্তির সময়ে কেউ সেখানে থাকে না। আরো অনেককিছু দেখেছে কাক। দেখেছে কেমন করে জ্বলেছে শহরের বেড়া, চলেছে লড়াই। কামড়াকামড়ি, কাটাকাটি চলেছে মৃত্যু পণ রেখে! আক্রমণকারী সৈন্যদলের ওপর বৃথাই ঢালা হল ফুটন্ত আলকাতরা। পতন হল নগরের। সেটা মনে রেখেছে কাক — পেট ভরে শুরু হয়েছিল তার ভূরিভোজ।'

মনে পড়ত ওলেগ আর ইগরের অভিযান, কিয়েভের যশ, মস্কোর উত্থান, স্বাধীন নভগোরদ, প্স্কোভ এলাকার সান্ত্রী শহরগুলোর কথা। বহু যুগ আগে এ ভূমির মানুষেরা চমৎকার জানত কী তাদের করা উচিত, শত্রুর হানা আসতে পারে কোন দিক থেকে, কাদের শরণাপন্ন হতে হবে সাহায্যের জন্য। শুধু তাই নয়, কর্তব্যবোধ,

মর্যাদাবোধ, সুন্দরের প্রতি অনুরাগ ছিল তাদের। মানুষের ইতিহাসে দায়িত্বশীল মোড়গুলোর সময় যা দিকনির্ণয়ের কাজ করেছে সেই সব নৈতিক ও নান্দনিক ধারণাগুলো কোথায় যেন হারিয়ে আছে যুগের গভীরে।

এই ধরনের অনুভূতি আর ভাবনা নিয়ে তরুণ রোয়েরিখ ফিরতেন তাঁর বার্ষিক তীর্থযাত্রার জায়গাগুলো থেকে। জনগণের ইচ্ছাশক্তিতে গড়া ইতিহাসের ঘটনাগুলোকে কথায়, চিত্রমালায় প্রকাশের জন্য অধীর হয়ে উঠতেন তিনি।

১৮৯৫—১৮৯৬ সালে সম্পূর্ণ হয় দুটি ক্যানভাস নিয়ে তাঁর কাজ: 'কিয়েভের মহাবীর যুগের সন্ধ্যা' আর 'কিয়েভের মহাবীর যুগের প্রত্যুষ'। চিত্রকলা হিশেবে তাতে মৌলিকতা তেমন নেই। তাহলেও রোয়েরিখের কাছে দুটি ছবিরই তাৎপর্য ছিল সমধিক। 'রুসের শুরু॥ স্লাভ' — এই প্রসঙ্গ নিয়ে পুরো একসারি ছবি আঁকায় প্রবৃত্ত হবার মতো শক্তি অনুভব করতে পারেন তিনি, যাতে পরম্পরাক্রমে জনগণের জীবনের এক-একটা ঘটনা তুলে ধরার কথা। ১৮৯৭ সালে সংরচিত পরিকল্পনা অনুসারে চিত্রমালা শুরু হয় 'স্লাভ নগর॥ বার্তাবহ: কৌলিক হানাহানি' নিয়ে। পরে দিনলিপিতে তিনি এই বিষয়বস্তুর কথা লিখেছেন:

'১) স্লাভ সম্প্রদায় (জনপদ। জমায়েত। নির্বাচিতের ভাষণ। প্রাচীন ও নবীন উপাদান-গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক।)

২) ভাগ্য গণনা (অভিযানের পূর্বে। দাজবগোভা প্রস্রবণের কাছে বৃদ্ধ ও দৈবজ্ঞ।)

৩) যুদ্ধের পর (অন্তর্দ্বন্দ্ব)।

৪) বিজয়ী (প্রথম তুষারপাত হতেই লুণ্ঠন সমেত প্রত্যাবর্তন।)

৫) পরাজিত (জারগ্রাদের বাজারে। ফলাও বাইজ্যান্টিয়ামবাসী আর বৃহৎ একটা জীবন্ত মাংসখণ্ড বন্দিজনতার বৈপরীত্য। সমরসেবী ভ্যারাঙ্গিয়ানরা।)

৬) ভ্যারাঙ্গিয়ান (সাগরবক্ষে নৌকোয়)।

৭) নৈশ অতিথি (স্লাভ লোকালয়ে ভ্যারাঙ্গিয়ানদের বাসন্তী অভিযান)।

৮) রাজা (ভেট গ্রহণ। দুর্গ। দেবমূর্তি।)

৯) দেবত্বারোপ॥ সমাধিস্তূপ।'

রাশিয়ার ঐতিহাসিক চিত্রকলায় এই ধরনের পরিকল্পনার নজির নেই, তাই আশ্চর্য নয় যে সমকালীনদের কাছে তা খুবই সাড়া জাগাবে।

১৮৯৭ সালের নভেম্বরে অকাদেমিতে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী এবং শিল্পীর ডিপ্লোমা অর্পণ। 'বার্তাবহ॥ কৌলিক হানাহানি' ছবির জন্য শিল্পীর খেতাব পান নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ আর সরাসরি প্রদর্শনী থেকেই ছবিটি সংগ্রহ করেন বিখ্যাত রুশী সংগ্রাহক প. ম. ত্রেতিয়াকোভ।

রাশিয়ার ঐতিহাসিক চিত্রকলায় নিঃসন্দেহেই একটা নতুনত্ব আনে এ ছবি। 'কৌলিক হানাহানি' — এমন একটা প্রসঙ্গে কত সার্থক দিকই না খুঁজে পান শিল্পী: অতর্কিত আক্রমণ, পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে ওঠা ঘোড়া, আড়াআড়ি বল্লম, অগ্নিকাণ্ডের শিখা... কিন্তু প্রাচীনত্ব দিয়ে ইচ্ছাকৃত মোহসৃষ্টির কোনো প্রয়াস ছিল না ছবিতে। প্রথম দৃষ্টিতে তার বিষয়বস্তু মনে হতে পারত একান্ত সামান্য, জেতবার মতো নয়। দাঁড়ীর সঙ্গে নদী বেয়ে চলেছে বার্তাবহ। অন্তর্যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সে চলেছে প্রতিবেশীদের হুঁশিয়ারি দিতে অথবা হয়ত সাহায্য যাচ্‌ঞায়। অনেক তার বয়স, জীবনে দেখেছেও সে অনেক। তাই বিপদসঙ্কুল পথে পাঠানো হয়েছে তাকে। বার্তাবহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এমনভাবে কথা কইতে হবে যাতে আস্থা অর্জন করা যায়, আবেদনে সাড়া মেলে। কৌলিক শত্রুতা সে থামাতে পারবে কি,

নাকি তা আরো প্রচন্ড হয়ে উঠবে। চিন্তার ভারে নুয়ে পড়েছে কাঁধ, কিন্তু ভীতি বা ম্রিয়মাণতার চিহ্ন নেই।

ছবির দৃশ্যপট দর্শককে নিয়ে যায় সুদূর অতীতে। তীরে দেখা যাচ্ছে বেড়ায় ঘেরা শিবিরের তীক্ষ্ম চুড়ো। কোথাও কোথাও মিটমিট করছে চুল্লির চাপা আগুন। আকাশে জ্বলজ্বলে শশীকলা। জলের সবুজ বুকের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে তার জ্যোৎস্না, ফুটিয়ে তুলেছে নৌকারোহীদের মূর্তি।

কল্পনাকে জাগরূক করে তোলে ছবিটি, দর্শকদের করে তোলে যেন বর্ণিত দৃশ্যেরই অংশী।

নবীন শিল্পীকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানান বহুভাজন সমালোচক স্তাসোভ। নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের আনন্দের সীমা ছিল না যখন ১৮৯৭ সালের নভেম্বরের শেষে তাঁর কাছ থেকে শোনা গেল:

'আপনাকে অবশ্য-অবশ্যই যেতে হবে তলস্তোয়ের কাছে! রুশ ভূমির এই মহাসাহিত্যিক স্বয়ং আপনাকে শিল্পীদের পঙক্তিতে তুলে দেবেন। সেটা হবে স্বীকৃতির মতো স্বীকৃতি। আর আপনার 'বার্তাবহ'র মূল্য তলস্তোয়ের মতো আর কেউ বুঝবে না। কী সংবাদ নিয়ে বার্তাবহ চলেছে সেটা উনি তক্ষুনি ধরে ফেলবেন। ওটা আর স্থগিত রেখে লাভ নেই। দিন দুয়ের মধ্যে আমি আর রিমস্কি-করসাকোভ মস্কোয় যাচ্ছি। চলে আসুন আমাদের সঙ্গে!'

স্বয়ং তলস্তোয়! বহুদিন থেকেই তলস্তোয়ের কথা ভেবে রোয়েরিখ আকুল বোধ করতেন। তাঁর কাছে তলস্তোয় ছিলেন শুধু রুশ সাহিত্যের মহিমার নয়, মানুষের আত্মবিজয়েরও প্রতিমূর্তি।

অতঃপর মস্কোয় তলস্তোয়ভবনে স্তাসোভ, রিমস্কি-করসাকোভ, ভাস্কর ই. গিনৎসবুর্গ আর তখনো তরুণ রোয়েরিখের তীর্থযাত্রা। শুরু হল সঙ্গীত, চিত্রকলা নিয়ে আলাপ। লেভ তলস্তোয়ের উক্তিতে আপাত বৈপরীত্য ছিল না এমন নয়, কিন্তু জীবনকে তিনি জানতেন, জানতেন লোকজনকে, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ছিল তাঁর, নিজের বিবেকের অনুশাসনে বিচারের সাহস রাখতেন।

'বার্তাবহ'রও পালা এল। ছবি সম্বন্ধে তলস্তোয় অসাধারণ কিছু বলবেন এ আশ্বাস দিয়ে স্তাসোভ ভুল করেন নি। আর সত্যিই যা শুনলেন সে কথা কেউ তাঁকে বলে নি তখনো, নিজেও তিনি তা ব্যক্ত করার মতো ভাষা খুঁজে পান নি। 'বার্তাবহ'র স্রষ্টাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলে উঠলেন তলস্তোয়:

'খরস্রোতা নদীতে পারাপার করেছেন কখনো? যে জায়গাটায় আপনার যাওয়া দরকার সর্বদাই নৌকো চালাতে হয় তা থেকে আরো উঁচুর দিকে, নইলে নদী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। নৈতিক দাবির ক্ষেত্রেও হাল ধরতে হয় উঁচুর দিকে — জীবন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আপনার বার্তাবহ হাল ধরুক উঁচুতে, তাহলে পাড়ি দিতে পারবে।'

পরের দিন সকালে রোয়েরিখ ফিরলেন পিটার্সবুর্গে, সেখানে তাঁর স্বাধীন জীবন শুরু করার কথা। ভাগ্যের আশীর্বাদ যেন লাভ করেছিলেন তিনি আর উঁচুতে হাল ধরা বিষয়ে তলস্তোয়ের উপদেশ তাঁকে অনুপ্রাণিত করল নতুন সৃজনী স্পর্ধায়।

১৮৯৮ সালে প্রলুব্ধ হবার মতো দুটি প্রস্তাব পান রোয়েরিখ — শিল্প প্রণোদন সমিতির মিউজিয়মে সহপরিচালকের পদ আর 'শিল্প ও কারুকর্ম' পত্রিকার সহসম্পাদনা। পাকা চাকুরি পাওয়ায় পরনির্ভরতা ঘুচে যেত। কিন্তু নবীন শিল্পীর আশঙ্কা হল শক্তির এরকম বিক্ষিপ্তিতে তাঁর শিল্পকর্মের ক্ষতি হবে কিনা। কুইঞ্জির পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন:

'কর্মরত লোক সবই পারে, চক্ষুষ্মান সবই দেখে আর যে অন্ধ, ছবি আঁকা তার কাজই নয়।'

শিল্প প্রণোদন সমিতির মিউজিয়মের পরিচালক দ. ভ. গ্রিগরোভিচ অতি সুপ্রসন্ন ছিলেন রোয়েরিখের ওপর। মিউজিয়মে নিয়ে এসে বৃদ্ধ সাহিত্যবিদ বলেছিলেন:

'ঢোকার মুখে মনে মনে লিখে নিন 'পবিত্র সামগ্রী বাঁচিয়ে রাখুন', লোকেদের যে উচিত পূততমকে স্মরণ করা।'

সে বছর 'প্রাচীন রুসে শিল্পীদের আইনী অবস্থা' নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা থিসিসও সমর্থন করতে হয় রোয়েরিখকে। 'বার্তাবহ'র খ্যাতি প্রফেসর এফিমভের কানে গিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পরীক্ষায় তিনি রোয়েরিখকে বলেন: 'তা রোমক আইন নিয়ে আপনার আর কী হবে, এ প্রসঙ্গে নিশ্চয় তো আর ফিরবেন না।'

তবে রোয়েরিখ ভেবেছিলেন অন্য কথা। ডিপ্লোমা থিসিস নিয়ে কাজের কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন: 'রুশী আইন, ইতিবৃত্ত, 'শতাধ্যায়ী', প্রত্নতাত্ত্বিক কমিশনের সিদ্ধান্ত, সবই কাজে লেগেছিল। প্রাচীন, সুপ্রাচীন রুসে সংস্কৃতির চিহ্ন অনেক। পশ্চিমীদের যা দেখাবার বাসনা, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য মোটেই তেমন দীন নয়।'

প্রথম দিককার ছবিগুলির পরেই দেখা দিল প্রথম দিককার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ: 'দেবপটের কুঠি', 'শিল্প ও প্রত্নবিদ্যা', 'সমাধিস্তূপে', 'ভ্যারাঙ্গিয়ান থেকে গ্রীক অবধি পথে'। বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক, ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বীয় স্মরণিকার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, প্রাচীন রুশী দেবপটের শিল্পমূল্য প্রভৃতি যেসব প্রশ্ন রোয়েরিখ এই প্রবন্ধগুলিতে তুলেছেন তার সামাজিক তাৎপর্য প্রভূত। রুশী শিল্পীদের মধ্যে প্রথম যাঁরা গুরুত্বসহকারে এবং এ বিষয়টায় যথেষ্ট দখল নিয়ে প্রাচীন দেবপট রীতির কথা লিখেছেন, রোয়েরিখ তাঁদের অন্যতম আর এটা নিঃসন্দেহেই সুসাধ্য হয়েছে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো আর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়।

মিউজিয়মের কাজ করতে করতে রোয়েরিখ রুশ প্রত্নবিদ্যা সমিতির অনেক উদ্যোগে অংশ নিতে থাকেন। প্রাচ্যে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি স্লাভ বিভাগ ছাড়াও ভারতবিদ ভ. র. রোজেন পরিচালিত প্রাচ্য বিভাগের অধিবেশনেও হাজিরা দিতেন। এইখানেই পরে খ্যাতিমান মিশরবিদ ব. আ. তুরায়েভের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এই সাক্ষাৎগুলোর কথায় রোয়েরিখ উত্তরকালে লিখেছেন: 'অনেক বিজ্ঞানীর মতোই তুরায়েভের দিন কাটত কষ্টে, কিন্তু সে কষ্ট তলিয়ে যেত বৈজ্ঞানিক উদ্দীপনার মহাসাগরে। অভিজ্ঞার জন্য উৎসাহেই তুরায়েভ টিকে ছিলেন গবেষণার তর্কাতীত উচ্চ মার্গে।'

প্রত্নবিদ্যার ক্ষেত্রটায় নিকোলাই রোয়েরিখের উৎসাহেও কখনো ভাটা পড়ে নি। অকাদেমি আর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মতো এখনো চিত্রাঙ্কন ও চাকুরির চাপেও বন্ধ হয় নি তাঁর খননক্ষেত্রে গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ।

১৮৯৮—১৮৯৯ সালে স্টাফ-বহির্ভূত অধ্যাপক হিশেবে 'পুরাবিদ্যায় শিল্প টেকনিকের প্রয়োগ' নিয়ে তিনি একটি কোর্স পড়ান প্রত্নবিদ্যা ইনস্টিটিউটে। মুখবন্ধের ভাষণে প্রত্নবিদ্যার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নটি সম্ভবত তিনিই তুললেন প্রথম। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকেলএঞ্জেলোর দৃষ্টান্ত, ল. তলস্তোয় আর জ. রেস্কিনের উক্তি থেকে তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের আঙ্গিক যোগাযোগের ভাবনাটি সুসিদ্ধ করে তোলেন। প্রত্নবিদ্যার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক উল্লেখ করে রোয়েরিখ ঐতিহাসিক

চিত্রকলার প্রসঙ্গ প্রসারিত করা এবং সমাজের কাছে শিল্পীর দায়িত্ববোধের কথা বলেন:

'শিল্পের বর্তমান বাস্তব ধারায় ঐতিহাসিক চিত্রণের পক্ষে প্রত্নবিদ্যার তাৎপর্য বেড়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। ঐতিহাসিক ছবি যাতে প্রয়োজনীয় ছাপ ফেলে, দর্শককে যাতে তা অতীত যুগে নিয়ে যায়, তার জন্যই দর্শকের অনভিজ্ঞতার ওপর ভরসা করে মন থেকে বানানো আর উৎকল্পনায় ডানা মেলা শিল্পীর পক্ষে উচিত নয়, আসলে দরকার প্রাচীন জীবনের অধ্যয়ন, যথাসম্ভব তাতে নিমগ্ন, সমূহ আচ্ছন্ন হওয়া।'

১৮৯৮ সালে রোয়েরিখ আঁকেন 'মন্ডলদের বৈঠক', এটি 'রুসের শুরু॥স্লাভ' চিত্রমালার প্রলম্বন। দেখানো হয় তা শিল্প অকাদেমিতে ১৮৯৯ সালের বাসন্তী প্রদর্শনীতে। প্রখ্যাত শিল্পী ভ. সুরিকভ আর ভ. ভাস্‌নেৎসভ সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান রোয়েরিখকে। ছবিটি প্রসঙ্গে ভ. ভেরেশ্যাগিন মন্তব্য করেন: 'প্রদর্শনীতে জিনিস বলতে ওই একটিই।' চিত্র প্রকরণের মৌলিকতা এবং ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের স্বকীয়তায় ছবিটি মনোযোগ আকর্ষণ করে। আবার সেই সঙ্গে চোখে বিঁধেছিল অঙ্কনে, বর্ণলেপনে ত্রুটি। তাঁর সৃজনী জীবনের গোড়াকার কথায় রোয়েরিখ লিখেছিলেন: 'প্রথম দিককার ছবিগুলি এঁকেছি ভয়ানক পুরু রঙ চাপিয়ে। কেউ আমায় এ বুদ্ধি দেয় নি যে ধারালো ছুরি দিয়ে চমৎকার চেঁছে ফেলা যায়, তাতে ওপরটা এনামেল করার মতো দেখাবে। সেই কারণে 'মন্ডলদের বৈঠক' ছবিটি দাঁড়ায় অমন খড়খড়ে, এমনকি খোঁচাখোঁচা। অকাদেমির কে একজন এই ধরনের খোঁচাগুলোয় সিগারেটের টুকরো সেঁটে দিত। সেগান্তিনিকে দেখে কেবল তারপরেই বোঝা গেল কিভাবে কাটলে ওপরটা এনামেল করার মতো হবে।'

সাফল্যে পায়াভারি হয় নি তরুণ রোয়েরিখের। নিজের শিল্প শিক্ষার ফাঁকগুলো তিনি টের পেতেন, ঠিক করলেন বিদেশে গিয়ে কাজ করবেন কোনো প্রখ্যাত চিত্রকর ও শিক্ষাদাতার স্টুডিওতে।

কিন্তু বিদেশ যাবার আগেই নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার ঘটে। ১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মে প্রাচীন স্মরণিকা রক্ষণের প্রশ্ন অধ্যয়নের জন্য রুশ প্রত্নবিদ্যা সমিতি তাঁকে পাঠায় প্‌স্কোভ, ত্‌ভের ও নভগোরদ গুবের্নিয়ায়। পথে বলোগোয়ে প্রিন্স পুতিয়াতিনের মহালে যান রোয়েরিখ। গৃহকর্তা ঘরে ছিলেন না, ভৃত্য তাঁকে ছায়ান্ধকার হল-ঘরে পেঁছে দিয়ে... একেবারে ভুলেই গেল তাঁর কথা।

সন্ধে গড়িয়ে আসছিল। গৃহকর্তা নিজে গিয়েছিলেন বাইরে, পরিবারের লোকজন খানিকটা হাওয়া খেয়ে সান্ধ্য ভোজনে বসেন ডাইনিং রুমে। এই সময় গৃহকর্ত্রীর তরুণী ভাগনীর হঠাৎ স্মরণ হয় যে বাড়ি ফেরার সময় দেউড়ি-হলে সে কোন একজন লোককে দেখেছে। হয়ত কাকার কাছে এসেছে সে?

লোক পাঠানো হল রোয়েরিখের জন্য। নিজের ভ্রমণের পোশাকের জন্য ইষৎ অস্বস্তি নিয়েই রোয়েরিখ দর্শন দিলেন ডাইনিং রুমে, আত্মপরিচয় দিয়ে প্রত্নবিদ্যা সমিতির বরাতের কথা জানালেন। দেখা গেল, তরুণ শিল্পীর নাম এখানকার সবার কাছে সুবিদিত, ভোজনের টেবিলে বসিয়ে শুরু হল শিল্প বিষয়ে আলাপ এবং পরিশেষে, গৃহকর্তা না ফেরা পর্যন্ত সেখানেই থেকে যাবার আমন্ত্রণ।

হল-ঘরের ছায়ান্ধকারে যে মেয়েটি রোয়েরিখকে দেখতে পেয়েছিল, রোয়েরিখের মনে সে খুবই ছাপ ফেলে। নাম তার ইয়েলেনা

ইভানোভ্না। শিল্পী এবং তাঁর ক্রিয়াকর্মে আগ্রহ তার অপরিসীম। জানা গেল, তার পিতা স্থপতি শাপোশ্‌নিকোভ মারা যান অল্প বয়সে, মায়ের সঙ্গে সে থাকে একা। মা হলেন ইয়েকাতেরিনা ভাসিলিয়েভ্না, গোলেনিশ্চেভ-কুতুজোভের বংশধর, নেপোলিয়ন-বিজেতার নাতনি।

ইয়েলেনা ইভানোভ্নার প্রতি খুবই আকর্ষণ বোধ করেন নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ। রূপ আর জ্ঞানের তৃষ্ণায় তরুণ প্রাণের আকুলতা ফুটত তাঁদের আলাপে।

পিটার্সবুর্গে হেমন্তে ফের দেখাসাক্ষাৎ হয় তাঁদের। দিনলিপিতে ১৮৯৯ সালের ৩০শে অক্টোবরে শিল্পী লিখেছেন: 'আজ স্টুডিওতে এসেছিল ইয়ে. ই.। নিজের জন্য ভয় হয়, ওর ভেতরে ভালো জিনিস অনেক। ফের ওকে ঘন ঘন দেখা, ও যেখানে আছে সেখানে থাকার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

দু'মাস পরে নতুন লিপি: 'কাল ৩০শে তারিখে ইয়ে. ই.-কে মন উজাড় করে সব বলেছি... অদ্ভুত লাগে যখন প্রথম বার শুধু নিজেকে নয় অপরকেও হিশেবের মধ্যে ধরতে হয়... এখন নববর্ষ। এ বছরে আমার পক্ষে অনেক কিছুই নতুন হওয়ার কথা।'

সত্যিই তাই, ১৯০০ সালে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর অদলবদল ঘটেছে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের জীবনে। বসন্তে প্যারিসে হয় বিশ্ব প্রদর্শনী, শিল্পকলার একটা বড়ো বিভাগ ছিল তাতে। রুশী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ব খ্যাতির অধিকারী রেপিন, সুরিকভ, শিশকিন, লেভিতান, সেরোভ, নেস্তেরভ প্রভৃতি দিক্‌পালেরা। রোয়েরিখের 'মণ্ডলদের বৈঠক' ছবিটিও স্থান পেয়েছিল সেখানে।

রোয়েরিখের কাছ থেকে পাণিপীড়নের প্রস্তাব গ্রহণ করেন ইয়েলেনা ইভানোভনা। ইচ্ছে ছিল মধুচন্দ্রিমায় একসঙ্গে বিদেশভ্রমণ করবেন। কিন্তু সেটা ঘটল না। চিত্রকলাচর্চার জন্য রোয়েরিখ প্যারিসে থাকতে পারতেন, কিন্তু বিদেশে দীর্ঘকাল যুগ্মজীবন যাপনের মতো টাকার অনটন ছিল। তাই ঠিক হল রোয়েরিখ যাবেন একা, তাঁর প্রত্যাবর্তন অবধি বিয়েটা মুলতবী থাক। হেমন্তে পিটার্সবুর্গ ছাড়লেন রোয়েরিখ।

শিল্পী লিখেছেন: 'কাজের পক্ষে এক অন্তহীন শহর... নিভৃততম প্রকৃতি ছাড়া প্যারিসের মতো আর কোথাও বোধ হয় এমন কাজ করা অসম্ভব।' নিজের প্যারিস পর্ব রোয়েরিখ শুরু করেন মিউজিয়ম, প্রদর্শনী, সালোঁ, স্টুডিওয় ঢুঁ মেরে। ফরাসী শিল্পীদের কাজেই ছিল তাঁর প্রধান আগ্রহ। তবে আদি ইম্প্রেশনিজমের ভক্ত ছিলেন না রোয়েরিখ, তার পরবর্তী শিল্পাচার্য, মেনার, লাতুশ, সিমনে, বেনার তাঁকে টানত বেশি। পিউভিস দ্যে শাভাঁ আর করমোঁ-র ছবি খুবই মুগ্ধ করেছিল তাঁকে।

আদিম লোকেদের জীবন নিয়ে প্যানেল রচনা করেছেন করমোঁ, আবার প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক হিশেবেও তিনি অগ্রগণ্য, তাই তাঁর স্টুডিওতে শিক্ষা চালিয়ে যেতে প্রবৃত্ত হন রোয়েরিখ। এখানে আঁকা তাঁর স্টাডি 'শিঙ্গাধারী লোক', 'মডেল', 'করোটি' প্রভৃতি ছবি বলিষ্ঠ, নিশ্চিত অঙ্কনে বিশিষ্ট। তাঁর সৃজনের জাতীয় দিকটা চাপা না দিয়ে শিল্পজ্ঞানের ফাঁকগুলো ভরাট করে তুলতে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন অভিজ্ঞ শিক্ষক।

রোয়েরিখের কাজ দেখে করমোঁ বলতেন: 'মৌলিক! বৈশিষ্ট্যসূচক! দিব্যি এগুচ্ছে! স্বদেশের চারিত্র্য সে টের পায়! ওর আছে একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি।'

রোয়েরিখ যখন তাঁর স্টুডিও ছেড়ে যান, বিদায়কালে তিনি বলেছিলেন: 'আপনার

মৌলিকত্ব আছে অনেক... সেটা আপনার বাঁচিয়ে রাখা উচিত।'

চিরায়ত ঐতিহ্যের পরিচয়লাভ এবং চিত্রকলার আধুনিক ধারার আরো ভালো জ্ঞানার্জনের জন্য রোয়েরিখ ফ্রান্স ছাড়াও যান হল্যান্ড ও উত্তর ইতালিতে। ইয়েলেনা ইভানোভনার কাছে অজস্র চিঠিতে তিনি বিদেশের জীবনযাত্রা, তাঁর কাজ ও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন।

তবে চিঠিতে উদ্বেগের সুরও ফুটেছে মাঝে মাঝে। তরুণ শিল্পীর সঙ্গে বাগ্‌দানের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না ইয়েলেনা ইভানোভনার আত্মীয়স্বজনেরা। চেষ্টা চলছিল ভল্‌গার এক জাহাজমালিকের লক্ষ লক্ষ টাকার একমাত্র উত্তরাধিকারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবার।

ইয়েলেনা ইভানোভনা সে কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন। উত্তেজিত হয়ে রোয়েরিখ তাঁকে লিখেছিলেন: 'বড়ো বেশি মেলামেশা থেকে শতহস্ত দূরে থেকো, নিজেকে আরো গভীরে গুটিয়ে আনো।' আর ইয়েলেনা ইভানোভনাও বুঝেছিলেন, জীবনসঙ্গী নির্বাচনে তাঁর ভুল হয় নি।

বহু বছর পরে সুদূর হিমালয়ে ১৯৪১ সালের ১০ নভেম্বর তারিখ দিয়ে রোয়েরিখ লিখেছেন: 'চল্লিশ বছর — সময়টা কম নয়। এতখানি সমুদ্রযাত্রায় বাইরে থেকে ঝড়-ঝাপটা আসতে পারে অনেক। সব বিপত্তি আমরা পেরিয়েছি একসঙ্গেই। প্রতিবন্ধকতা হয়েছে সম্ভাবনায় পরিণত। আমার বইগুলিকে আমি উৎসর্গ করেছি 'পত্নী, সখি, সহচরী, অনুপ্রেরিকা ইয়েলেনার উদ্দেশে'। এর প্রতিটি কথাই জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পিটার্সবুর্গ আর স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ব্রিটেন আর আমেরিকা, আর সারা এশিয়ায় আমরা খেটেছি, শিখেছি, বাড়িয়েছি জ্ঞানের পরিধি। সৃষ্টি করেছি একসাথে, রচনায় পুরুষ আর নারী — দুজনের স্বাক্ষর থাকা উচিত, একথা বলা হয় নি অকারণে।'

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ঠিক পরেই রোয়েরিখ আর ইয়েলেনা ইভানোভনার বিবাহানুষ্ঠান হয়। এবার পরিবার প্রতিপালনের সমস্যা এল সমস্ত গুরুত্ব নিয়ে। শুধু ছবি বেচে সংসার চালাবার ভরসা ছিল না, তাই শিল্প প্রণোদন সমিতির সচিবের শূন্য পদে দরখাস্ত দিলেন রোয়েরিখ।

শিল্প প্রণোদন সমিতির আওতায় ছিল ললিত উৎপাদন বিদ্যালয়, কারুশিল্প স্টুডিও, শিল্প-চারুকলা মিউজিয়ম, শিল্পকলা প্রদর্শনী, নিলামে বিক্রয়ের কক্ষ। প্রকাশনাও ছিল তার কাজের একটা অঙ্গ, পিটার্সবুর্গে মরস্কায়া রাস্তায় একটা বড়ো বাড়ি ছিল সেজন্য।

রোয়েরিখের এ চাকরিতে প্রয়োজন ছিল বিশেষ জ্ঞান আর সূক্ষ্ম কূটনীতি, সেটা আয়ত্ত করা সহজ ছিল না। তাঁর দিনলিপিতে আমরা পড়ি: 'বিশ্ববিদ্যালয়, অকাদেমি আর করমোঁর স্টুডিওর পর শুরু হয়েছে আরো একটা সুকঠিন পাঠ। শিল্প প্রণোদন সমিতিতে কাজের কথা বলছি আর-কি।'

সমিতির অর্থ কমিশনের সভাপতি প. ইউ. সিউজর কীভাবে তাঁকে 'কর্মদীক্ষা' দিয়েছিলেন সেটা সারা জীবনে রোয়েরিখ ভোলেন নি। রোয়েরিখকে তিনি ডেকে সমিতির বাজেটের কথা পাড়েন। তড়িঘড়ি কতকগুলো সংখ্যা দিয়ে খতিয়ান টেনে নানান পরিকল্পনার কথা বলছিলেন তিনি। কিছুই সন্দেহ না করে রোয়েরিখ শুধু মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছিলেন। এমনিধারা অবাধ আলাপ চলে কয়েক ঘণ্টা, এর পর রোয়েরিখকে তিন দিনের মধ্যে কমিটিতে বার্ষিক বাজেট পেশ করতে বলেন তিনি, যাতে থাকবে তাঁর, সিউজরের প্রস্তাবগুলো।

স্বভাবতই রোয়েরিখ তার জন্য মালমশলা

চেয়েছিলেন। কিন্তু সিউজর বললেন তাঁর কাছে কোনো নোট নেই, শুধু তাই নয়, এক্ষুনি যা বলেছেন সেটাও ফের স্মরণ করতে পারছেন না, অথচ আলাপের সময় রোয়েরিখ কিছুই টুকছেন না, সম্ভবত ভরসা করে আছেন নিজের স্মৃতির ওপর, দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন তিনি।

তাই অজ্ঞাতই রয়ে গেল, রোয়েরিখের স্মৃতি শক্তি কি অসাধারণ, নাকি সিউজরের সে শক্তির বালাই না থাকায় নির্ধারিত সময়ে নির্ভুল বাজেট দেওয়া সহজ হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

সচিব হিশেবে কাজের প্রচুর চাপ সত্ত্বেও রোয়েরিখ ছবি আঁকা চালিয়ে যান। বিদেশে এবং প্রত্যাবর্তনের ঠিক পরেই তিনি কাজ করেন 'রাঙা পাল' (১৯০০), 'পুত্তলিকা' (১৯০১), 'সিন্ধুপারের অতিথি' (১৯০১), 'দুর্লক্ষণ' (১৯০১) ছবি নিয়ে। প্যারিসেই পরিকল্পিত হয়েছিল 'মেঘাচ্ছন্ন কুমারী', 'ইয়ারিলো', 'শক', 'কালকার আমলে রুশী মৃতদেহের ওপর তাতারদের ভোজোৎসব'।

'পুত্তলিকা' নিয়ে কাজের সময় রোয়েরিখ দেশে লিখেছিলেন: ''পুত্তলিকা'গুলো নিয়ে স্কেচে আমি খুশি, স্কেচটা বেশ বলিষ্ঠ, প্রোজ্জ্বল, তাতে নাটকীয়তা বা ভাবালুতা কিছু নেই।' তাঁর আগেকার শিল্পকর্মের মতোই 'পুত্তলিকা'ও রোমান্টিকতায় চিহ্নিত। তবে নেই তাতে পদাবলিপনা, নাটুকেপনা, প্রাচীনে বিভোরতা। তার স্থান নিয়েছে সৃজনী কঠোরতা, যা প্রকৃতি-মাতার সমক্ষে আদি মানবের বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক।

এ ছবিতে আছে কাঠের অটুট খুঁটি ঘেরা এক পৌত্তলিক দেবস্থান। তার মাঝখানে দারুময় দেবমূর্তি, আশেপাশে ছোটোখাটো আরো কিছু প্রতিমা। পৌত্তলিক দেবালয়ে এসেছে পলিতকেশ বৃদ্ধ। তরণীর গতি আর করোটির নিশ্চল দন্তবিকাশ থেকে সে বোঝে জীবন ও মৃত্যুর ঐক্য। অস্তিত্বের এই সত্যোপলব্ধিতে সে আর ভয় পায় না।

এইরূপে অখণ্ড একটা বিশ্ববীক্ষাকে শিল্পী বলেছেন 'সুস্থ পৌত্তলিক মনোবৃত্তির' ফল। এই মনোবৃত্তিকে প্রকট ও বিশ্বাস্য রূপ দেবার দুরূহ কর্তব্য নিয়েছিলেন রোয়েরিখ এবং তাতে তিনি সার্থক হন। মণ্ডলাকার বিন্যাস, সাধারণীকৃত রেখা, বর্ণের ছন্দিত ঘনতায় ছবিটি পেয়েছে এক অটুটতা। এতে শুধু বর্ণ নয়, বিন্যাসেরও এক মৌলিক সমাধানে পৌঁছেছেন রোয়েরিখ। 'বার্তাবহ' ছবির শৈলী থেকে 'পুত্তলিকা'র আলঙ্কারিক ঝঙ্কার খুবই পৃথক। এদিক দিয়ে 'পুত্তলিকা' শিল্পীর সৃজনে একটা নতুন পর্যায়। একে বলা যায় জাতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যের সঙ্গে পশ্চিমের কিছু সাম্প্রতিক শিল্পগুরুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংশ্লেষ।

যেসব শিল্পী বিদেশে চলে যেত তাদের প্রসঙ্গে 'পুত্তলিকা' নিয়ে কাজের দু'বছর আগে রোয়েরিখ লিখেছিলেন: 'ছুটছে কে জানে কোথায়, ডুব দিচ্ছে বিজাতীয় সাগরে, শিক্ষা নিচ্ছে না, চেষ্টা করছে অপরের ধাঁচে নিজেকে ঢেলে সাজতে, অপরের পোশাকটা পরতে আর কয়েক বছর বাদে ফেরে ছাঁট-কাট সমান হয়ে, স্বজন থেকে দূরে, অপরের সঙ্গে পাতলা রশিতে বাঁধা।' নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের বেলায় এটা ঘটে নি।

১৯০১ সালে রোয়েরিখ শেষ করেন 'সিন্ধুপারের অতিথি'। ১৮৯৯ সালেই তিনি 'মহাজলপথে' নভগোরদ গিয়েছিলেন। লিখেছিলেন: 'এই জায়গাগুলো দিয়েই ভ্যারাঙ্গিয়ানদের নৌকো ভেসেছিল ভাবতে অদ্ভুত লাগে, ভয়-ভয় করে।' 'সিন্ধুপারের অতিথি'র বিষয়বস্তু দানা বাঁধে তখনই।

'নৌকো বেয়ে আসছে উত্তরী অভ্যাগতরা।

উজ্জ্বল ফিন উপসাগরের উপকূল। জল যেন ঝলমলে বসন্ত আকাশের নীলিমায় আকণ্ঠসিঞ্চিত, তার ওপর ঝিরঝিরিয়ে বইছে বাতাস, ম্যাড়মেড়ে বেগুনী ফালি আর বস্তুগুলোকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এক ঝাঁক সিন্ধুচিল নেমে নিশ্চিন্তে দুলতে লাগল ঢেউয়ের ওপর, শুধু সামনের নৌকোর একেবারে গলুইয়ের কাছে ঝলকাচ্ছে তাদের ডানা — অচেনা, অদেখা কী একটা যেন সচকিত করে তুলেছে তাদের শান্তিময় জীবন। অচলায়তন জলের ওপর দিয়ে ছুটছে নতুন একটা স্রোত, যুগ-যুগের স্লাভ জীবনের ওপর দিয়ে তা বইছে। ছুটবে তা বন আর জলা ভেদ করে, গড়িয়ে যাবে প্রশস্ত মাঠ দিয়ে, উত্থিত করবে স্লাভকুলকে — দেখবে তারা বিরল, অপরিচিত অভ্যাগতদের, অবাক হবে তাদের সমরসজ্জায়, সিন্ধুপারের আদব-কায়দায়। লম্বা সারি বেঁধে চলেছে নৌকো, ড্রাগনের উঁচু নাকে সুসমাপ্ত গলুইগুলো বাঁক নিচ্ছে চটপট।'

'সিন্ধুপারের অতিথির' সাহিত্যিক ও শৈল্পিক ভাষ্য অধিকাংশ খুঁটিনাটিতে হুবহু পরস্পরের পুনরাবৃত্তি, এতে বোঝা যায় রোয়েরিখের শিল্প-ভাবনা কী আশ্চর্য সুনির্দিষ্ট।

'পুত্তলিকা' প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তার অনেকটাই 'সিন্ধুপারের অতিথি' সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তবে তার সঙ্গে উপরন্তু যোগ করা উচিত যে শেষোক্ত ছবিতে রোয়েরিখ ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে তার নান্দনিক আদর্শের যোগাযোগ উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন, যা থেকে আবার একটা নতুন বাস্তবতার — শিল্পকর্মের স্বয়ম্ভর মূল্যের জন্ম। রোয়েরিখের প্রত্যয়জনক বর্ণাঢ্য মৌলিক শৈলী, এবং ঐতিহাসিক সত্য রক্ষার কল্যাণে বহুবিগত পরিণত হয়েছে চিরায়মানে। এই পরিণতির যাদু রোয়েরিখ সংগ্রহ করেছেন লৌকিক শিল্পের সৌন্দর্য আর প্রোজ্জ্বল আলঙ্কারিকতা থেকে। উঁচু দরের দক্ষতায়, নতুন অন্বেষায় 'সিন্ধুপারের অতিথি' চিহ্নিত, তবে বোধ হয় স্বয়ং শিল্পীর কথাতেই তার সেরা পরিচয় মিলবে:

'অর্বাচীনতা ও বন্যতা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে জনগণকে, ভগ্নস্তূপ আর সহর্ষে পাওয়া আকরিক থেকে গড়ে তুলতে হবে মহান মুক্তি, সমুন্নত সৌন্দর্য ও গভীর জ্ঞানের ক্রেমলিন।'

'পুত্তলিকা' আর 'সিন্ধুপারের অতিথি'র সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী 'দুর্লক্ষণ' ছবিটির কথাও ভাবেন, ১৯০১ সালে এটি তিনি সম্পূর্ণ করেন দেশে ফিরে।

এ ছবি নিয়ে খাটা উপলক্ষে তিনি জলরঙে আঁকেন 'দূরেদ্রষ্টা' এবং 'বায়স' নামে একটি ড্রয়িং। প্রথম ছবিতে রোয়েরিখ কাঠের গুঁড়ির প্রাচীর ঘেরা বুরুজ তোলা একটি প্রাচীন শহরের দৃশ্য ফুটিয়েছিলেন, তাতে প্রধান হয়ে ছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খাদ্যের আশায় উন্মুখ এক ঝাঁক কাক।

ছবিতে রোয়েরিখ এইটেই ফুটিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কী যেন মনে হয় তাঁর। ক্যানভাসের ঊর্ধ্বাংশে যে স্লাভ নগরের ছবি ছিল, সেটা স্রেফ ছেঁটে ফেলেন তিনি। তাতে চিত্রবিন্যাসের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল কাক। তবে তারা আর মানুষের দুর্ভাগ্য ঘোষকরূপী কাক নয়, নিজেরাই মূর্তিমান অশুভ। গোটা দৃশ্যটাকে নতুন করে আঁকেন শিল্পী। দেখা দিল সমুদ্রের নিষ্করুণ তীর, ভ্রূকুটিত নিচু আকাশ, দিগন্তে জাহাজের সিলুয়েট। আর তীরে পাথরগুলোর মধ্যে কালো হয়ে আছে নিরানন্দ এক ঝাঁক কাক। ঐতিহাসিক পরিবেশ বিলুপ্ত করে রোয়েরিখ অতীত থেকে বর্তমানে নিয়ে এসেছেন একটা ভয়াবহ উদ্বেগবোধ, যা সে সময়কার সামাজিক মানসিকতার পরিচায়ক। এই কারণে 'দুর্লক্ষণ' ছবিটি রোয়েরিখের সৃষ্টিজীবনের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ, ইচ্ছে করেই

এতে তিনি বক্তব্যের ঐতিহাসিক পরিবেশন থেকে বিরত থেকেছেন।

১৯০০—১৯০২ সালে রোয়েরিখ যেসব ছবি আঁকেন, তা দর্শক সমালোচক উভয়েরই প্রশংসা লাভ করে। 'শিল্প জগৎ' নামক শিল্পীগোষ্ঠীর প্রখ্যাত কর্মকর্তা সের্গেই দিয়াগিলেভও এ ব্যাপারে নির্বিকার থাকেন নি। ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা শুরু হয় তাঁর ও রোয়েরিখের মধ্যে। বিশেষ করে তার সুফল দেখা যায় পরে, রঙ্গমঞ্চের কাজে।

বিদেশে রুশ শিল্পের প্রচার বিষয়ে দিয়াগিলেভের যে মতামত ছিল সেটা বিশেষ মনে ধরেছিল রোয়েরিখের। এই 'মিশনে' জোর দিয়ে রোয়েরিখ লিখেছেন: 'সর্বদাই তাঁর মাথাব্যথা ছিল রুশ শিল্পের যশ নিয়ে। রুশ শিল্প যে এখন সারা বিশ্বে সুবিদিত, সেটা অনেকখানি তাঁরই কৃতিত্বে। তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের জন্য পাকাপোক্ত উপাদান সংগ্রহ করতে পারতেন তিনি। ব্যক্তিগত হিসাব-নিকাশের ঊর্ধ্বে দিয়াগিলেভ শিল্পের মঙ্গলকেই বড়ো করে দেখতেন।'

'শিল্প জগৎ' গোষ্ঠীর প্রদর্শনী ছিল খুবই জনপ্রিয়। তাতে প্রথম আত্মপ্রকাশের আগে রোয়েরিখ তাঁর 'নগর নির্মাণ' ছবিটির কিছু কিছু ঘষামাজা করবেন ঠিক করেন। দিয়াগিলেভ তা জানতে পেরে রোয়েরিখের বাসায় ছুটে আসেন মাঝ রাত্রে, শিল্পীকে পান স্টুডিওতে ইজেলের সামনে। তাঁর হাত ধরে দিয়াগিলেভ চেঁচিয়ে ওঠেন:

'বাড়তি রঙ নেই একটিও! এই হল বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি! চুলোয় যাক বিদ্যায়তনিক রূপ!'

ছবিতে স্পর্ধিত রঙের বড়ো বড়ো ছোপে, মেজাজী অঙ্কন, ঢালাও 'স্কেচধর্মী' শৈলী অভিভূত করেছিল দিয়াগিলেভকে। কাছাকাছি দেখলে ছবিটা ফুটত না, কিন্তু কয়েক পা দূরে গেলেই জীবন্ত হয়ে উঠত তা।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুটাকে রোয়েরিখ ফুটিয়ে তুলেছিলেন খুবই সূক্ষ্মতায়। সৃজনের যে প্রেরণায় লোকে সমস্বার্থে একটা বিরাট কর্মে প্রবৃত্ত হয় তার একটা প্রকৃষ্ট রূপ দেন তিনি।

যেসব দিক্‌চিহ্ন ধরে শিল্পী রোয়েরিখ নিশ্চিন্তে এগিয়েছেন তা আগেই স্থাপন করে যান বিজ্ঞানী রোয়েরিখ। এই কারণেই তাঁর শিল্পকর্ম এত অটুট ও প্রত্যয়জনক।

৩। 'অতিকথায় মুগ্ধ করে প্রজ্ঞা মোদের টানে...'

১৯০৩ আর ১৯০৪ সালে রোয়েরিখ এবং ইয়েলেনা ইভানোভনা চল্লিশটির বেশি রুশী শহর পর্যটন করেন, যেমন: ইয়ারোস্লাভ্ল্, কাজান, নিজনি নভগোরদ, ভ্লাদিমির, সুজদাল, রস্তভ ভেলিকি, স্মোলেনস্ক, ভিলনা, প্স্কোভ ইত্যাদি। পরে শিল্পী প্রায়ই গেছেন স্মোলেন্শিনা, ভাল্দাই, নভ্গোরদের আশেপাশে, বলটিক অঞ্চলে, কারেলিয়া আর ফিনল্যান্ডে। এখানকার কথা-কাহিনী, রীতিনীতি, হস্তশিল্প, লোকসঙ্গীত, প্রাচীন সাজ, স্থাপত্য থেকে সৃষ্টির অজস্র উপাদান পেয়েছেন তিনি। নীল নীল নদী, শ্যাম মরকত বন, হিমেল সায়র, মাঠের ফুলেল গালিচা, টিলায় আচ্ছন্ন দিগন্ত, স্নিগ্ধ ঊষা আর রক্তিম সূর্যাস্ত চিরকালের জন্য তাঁর জীবনকে ছেয়ে রেখেছে। 'মরবার জন্য তৈরি হও, কিন্তু ক্ষেতে শস্য বোনো' — পুরুষানুক্রমে পাওয়া এই অফুরন্ত প্রজ্ঞায় তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছে লোকের চিরনবীন প্রফুল্ল অন্তর।

সুকঠোর নভগোরদের ধীবরদের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতেন রোয়েরিখ, তাদের মধ্যে খুঁজে পেতেন আলেক্সান্দর নেভ্স্কি আর মার্ফা পসাদ্নিৎসার যোগ্য উত্তরপুরুষদের, এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রুস অচিরেই জনগণের কাছে খুলে ধরবে তার গোপন রত্নভান্ডার। একথা স্বীকার করতে তাঁর সংকোচ হয় নি যে '...এই লোকেদের নিয়ে কোথা থেকে, কী দিয়ে শুরু করতে হবে জানা কঠিন...', কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে 'পরে অন্যেরা আসবে। খুঁজে নেবে নতুন পথ, কাছে যাবার সেরা উপায়। কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে আমরা ফাঁকা জায়গায় সন্ধান করেছি। এ খাটুনির মূল্য আছে।'

১৯০৩—১৯০৪ সালে তিনি আঁকেন বড়ো একটা স্থাপত্যমূলক স্কেচমালা, সমালোচক স. এর্নস্ত তাকে বলেছিলেন 'আমাদের অতীত গৌরবের সর্বদেবাধিষ্ঠান'। তাতে ছিল প্রায় ৯০টি ছবি, 'রস্তভ ভেলিকি', 'পেচোরা মঠ', 'স্মোলেন্স্কের বুরুজ', 'ইজবোর্স্কের নগরপ্রাচীর', 'উগলিচে পুনরুত্থান মঠ', 'পুরনো প্স্কোভ', 'নিজনি নভগোরদ৷৷ ক্রেমলিনের বুরুজ' তার অন্তর্গত। শিল্পীর পরিকল্পনা ছিল এতে তিনি ধরে রাখবেন দেশের বিরাট প্রস্তর ইতিবৃত্ত, যাতে চিরন্তন হয়ে আছে তাদের নির্মাতা জনগণের প্রাণ ও চারিত্র্যের মহিমা।

এ কাজটা তিনি চমৎকার সমাধা করেন। শিল্পী হিশেবে তিনি ব্যঞ্জনার সঙ্গে তুলে ধরেন ভবনাদির গাঠনিক ভিত্তি, সুদূর অতীতের শৈলীবৈশিষ্ট্য, আর বিদগ্ধ প্রত্নবিদ হিশেবে তাতে ফিরিয়ে আনেন তার অনন্যসাধারণ আদি রূপ।

১৯০৪ সালের শীতকালে কাজগুলি দেখানো হয় 'শিল্পীয় অতীতের স্মরনিকা' নামক একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে। খুবই সাফল্য অর্জন করে এটি। রুশ মিউজিয়মের জন্য গোটা চিত্রমালা কিনে নেবার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার, কিন্তু বাধল রুশ-জাপান যুদ্ধ, শুভ সংকল্পটির কথা আর মনে রইল না কর্তৃপক্ষের।

পরে ভাগ্যের বিড়ম্বনা সইতে হয় স্থাপত্য-স্কেচগুলিকে। গ্রিনওয়াল্ড নামে জনৈক কারবারী ১৯০৬ সালের প্রদর্শনীতে আমেরিকায় সেই প্রথম রুশ শিল্পের একটা বড়ো বিভাগ খোলার কথা ভাবেন। নামজাদা শিল্পীদের ৮০০ ছবি সংগৃহীত হয়, তার মধ্যে ৭৫টি ছিল রোয়েরিখের, বেশির ভাগই স্থাপত্য-স্কেচ। সময়মতো কী একটা শুল্ক দিতে পারেন নি গ্রিনওয়াল্ড, ফলে রুশ বিভাগের সমস্ত শিল্পকর্মই বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা হয়। এ খবর পেয়ে বিচলিত হয়ে ওঠেন রুশী শিল্পীরা, নানান দপ্তরে চিঠি লেখেন, ওয়াশিংটনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূতের শরণাপন্ন হন।

এইসব চিঠি লেখালেখি যখন চলছিল, তখন শোনা গেল মার্কিন শুল্ক বিভাগ চক্ষুলজ্জার এতটুকু পরোয়া না করে গোটা রুশ বিভাগটাকেই বেচে দিয়েছে নিলামে। ৮০০ ছবি ছড়িয়ে পড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর দক্ষিণ আমেরিকায়। রোয়েরিখের প্রায় ৪০টি কাজ পেৌঁছয় কালিফোর্নিয়ার অকল্যান্ড শিল্প মিউজিয়মে। শিল্পীর মৃত্যুর পরেই শুধু তা সংগ্রহ করেন নিউ-ইয়র্কের রোয়েরিখ মিউজিয়মের সভাপতি কে. স্টিবুবে। ১৯৭৪ সালে শিল্পীর পুত্র স্ভিয়াতোস্লাভ রোয়েরিখের উদ্যোগে ছবিগুলি দান করা হয় সোভিয়েত জনগণকে।

১৯০৩ সালে নিকোলাই রোয়েরিখ ও ইয়েলেনা ইভানোভনা প্রথম যান প্রিন্সেস মারিয়া ক্লাভদিয়েভনা তেনিশেভার তালাশকিনো মহালে। স্মোলেনস্ক থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে যুগ-যুগের ওক, মেপ্‌ল্‌ আর ধবধবে বার্চ গাছের মধ্যে টিলার ওপর মহালটি দেখায় ছবির মতো। বহু রুশী চিত্রকরের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তালাশকিনো। তার কর্ত্রী ছিলেন সত্যকারের শিল্পপ্রেমিক। শ্রুতকীর্তি রেপিনের কাছে এবং ইতালি ও প্যারিসে তিনি অঙ্কন শিক্ষা করেন। পরিশীলিত লোক ছিলেন মারিয়া ক্লাভদিয়েভনা, মনের দিগন্ত ছিল প্রসারিত। প্রায়ই তিনি বলতেন: '...কেন আমাদের সাবেকী রুস্‌ দূরে সরে গেল, আমাদের, রুশীদের কাছ থেকে? কেন ফ্যাশন চাপিয়ে দিচ্ছে শিল্পীরা নয়, হোমরা-চোমরা সরকারী চাকুরে আর বেনিয়ারা, জাতীয় আত্মাকে যারা জানে না?'

নব্বইয়ের দশকের শেষে স্মোলেনস্কে অঙ্কন বিদ্যালয় স্থাপন করেন তেনিশেভা, তালাশকিনোতে একটি স্টুডিও খোলেন। ভ. ভাসনেৎসভের কাছে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'আমার তালাশকিনোর স্টুডিও হল রুশ শিল্পের পরখ। এ শিল্প যদি সম্পূর্ণতা পায় তাহলে তা হবে বিশ্বশিল্প।'

তালাশকিনোতে তরুণেরা আঁকা, মূর্তি গড়া, বিন্যাস, এম্ব্রয়ডারি, লেস বোনা, কাঠ-খোদাই ইত্যাদির শিক্ষা পেত। মস্কোয় খোলা হয় 'রোদনিক' নামে একটি পৃথক দোকান, — তালাশকিনোর শিল্পীদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

রোয়েরিখ লিখেছেন: 'তালাশকিনোকে মন দিয়ে দেখছি। বোঝা যাচ্ছে, প্রাণের চাহিদা আর পাকাপোক্ত একটা ভিত্তি গড়ে তোলার ফলে তালাশকিনো বিদ্যালয় ও মিউজিয়মের ব্যাপারটা এগিয়ে যাচ্ছে।'

তালাশকিনোর বিদ্যালয় ও স্টুডিও'র বহুমুখী কর্মসূচি থেকে দেখা যায় যে তেনিশেভা ও তাঁর

সহকর্মীরা এ কাজের সাধারণ সাংস্কৃতিক গুরুত্বের ওপর ভরসা রেখেছিলেন অনেক। নিকোলাই রোয়েরিখ লিখেছেন: 'শহুরে সংক্রামকতা থেকে দূরে দাসসুলভ বশ্যতা ছাড়া, কারখানার লেবেল ছাড়া পবিত্র পীঠস্থানে লোকে ফের সৃষ্টি করছে সুচিন্তিত সামগ্রী, সৃষ্টি করছে ভালোবেসে, সময় নিয়ে। ফের মনে পড়িয়ে দিচ্ছে পিতৃপিতামহের অনুজ্ঞা, সাবেকী কাজের সৌন্দর্য আর স্থায়িত্ব। তরুণদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে নতুন চাহিদা, সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তে তা দৃঢ়তা পাচ্ছে। শুঁড়িখানায় যাবার সময় নেই, তা ছাড়াই উৎসব জমে যখন চারিপাশেই এত বিনোদন, দৈনন্দিন থেকে এত অপসারণ।'

বলাই বাহুল্য, তেনিশেভা এবং রোয়েরিখ উভয়েই তালাশকিনোর পরীক্ষায় যতটা তাৎপর্য ও ব্যাপকতা দিতে চেয়েছিলেন, জারতন্ত্রের আমলে তা রূপায়িত করা ছিল অসম্ভব। তাহলেও জনগণের নান্দনিক শিক্ষা এবং তাতে ফলিত শিল্পের ভূমিকা যে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব ধরে, এ প্রশ্ন রোয়েরিখ তুলেছিলেন যথাকালেই। 'কলকারখানা কি হতে পারে ললিত শিল্প ছাড়া?' এই প্রশ্ন রেখে রোয়েরিখ জবাব দিয়েছেন: 'না, যখন শিল্পের উচিত সারা জীবনকে আরো গভীরে ভরে তোলা, মানুষের সমস্ত সৃজনকর্মকে আলিঙ্গন করা।' তাই 'ফলিত শিল্প' পরিভাষাটিকেও রোয়েরিখ মনে করতেন অসার্থক। একটা যেন গৌণ গুরুত্ব পড়ে তাতে। তাঁর মতে, শিল্প অবিভাজ্য, বেনভেনুতো চেল্লিনি কৃত বোতাম একটা মাঝারি ধরনের চিত্র কি ভাস্কর্যের চেয়ে বেশি শিল্পমূল্যের অধিকারী।

বুর্জোয়া উদ্যোক্তারা লোকশিল্পীদের ওপর চাপিয়ে দিত আদিম ধাঁচের পরিভোগী রুচি। তাই শিল্প স্টুডিও গড়ায় তেনিশেভার উদ্যোগকে সাগ্রহে সমর্থন করেন বহু রুশী শিল্পী। রুশী ফলিত শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে ভ. ভাসনেৎসভ, ইয়ে. পলেনোভা, ম. ভ্রুবেল, ই. রেপিন, ভ. সেরোভ, ক. করোভিন, স. মালিউতিন-এর অবদান বিশেষ স্মরণীয়।

রোয়েরিখের স্কেচ অবলম্বনে তালাশকিনোর স্টুডিওতে বানানো হয় সোফা, টেবিল, আরাম-কেদারা, বইয়ের আলমারি। বানানো হয় 'উত্তর॥ শিকার' এই প্রসঙ্গ নিয়ে দেয়ালের উপরিভাগে তিনটি অলংকরণে সজ্জিত একটি ঘরের জন্য। রোয়েরিখের কাজ শৈলীর ঐক্য, উঁচু দরের শিল্পরুচি এবং উত্তুরী লোকেদের শিল্পের জ্ঞানে বিশিষ্ট, তাঁর অঙ্কনের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেখান থেকেই। তাঁর স্কেচ অনুসারে বানানো জিনিসগুলো তাদের অনন্যতায় অভিভূত করে কল্পনা। তাতে শিল্পীর চেয়ে প্রত্নবিদ যেন বেশি প্রকট।

সেটা খুবই বোধগম্য। রাশিয়ার জাতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠা ছিল রোয়েরিখের। লৌকিক সৃজনের প্রতি তিনি ছিলেন একান্ত সযত্ন। সচরাচর যা ভাবা হয় তার চেয়ে অনেক সক্রিয় একটা ভূমিকা তিনি আরোপ করেন প্রত্নতত্ত্বে।

আর তাঁর নিজস্ব প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধানে একটা বড়ো স্থান ১৯০২ সালে নভগোরদের উপকণ্ঠে ঢিপি খনন।

নবোপলীয় যুগের প্রস্তর হাতিয়ার-পত্রের মধ্যে এখানে ছিল অ্যাম্বারের শত শত অলংকার, যা তৈরি হয়েছিল চার হাজার বছর আগে।

এই এবং পরবর্তী খননে তখনকার নভগোরদ ও ত্ভের গুবের্নিয়ায় নবোপলীয় যুগের অতি উচ্চ সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কার খুবই চিত্তাকর্ষক। পিরোস সরোবরে নবোপলীয় যুগের যে মনুষ্যমূর্তি পান রোয়েরিখ তাতে এতই চাঞ্চল্য জাগে যে প্রফেসর ন. ই. ভেসেলোভ্স্কি ঘোষণা

করে দেন যে জিনিসটা জাল। কিন্তু পরের বছর একদল ছাত্র নিয়ে স্বয়ং ভেসেলোভ্স্কি যখন অসম্পূর্ণ খননস্থলে আসেন, তখন তার অকৃত্রিমতা পুরোপুরি প্রমাণ হয়ে যায়। ১৯০৫ সালে প্যারিসে প্রত্নবিদদের কংগ্রেসে রোয়েরিখ তাঁর আবিষ্কার দেখান। বিশেষজ্ঞরা তার তুলনা করেন মিশরের চিরায়ত পুতুলগুলির সঙ্গে।

রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তর যুগের বহু বসতি নিয়ে সমীক্ষা চালান রোয়েরিখ। এই থেকেই শুরু হয় তাঁর অপূর্ব সংগ্রহ, যা পরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের প্রাপ্তিতে। প্রস্তর যুগের লক্ষাধিক সামগ্রী ছিল তাঁর সংগ্রহে।

প্রবন্ধাদিতে রোয়েরিখ লেখেন যে, মানব সংস্কৃতির ইতিহাসকে প্রস্তর ব্রোঞ্জ লৌহ যুগে ভাগ করা শর্তসাপেক্ষ, কোনো একটা যুগে কী বস্তু দিয়ে শ্রমের হাতিয়ার বানানো হত শুধু তার ভিত্তিতেই সে যুগের সাংস্কৃতিক মান বিষয়ে সিদ্ধান্ত টানা অনুচিত। শ্রমের চরিত্র এবং গোটা জীবনযাত্রাও কম ধর্তব্য নয়।

প্রস্তর যুগে রোয়েরিখের আগ্রহের কারণ আছে। তাঁর ধারণা ছিল, মানবিক সমাজের বিবর্তনের বহু ধাঁধার জবাব মিলবে ঠিক এই যুগটার অধ্যয়নেই। 'উৎস' প্রবন্ধে তিনি লেখেন: 'গবেষকরা প্রায়ই এই দেখে বিস্মিত হয়েছেন যে প্রস্তর যুগে বিচ্ছিন্ন সব মহাদেশে দেখা গেছে একই কর্মপ্রকরণ, অলংকরণের একই পদ্ধতি। অবশ্যই এই আদিম লোকগুলোর মধ্যে মেলামেশার কোনো কথাই ওঠে না... এইসব সাদৃশ্যের তুলনা করে মানবিক অভিব্যক্তির তৎরূপিতা বিষয়ে শিক্ষাপ্রদ মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত টানা যায়। তার মানে, এইসব অভিব্যক্তির পথটাও একই রকম হওয়ার কথা।'

১৯১০ সালে নভগোরদে রোয়েরিখ যে খনন চালান তা খুবই সার্থক হয়। যেসব জায়গায় হাত পড়ে নি সেখানে খুঁড়তে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন নগরের সাতটি স্তর, তার ভেতর প্রাচীনতমটির তারিখ নবম শতকের গোড়ায়। নভগোরদের ইতিহাস বিষয়ে এ আবিষ্কার অতি মূল্যবান।

প্রত্নতত্ত্বের চর্চায় রোয়েরিখ নবোপলীয় যুগ থেকে ক্রমশ চলে আসতে থাকেন আরো সাম্প্রতিকে। নবোপলীয় যুগকে তিনি মনে করতেন ইতিহাসের দ্বারদেশ। কিন্তু রুশ ভূমির ইতিহাস শুরু হচ্ছে কোন শীর্ষ থেকে? নবম শতক থেকে নয়, যখন, ইতিবৃত্তের কথায়, ডাকা হয় ভ্যারাঙ্গিয়ানদের। এই সরকারী ভাষ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সমূহ সন্দিহান। ঐ একই ইতিবৃত্তেই তো রিউরিকের উল্লেখের আগেই আছে যে স্লাভরা 'ভ্যারাঙ্গিয়ানদের সাগরপারে খেদাইয়া দিল, কোনো ভেট দিল না'।

ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমাণিত হয় যে অতি প্রাচীন কালেই স্লাভ উপজাতিরা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে শুরু করেছিল। লাদোগা হ্রদ থেকে কৃষ্ণসাগর, নেমান থেকে দ্ভিনা পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে স্মরণাতীত কাল থেকে বাস করত উদ্যোগী পরিশ্রমী এমন সব লোকেরা যারা ছিল স্বভূমির সত্যকার মালিক।

পরাক্রান্ত স্লাভ জাতির পরিচয় আছে ১—৮ শতকের গ্রীক-রোমক ও বাইজানটাইন লিখিত নথিপত্রে। আদ্রিয়াতিক সাগরের তীরে, থুরিঙ্গিয়ার বনে, মুসলিম ও প্রাক্-মুসলিম প্রাচ্যে, ককেশাসে, এশিয়া মাইনরে, মধ্য এশিয়ায় স্লাভরা যে দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ আছে। বিশ্ব মঞ্চে প্রবল কিয়েভ রাষ্ট্র এবং বিস্তীর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক সমেত নভগোরদের উদয়ের আগে চলেছিল গভীর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। সর্বাগ্রে এইটাই ছিল ঐতিহাসিক রোয়েরিখের আগ্রহের বিষয়।

শিল্পী লেখেন: 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরে রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার বিশাল সমভূমি হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত পুনর্বাসী জনগোষ্ঠীর মিছিলের প্রাঙ্গণ। এশিয়ার গভীর থেকে রুশ সমভূমিতে আসে অসংখ্য কুল আর উপজাতি। প্রস্তর যুগের সার্বজনীন চিত্রবর্ণমালার পরবর্তী যুগে আমরা রুশ ভূমির গভীরে পাচ্ছি একেবারে অপ্রত্যাশিত স্তর; এইসব অপ্রত্যাশিতের তুলনা করলে রাশিয়ার বাস্তব জীবন বুঝতে সাহায্য হবে।'

প্রাচীন রুশ ভূমিতে 'সমস্ত পুনর্বাসী জনগোষ্ঠীর মিছিল' চলেছিল সত্যিই প্রধানত পুব থেকে পশ্চিমের দিকে। পুব থেকে স্বীয় সীমান্তে অনবরত চাপ ভোগ করেছে কিয়েভ রুস-ও। স্ভিয়াতোস্লাভের সময় এ রাষ্ট্র তার অধিকার বিস্তৃত করেছে পুর্বাঞ্চলেই।

রুশ জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস অধ্যয়ন প্রসঙ্গে এসব থেকে নিজে কী সিদ্ধান্তে এলেন রোয়েরিখ? তিনি নিশ্চিত হলেন যে রুস-এর ওপর পূর্বীয় প্রভাব ছিল পশ্চিমের চেয়ে বেশি সক্রিয় সুতরাং পূর্বীয় প্রভাব নিয়েই অধ্যয়ন করা উচিত।

স্লাভ উপজাতি আর উত্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যাতেও ব্যাপৃত থাকেন বিজ্ঞানী রোয়েরিখ। রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তিনি প্রথম যেসব খননকার্য চালান, তা থেকে ঠিক এই সমস্যাটা বিশ্লেষণের প্রচুর খোরাক পান তিনি। উত্তরী জনগোষ্ঠীর বিকাশের মানকে তিনি উ'চু বলে ধরেন এবং মনে করেন যে দশ শতকে স্ক্যান্ডিনেভীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়েছিল সারা ইউরোপে। রুশ রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ ভূমির ওপর দিয়ে গিয়েছিল ভ্যারাঙ্গিয়ান থেকে গ্রীস অবধি মহাপথ। এই পথে একদা ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বসতি। নির্ভীক উত্তরীদের রীতিনীতি থেকে অনেককিছু গ্রহণ করা স্লাভদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু পূর্বের তুলনায় উত্তরের প্রভাব ছিল আরো পরবর্তী কালের ঘটনা এবং আরো সীমিত।

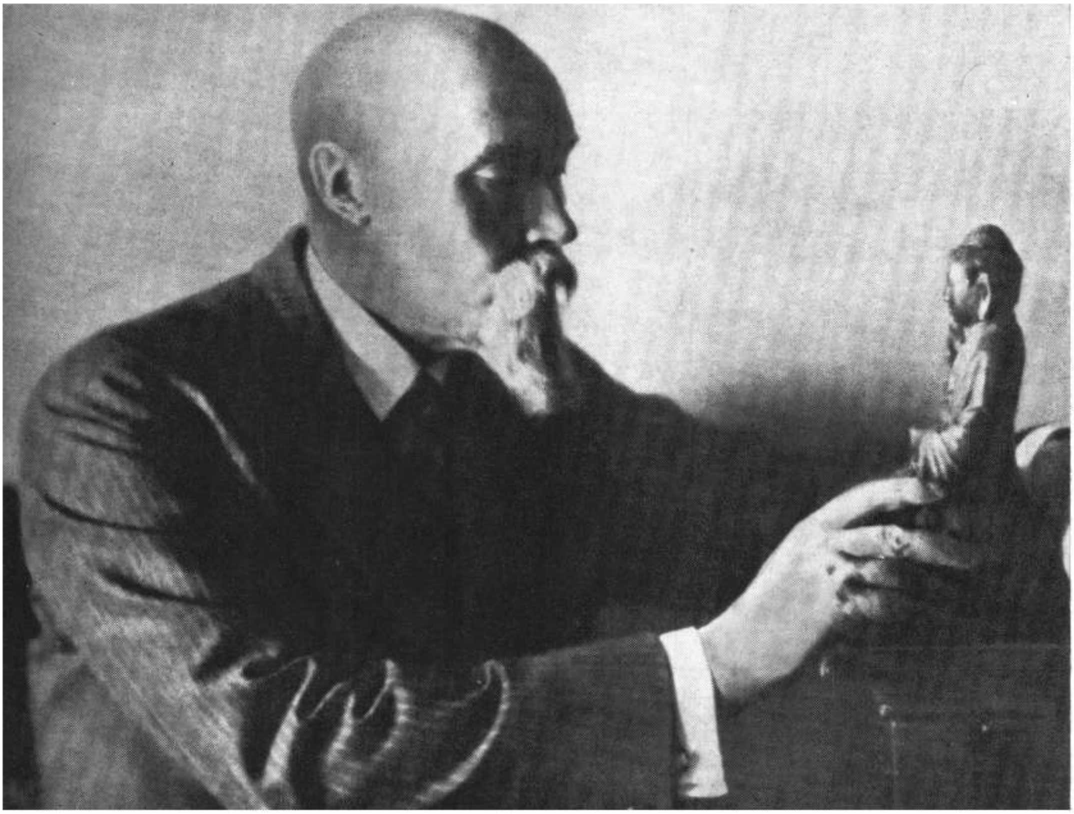
শৈশব থেকেই যে পূর্বের কথা রোয়েরিখ অনেক শুনেছিলেন তা ক্রমেই বেশি করে তাঁর চিত্ত অধিকার করতে থাকে। যে তাতার আমলকে উনি নিজেই বলেছেন 'ঘৃণ্য যুগ', এমনকি তাতেও শিক্ষাপ্রদ দিক দেখেছেন তিনি। লিখেছেন: 'ভুলে যেতে হয় যে এশিয়ার রহস্যময় সূতিকাগৃহ এই বন্য লোকেদের লালনপালন করেছে আর চীন, গোটা হিন্দুস্তান, তিব্বতের ঐশ্বর্য দিয়ে তাদের ঘিরেছে। তাতার তরবারির ঝলকে রুস্ ফের শুনল অলৌকিকের কাহিনী যা একদা জানত গ্রীস অবধি মহাপথের ধূর্ত আরব অতিথিরা... নিজেদের অলক্ষ্যেই তাতাররা গ্রহণ করে এশিয়ার প্রাচীনতম সংস্কৃতি এবং সমান অজান্তে, বিজিতদের সবার প্রতিই ঘৃণা পোষণ করলেও তা ছড়িয়ে দেয় রুশ সমভূমিতে।'

রুশ ইতিহাস সম্পর্কে রোয়েরিখের এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্ধারিত হয়ে যায় তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক অন্বেষা, তাঁর সৃজনকর্মে ঘটে তার প্রোজ্জ্বল প্রকাশ, প্রভাবিত করে তাঁর জীবনের পথকে। যাঁরা মনে করতেন রাশিয়ার অগ্রগতি ঘটেছে প্রথম পিটারের ক্রিয়াকলাপের ফলে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সত্যকার মণিকোঠায় প্রবেশ সে সময় থেকে, তাঁদের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন রোয়েরিখ। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করে রোয়েরিখ বলতেন যে প্রাক্-পিটার রাশিয়া সম্পর্কে ও ধারণাটা ঠিক নয়, সে রাশিয়া ইউরোপের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় নি।

চিত্রকলাতেও তিনি এই ভাবনা অনুসরণ করেন। তাঁর ছবিতে দেখা যেতে লাগল স্লাভ ভূমির প্রাচীন চেহারা। তার লোকেরা মোটেই ছিল না আদিম বন্য। তাদের বহুবিধ শ্রম,



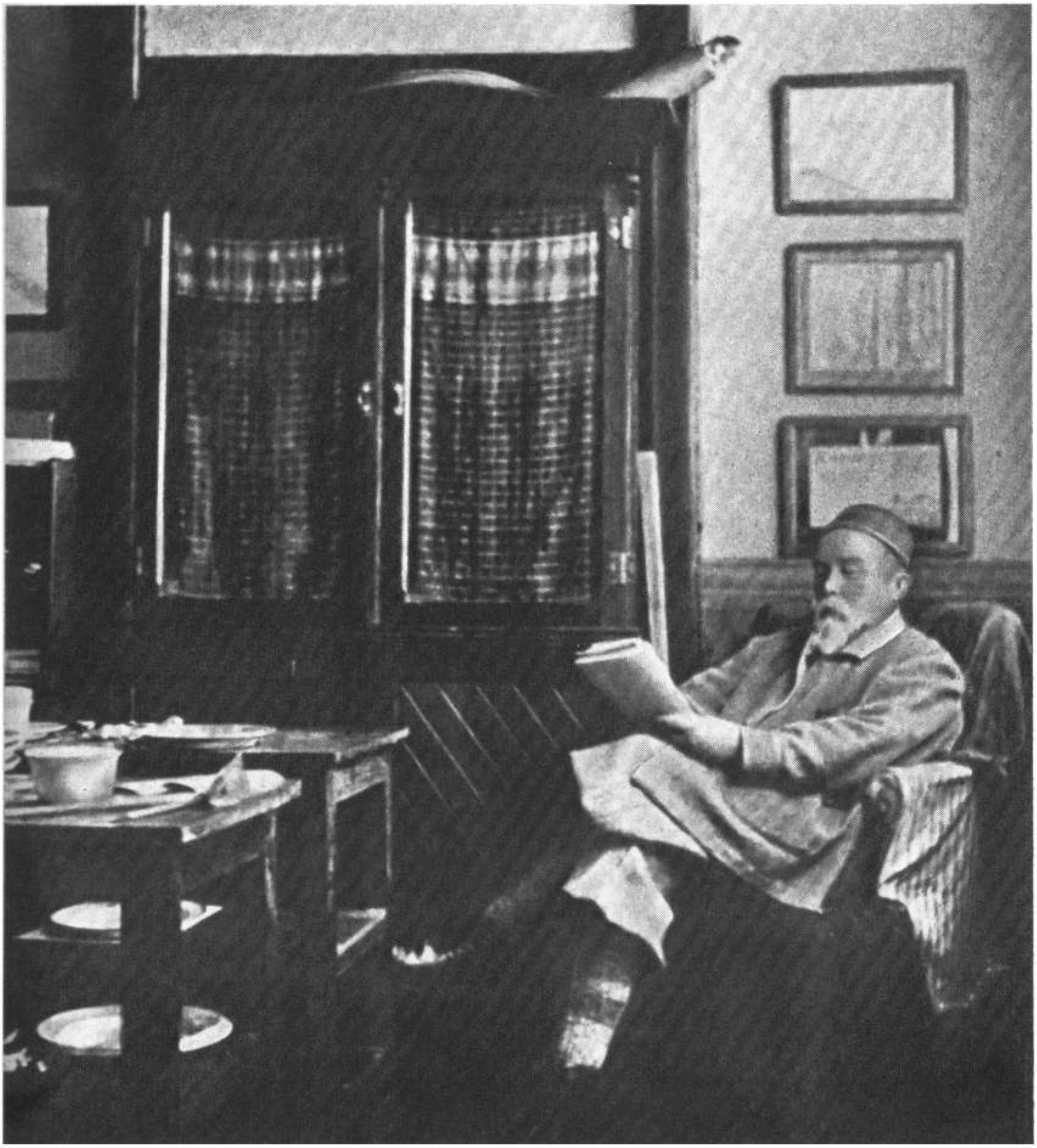
কুল্‌ু'র বাড়ি (পশ্চিম হিমালয়)। এখানে ন. রোয়েরিখ নিজের পরিবার নিয়ে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৭ সালে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাস করেন।



ন. ক. রোয়েরিখ। ১৯২৯ সাল।



কুল্‌ু'তে ন. ক. রোয়েরিখ ছেলে ইউরি ও স্‌ভিয়াতে.স্লাভের সঙ্গে। ১৯৩৩ সাল।



কুলু'তে নিজের স্টুডিওতে ন. ক. রোয়েরিখ। ১৯৩৩ সাল।



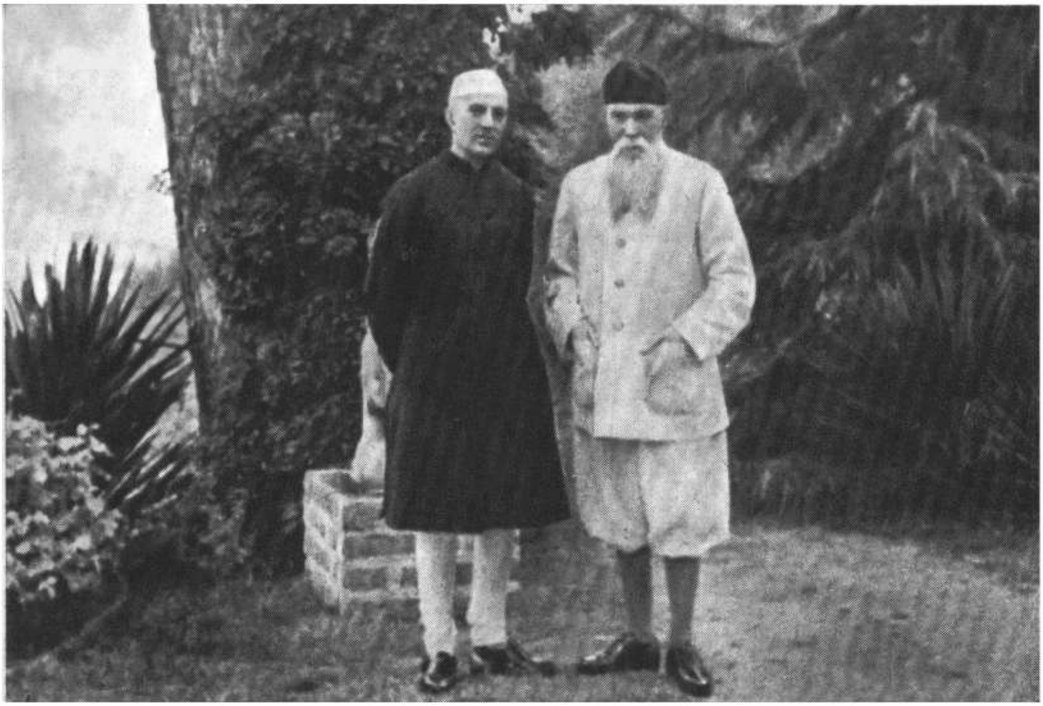
কুলু'তে গুপ্ত-চৌহানের মূর্তির সামনে ন. ক. রোয়েরিখ। ১৯৩৫ সাল।



ন. ক. রোয়েরিখ নিজের বাড়ির বাগানে। তিরিশের দশক।



উৎসবের দিনে ন. ক. রোয়েরিখকে তাঁর বাড়ির সামনে অভিনন্দন জানাচ্ছে কুলু'র অধিবাসীরা। তিরিশের দশক।



কুল্লু'তে ন. রোয়েরিখ ও জওহরলাল নেহরু। ১৯৪২ সাল।



কুল্লু'তে 'উরস্বতী' ইন্সিটিউটের ভবন।



কুলু'তে ন. রোয়েরিখ, দেবিকা রাণী রোয়েরিখ ও স্‌ভিয়াতোস্লাভ রোয়েরিখ। ১৯৪৬ সাল।

বিকশিত সমাজব্যবস্থা, চিত্তাকর্ষক রীতিনীতি নিয়ে দেখা দিল 'তরী নির্মাণ' (১৯০৩), 'নিপার তীরের স্লাভ' (১৯০৫), 'পরিচ্ছদ নিয়ে ভাবনা' (১৯০৮), 'ভেট সংগ্রহ' (১৯০৮) ক্যানভাস।

ইতিহাসের প্রগাঢ় জ্ঞান নিয়ে আঁকা রোয়েরিখের ছবিগুলি দার্শনিক চিন্তাতেও সমুজ্জ্বল। সুদূর অতীতকে তুলে ধরতে গিয়ে রোয়েরিখ যেন নিজেকে প্রশ্ন করেন — অতিক্রান্ত পথে আমরা প্রয়োজনীয় কিছু কি হারিয়ে আসি নি, যে প্রাচীন কখনো প্রাচীন হয় না তাকে অশ্রদ্ধা করি নি কি? তাঁর মতে, এই বিষয়গুলির মধ্যে পড়ে মানবিক মর্যাদাবোধ, লোকেদের মধ্যে সম্পর্কে শুভানুধ্যায়িতা, জীবনযাত্রার মৌলিকতা এবং রূপ ও সমুন্নতির চিরন্তন আকুতি। তাঁর সমকালীন সমাজে যদি নৈতিক আদর্শ স্খলিত হয়ে থাকে, শিল্পের জন্য আগ্রহ যদি উবে যায়, মনুষ্যজীবন থেকে যদি অন্তর্ধান করে সৌন্দর্য, তাহলে কোন সামাজিক প্রগতি, কোন সচ্ছলতার কথা বলা সম্ভব?

১৯০৪ সালে প্রাগের 'মানেস' সঙ্ঘ থেকে রোয়েরিখ আমন্ত্রণ পান সেখানে তাঁর প্রদর্শনী করার। বিদেশে প্রদর্শনী — সে তো নবীন চিত্রকরের পক্ষে বড়ো সম্মানের কথা। ১৯০৫ সালের বসন্তে এটির উদ্বোধন হয়। চাকুরি ব্যপদেশে উদ্বোধনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি রোয়েরিখ। প্রাগের সংবাদপত্রে রোয়েরিখের 'অতীত স্বপ্নগুলি' নিয়ে প্রশস্তি বেরয়। তবে শিল্পীর নিজের কথায়, তাঁর ভাবনা ছিল অতীত নয় ভবিষ্যৎ নিয়ে।

সে ভবিষ্যৎ কেমন বলে তাঁর ধারণা, নিজের দেশে কী দেখতে চেয়েছিলেন তিনি?

বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকায় রোয়েরিখ ১৯০৫ সালের ঘটনাবলিকে নিয়েছিলেন নিজের মতো করে।

বোধ হয় এই কথাটার তখন খুবই চল ছিল যে একান্ত রকমের আমূল ব্যবস্থা নিলেই তবে জনগণের দীনাবস্থা উন্নত করা সম্ভব। রোয়েরিখও তা বুঝতেন নিশ্চয়। কিন্তু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর কাছে সমস্ত পরিস্থিতিতে শিল্প এবং অনির্বচনীয়তার জন্য তার অনুসন্ধিৎসাই সেই মূল শক্তি যা মানুষকে ঢেলে সেজে সমাজজীবনকে বদলে দিতে পারে আমূলভাবে। ১৯০৫ সালের ঘটনাবর্তে রোয়েরিখের শিল্পীয় ও জ্ঞানপ্রচারণী ক্রিয়াকলাপই শুধু বেড়ে ওঠে।

১৯০৬ সালের বসন্তে রোয়েরিখ শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন, এবং বিদেশ যাত্রা করলেন সেখানকার শিল্প শিক্ষার অভিজ্ঞতা নেবার জন্য। জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, ইতালি ঘুরে তিনি হেমন্তে ফিরলেন পিটার্সবুর্গে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যাপারটা পুনর্গঠনের কাজে লাগলেন। পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত অধ্যাপকদের রক্ষণশীলতায় বেশ অখ্যাতি জুটেছিল বিদ্যালয়টির।

রোয়েরিখের পরিচালনায় বছর কয়েকের মধ্যে স্কুলটির এমনই পরিবর্তন হল যে চেনা দায়। এ সংস্কারকে অলৌকিক অভিহিত করে আলেক্সান্দর বেনুয়া লিখলেন: 'এই অলৌকিক কান্ড ঘটল কেবল একটি লোক, একজন শিল্পীর দৌলতে, নিষ্প্রাণ ও গতানুগতিকের বিরুদ্ধে ইনি যে সঙ্গতিপরায়ণতায় লড়েন, তাতে তিনি ক্রমেই শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠছেন। নিজের শুভ কর্ম সম্পাদনের জন্য রোয়েরিখ অতি বিরক্তিকর সব লোকের সংস্রব সহ্য করার মতো বীরত্ব রাখেন। তাদের বড়ো বেশি অপমানিত না করে, আক্রমণাভিযান বড়ো বেশি দ্রুত না চালিয়ে কাজটা এমনভাবে সারেন যাতে ফললাভ হয় ভালো রকমের এবং পাকাপোক্ত।'

সত্যিই, রাজপরিবারের লোক এবং তাদের যে তল্পীবাহকদের সঙ্গে রোয়েরিখের প্রায়ই কাজ থাকত, তাদের জন্য দরকার হত একটা বিশেষ ধরনের 'অভিগমন'। যেমন সেরোভ যখন দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের প্রতিকৃতি নিয়ে খাটছিলেন তখন সেটা তাঁকে আগে দেখাতে হয়েছিল জারপত্নী আলেক্‌সান্দ্রা ফিওদরোভনাকে। ছবির অঙ্কন ও বিন্যাস বিষয়ে কিছু জ্ঞানদান করা উচিত বলে রাজমহিষী বিবেচনা করেন। হতভম্ব শিল্পী আর পারেন নি, রাণীর দিকে রঙ তুলি এগিয়ে দিয়ে বলেন উনি নিজেই যেন তাঁর মহামূল্য দয়িতের চিত্রটা সম্পূর্ণ করেন।

একটি প্রদর্শনীতে আলেক্‌সান্দ্রা ফিওদরোভনা মন্তব্য বর্ষণ করে 'কৃতার্থ' করেন রোয়েরিখকেও। 'পলোভেৎসদের ছাউনি' ছবিটির দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করে কড়া গলায় তিনি শুধান, আকাশে আবর্জনা জমল কী করে। জার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনিশ্চয়তায় এই অনুমান ব্যক্ত করেন যে ওটা সম্ভবত আবর্জনা নয়, ধোঁয়া।

একবার বিজ্ঞান অকাদেমির সভাপতি গ্র্যান্ড ডিউক কনস্তান্তিন কনস্তান্তিনোভিচ ব্রাজের একটা নিরীহ স্কেচকে ভর্ৎসনা করে রোয়েরিখকে জিজ্ঞাসা করেন হুমকির সুরে: 'লণ্ঠনটা বাঁকা কেন?' গ্র্যান্ড ডিউকের কাছে সর্বাধিক বোধগম্য হবে এমন একটা উত্তর দিয়েছিলেন রোয়েরিখ: 'নিশ্চয় ওটা ভেঙে গেছে।' কিন্তু জবাবটা মহামান্যের পছন্দ হল না, অহিতাকাঙ্ক্ষী জোটালেন রোয়েরিখ।

শিল্পের প্রতি 'মহাভাগদের' এই ধরনের 'পৃষ্ঠপোষকতায়' রাজকর্মচারীদের পক্ষ থেকেও যে মাঝে মাঝে বিচিত্র আচরণ দেখা যাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যেমন, শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়ে বার্ষিক প্রদর্শনী উদ্বোধনের আগে পৌরপতির সহকারী জেনারেল ভেনদর্ফ একবার সেখানে আসেন এবং মডেল নিয়ে কাজগুলোর সমালোচনা করেন। প্রদর্শনীতে যে গণ্যমান্যরা তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন, অথচ এখানে এমন সব ছবি আর মূর্তি রয়েছে যা ভব্যজনের পক্ষে দর্শনীয় নয়।

তলব হল রোয়েরিখের। এই ধরনের কাজ নিয়ে প্রদর্শনী খোলা একেবারে বারণ করে দিলেন জেনারেল। রোয়েরিখও প্রদর্শনীর সামগ্রী সরাতে একেবারেই গররাজী। শেষ পর্যন্ত একটা 'দারুণ' আইডিয়া মাথায় খেলল জেনারেলপ্রবরের, আপোস হিশেবে প্রস্তাব দিলেন 'অশালীন জায়গাগুলো' ঢেকে দেওয়া হোক। রোয়েরিখ বললেন: 'কোথায় অশালীনের শেষ আর কোথায় শুরু সেটা ঠিক করার সাধ্যি আমার নেই, তাই অনুরোধ করি শিক্ষকের উপস্থিতিতে আপনিই বরং দেখিয়ে দিন ঠিক কোনগুলো ঢেকে রাখার যোগ্য।'

ক্ষিপ্ত অধিকর্তা চলে যাবার পর রোয়েরিখ অধ্যাপক ও ছাত্রদের ডেকে বললেন জেনারেলের মৌলিক উপদেশের কথা। উপদেশটা পালন করতেই হয়, তবে পালনের যথাযথ উপায় যখন জেনারেল দিয়ে যান নি, তখন পালনকারীদের উদ্যোগে বাধা দেবেন না রোয়েরিখ।

এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা হাসি মুখে এসে রোয়েরিখকে জানাল যে সব হয়ে গেছে। প্রদর্শনীস্থলে গেলেন রোয়েরিখ, অসম্ভব চাঞ্চল্য সেখানে। দেখা গেল সিগারেটের নানা রঙের কাগজ দিয়ে ছাত্ররা অদ্ভুত সব স্কার্ট আর ট্রাউজার বানিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যায় প্রদর্শনী কক্ষ একেবারে লোকে লোকারণ্য। দর্শকদের মধ্যে চেঁচামেচি, হাসাহাসি, রাগারাগির ধুম পড়ে গেল, খবরের কাগজে বেরুল রুষ্ট সমালোচনা।

পরের দিন রোয়েরিখের কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন পৌরপতির দ্বিতীয় সহকারী লিসোগোর্স্কি, বিব্রতভাবে শুরু করলেন:

'প্রফেসর, এ যে কেলেঙ্কারী।' — 'তা আবার নয়, মহা কেলেঙ্কারী,' বললেন রোয়েরিখ, 'জেনারেল ভেনদর্ফের নির্দেশের জন্য ভারি দুঃখ হচ্ছে আমার।' লিসোগোর্স্কি বলে চললেন: 'কিন্তু এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না, একটা উপায় বার করতে হয়।' — 'দুঃখের বিষয় উপায়টা নির্ভর করছে আমার ওপর নয়, পৌর অধিকর্তাদের ওপর,' খোঁচা দিলেন রোয়েরিখ। দীর্ঘ আলাপের পর লিসোগোর্স্কি অনুরোধ করলেন যে বড়ো কর্তার মুখ রক্ষার জন্য অন্তত একটা স্কেচ সরানো হোক প্রদর্শনী থেকে।

শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয় পুনর্গঠনের কাজ রোয়েরিখ শুরু করেন নতুন নতুন অধ্যাপক এনে। বিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হন খ্যাতনামা শিল্পীরা।

অধ্যাপক সমিতির নিয়মিত অধিবেশনের প্রবর্তন করলেন রোয়েরিখ, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত প্রশ্নের মণ্ডলীভিত্তিক আলোচনা হত সেখানে।

বিদ্যালয়ের ব্যাপারে মনে হয় তালাশকিনোর অভিজ্ঞতা অনেক কাজে লেগেছিল রোয়েরিখের। শিল্প যে একটা সংশ্লেষিত ব্যাপার, তাকে যে ফলিত ও বিশুদ্ধে ভাগ করা যায় না, এ ধারণা প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল এখানেই। বিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়া হত কান্ত কারুকর্মের বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার জন্য। তার কর্মসূচি অনেক বিস্তৃত করেন রোয়েরিখ। সেরামিক্স, চীনেমাটি আর পটারির ওপর চিত্রাঙ্কনের ক্লাস পুনর্গঠিত হয় স্টুডিওতে। খোলা হয় খোদাই চিত্র, পদক বিদ্যা, জীবজন্তু অঙ্কনের ক্লাস। অধ্যাপকদের সৃজনী উদ্যোগের স্বাধীনতা দিতেন রোয়েরিখ। নিজের কাজে অনুপ্রাণিত বোধ করতেন তাঁরা, ছাত্রদের টানতেন নিজের সঙ্গে। বাদ্যসঙ্গীত ও ঐকতান গানের ক্লাস ছিল বিদ্যালয়ের কর্মসূচির অন্তর্গত। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টির দিগন্ত বাড়াবার জন্য নভগোরদ, প্স্কোভ একস্কার্শন, প্রধান প্রধান শহরের মিউজিয়মগুলি দেখার ব্যবস্থা হত।

রোয়েরিখের ধৈর্য, সঙ্গতিশীলতা, সাংগঠনিক প্রতিভা, লোকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারার নৈপুণ্যের কল্যাণে বিদ্যালয়টি হয়ে দাঁড়ায় দেশের একটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। শিল্পের দীক্ষা নিতে যারা অভিলাষী, তাদের সবার জন্য এর দরজা ছিল অবারিত। যুবা শ্রমিক, কারুজীবী, কলেজ-ছাত্র, নাবিক, সৈনিক, শহরে আগত কৃষক অবাধে প্রবেশ করেছে বিদ্যালয়ে।

রোয়েরিখ বিশেষ মন দিয়েছিলেন শহরতলির শাখা, স্টুডিও, আর রবিবাসরীয় ক্লাসের একটা জাল বুনে তুলতে। এইসব শাখা আর ক্লাসে যারা যোগ দিত, তারা প্রধানত মেহনতী তরুণ। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল কান্ত কারুকর্মের কর্মী গড়ে তোলা যাতে দরকার প্রকৌশলগত অঙ্কনের বিশেষজ্ঞতা। সাধারণ শিল্প শিক্ষার ক্লাস প্রবর্তন করে রোয়েরিখ এগুলির আবশ্যিক কর্মসূচি প্রসারিত করেন, তার সুপ্রভাব পড়েছিল শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক মান বৃদ্ধিতে।

রোয়েরিখ শুধু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাতেই সীমাবদ্ধ থাকতেন না, ক্লাস নেবার মতো সময়ও করে নিতেন। সাধারণত তিনি পড়াতেন বিন্যাসের ব্যাপারটা। তাঁর অধ্যাপনা পদ্ধতিতে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। একটা বিষয়বস্তু নির্দেশ করে সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে দিতেন এবং দু'চার কথায় বলতেন তিনি নিজে হলে কীরকম বিন্যাস স্থির করতেন। কিন্তু এই কথাটায় জোর দিতেন যে তাঁর নিজস্ব মতামত ছাত্রদের পক্ষে অবশ্যমান্য নয়, বরং প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের মতো করে ছবির বিন্যাসটা ভেবে নেয়, তাহলেই ভালো হবে।

এক হপ্তা পরে পর্যালোচনার জন্য সব কটি স্কেচ টাঙানো হত স্টুডিওয়। প্রত্যেকটি ছবির সামনে দাঁড়াতেন রোয়েরিখ, প্রতিটি কাজের বিশদ

বিশ্লেষণ করতেন, বিচার করতেন ছাত্রদের সঙ্গে। এই ছাত্রদের সাক্ষ্য অনুসারে, কড়া সমালোচনা থেকে বিরত থাকতেন তিনি। নিতান্ত ও'ছা কাজেও ইতিবাচক কিছু একটার সন্ধান করতে চাইতেন।

রাশিয়ার একটি শিল্প বিদ্যালয়ের পরিচালনায় থাকাকালে তিনি সত্যকার বৃহৎ শিল্পে জনগণকে দীক্ষিত করা মারফত তাদের জীবনের ধারায় রূপান্তর ঘটাবার একটি পরিকল্পনা ছকেন। তিনি লেখেন:

'শিল্পের বর্তমান বোধ অনুসারে যাকে বলা হয় শিল্পিত ফলিত ধারা তার সমাদর করা সমুচিত হয়েছে, এটি জীবনযাত্রার সমস্ত তুচ্ছ উপকরণে প্রবেশ করে সত্যি করেই জন-জীবনকে শিল্পের প্রাণদ পুষ্টি জোগায়। তাই সম্রাটের শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মের স্টুডিও বিকশিত করে সঠিক কাজ করেছে, সাড়া দিয়েছে বর্তমান কালের চাহিদায়।

'এবার শিল্পের সত্যকার দেশব্যাপী জোয়ারের জন্য যত্নবান হবার সময় পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে শিল্পকর্মের সমস্ত শাখার গভীর বোধ দৃঢ় হতে পারে কেবল এই স্বীকৃতিতে যে শিল্প অখণ্ড, দৈনন্দিন সামগ্রীর শিল্প তাৎপর্য লাভ করতে পারে কেবল শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে আঙ্গিক যোগাযোগে।'

মোটামুটি এই সময় নাগাদ রোয়েরিখ থিয়েটারের জন্যও কাজ শুরু করেন। ১৯০৫ সালে যশস্বী থিয়েটার ভক্ত ও ম্যানেজার ন. ব. দ্রিজেন পিটার্সবুর্গের 'পুরনো থিয়েটারের' জন্য কয়েকটি মঞ্চসজ্জা রচনার জন্য অনুরোধ করেন রোয়েরিখকে। রোয়েরিখ গ্রহণ করলেন প্রস্তাব। থিয়েটারে আকর্ষণ, সঙ্গীতে অনুরাগ থাকায় রোয়েরিখের হৃদ্যতা হয়েছিল অনেক সুরকার, গায়ক, বাদক, অভিনেতার সঙ্গে।

বিশ শতকের গোড়ায় মঞ্চাশ্রিত আলংকারিক চিত্রকলায় জোয়ার এসেছিল, সেটাও শিল্পকর্মীদের দৌলতে। গত শতকের শেষ অবধি জীর্ণ না হয়ে পড়া পর্যন্ত একই মঞ্চসজ্জা দিয়েই কাজ চলল নাটক থেকে নাটকান্তরে। এই 'ঐতিহ্যকে' প্রথম বিদায় দেন আব্রাম্‌ৎসেভোর মামন্তভ থিয়েটারের কর্মীরা। পরে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় থিয়েটারে কাজ করতে শুরু করেন ক. করোভিন, আ. গলোভিন, আল. বেনুয়া, ইয়ে. লানসেরে, ভ. সেরোভ, ল. বাক্‌স্ত প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিত্রকরেরা। তাঁদের স্কেচ অনুসারে বানানো হত মঞ্চসজ্জা বেশভূষা এবং অভিনয়ের যাবতীয় সামগ্রী। থিয়েটারে শিল্পী হয়ে উঠলেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, প্ল্যাকার্ডে তাঁদের নাম থাকত চোখে পড়ার মতো জায়গায়।

দর্শকেরা রোয়েরিখের সজ্জালংকরণ প্রথম দেখে ১৯০৭ সালে 'পুরনো থিয়েটারে' মঞ্চস্থ 'তিন গুণিন' নামে ধর্মীয় প্রতীক নাট্যে। অচিরেই তিনি ভাগনারের 'ভালকিরিয়া' নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং মেতে ওঠেন তাতে। রোয়েরিখের আগ্রহ ছিল সাঙ্গীতিক ও চিত্রপ্রতিমার মিলনে। ভাই বরিসের কাছে পত্রে তিনি লিখছেন: 'খামোকাই তুই 'ভালকিরিয়া' শুনলি না — এ এক অতি উ'চু শিল্পমানের অপেরা, মঞ্চের জন্যই বিশেষ করে লেখা। ভালকিরিয়াদের ধাবনই মনে কর, কী মহীয়ান ছবি, কী তার স্বচ্ছতা আর শক্তি! সঙ্গীতে চিত্রময়তা বুঝতে শেখ্।'

এর বেশ কিছু পরে রোয়েরিখ হয়ে দাঁড়ান ভাগনারের অতি সূক্ষ্ম ভাষ্যকারদের একজন। ১৯২১ সালে ডার্মস্টাড-এর 'Kunst und Dekoration' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ভ. রিটারের প্রবন্ধ, তাতে জার্মান সুরকারের মঞ্চাশ্রিত রচনার রোয়েরিখ কৃত সজ্জাকে বলা হয়েছে ললিত শিল্পের ক্ষেত্রে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ।

রোয়েরিখের সাফল্যে সোরগোল পড়ে যায় ১৯০৯ সালে, যখন প্যারিসের 'শাতলে' থিয়েটারে শুরু হয় প্রথম 'রুশী মরশুম'। রুচিগর্বী ফরাসী সমাজের বিচারার্থে দিয়াগিলেভ নিবেদন করলেন স্বদেশীয় সংস্কৃতির সম্ভার। প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনিত হল মুসর্গস্কি, গ্লিন্কা, রিম্স্কি-করসাকভ, বরোদিন, চাইকোভ্স্কির সুর সঙ্গীত। কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করলেন শালিয়াপিন, স্মিরনোভ, আলচেভ্স্কি। নাচলেন পাভলোভা, কার্সাভিনা, ফোকিন, নিজিন্স্কি। মঞ্চসজ্জা ও বেশভূষার ব্যবস্থা হয় বাক্স্ত্, আল. বেনুয়া, ক. করোভিন, রোয়েরিখের স্কেচ অনুসারে।

'একেই বলে রঙ! একেই বলে সাজ! আমি সবে রাশিয়া থেকে ফিরেছি, ওদের ওখানে সর্বত্রই এইরকম!' একটা অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন মরিস দেনি। অন্যান্য খ্যাতিমান শিল্পীরাও তাঁকে একবাক্যে সমর্থন করেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন জাক ব্লান্শ্: 'আমার ইচ্ছে, প্রতি সন্ধ্যায় 'শাতেলে' যাই শুধু এই রঙগুলোর জন্য। দৃষ্টিকে পরিপৃক্ত করি তা দিয়ে।'

রোয়েরিখ খেটেছিলেন বরোদিনের 'রাজা ইগর' অপেরার 'পলোভেৎসদের নর্তন' দৃশ্যটি এবং রিম্স্কি-করসাকভের 'প্স্কোভ-বাসিনী' নিয়ে। 'ফিগারো' পত্রিকায় পূর্বকথিত জাক ব্লান্শ্ লিখলেন: 'ব্যক্তিগতভাবে রোয়েরিখকে জানার সৌভাগ্য আমার হয় নি... আমি তাঁকে বিচার করছি কেবল 'শাতেলে'র মঞ্চসজ্জা দেখে, আমার কাছে তা অপরূপ লেগেছে। এজন্যও আমি আনন্দিত যে 'প্স্কোভ-বাসিনী'তে সৈন্যদের সাজ বেঞ্জামেন কনস্তানের সৈন্যদের মতো নয়। 'শাতেলে'তে আমি যা দেখেছি তা আমায় নিয়ে যায় মিউজিয়মে, সবকিছু থেকেই ফুটে ওঠে ইতিহাসের এক গভীরতম অধ্যায়, যে মামুলিয়ানা, ছেঁদোমি, বিরক্তিকর গতানুগতিকতায় আমাদের থিয়েটার-দর্শকেরা অভ্যস্ত তার ছায়ামাত্র নেই সেখানে... আর 'ইগর'-এর কথা যদি বলতে হয়, তাহলে প্রথম থেকেই সেটা অবিমিশ্র দৃষ্টিসুধা। পারস্যীয় মিনিয়েচর, রঙে পাগলা করে দেওয়া ভারতীয় শাল, নোত্র্-দামের রঙীন কাচ, অথবা ঝোড়ো দিনের পর উজ্জ্বল সবুজ বাগান যেখানে ফোটে জেরানিয়াম, — এই সবেরই স্বপ্ন দেখিয়েছে আমায় অপূর্ব এই দৃশ্যটা।'

রোয়েরিখের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বদেশবাসীরাও। রোয়েরিখকে ভ. সেরোভ লেখেন: 'প্যারিসে আপনার মঞ্চসজ্জার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই — আমারও স্কেচগুলো খুবই ভালো লেগেছে।'

১৯০৮—১৯০৯ সালে আঁকা হল 'পুতিভ্ল্', 'গালিৎস্কির দরবার', 'ইয়ারোস্লাভনার কুঠি' স্কেচ। রোয়েরিখের মঞ্চ- ও ভূষাসজ্জায় 'রাজা ইগর' লণ্ডনে প্রদর্শিত হয় ১৯১৪ সালে। এ অনুষ্ঠানটি রোয়েরিখের কাছে স্মরণীয় খ্যাতনামা পরিচালক সানিন আর শালিয়াপিনের সঙ্গে পরিচয়ের জন্যও। তিনি লিখেছেন: 'ফিওদোর ইভানোভিচ শালিয়াপিনকে নিয়ে কিছু বলা দায়, কোথায় যে খুঁত ধরবেন বলা কঠিন। রূঢ়ও ছিলেন, তবে আমার প্রতি সর্বদাই সহৃদয়। আমার শক-মঙ্গোলীয় পোশাকের কদর করেন। পরেনও মানানসই ভাবে।'

আরো একটি মঞ্চানুষ্ঠানে রোয়েরিখ প্রাণ ঢেলে খেটেছিলেন, সময় দিয়েছিলেন অনেক। এটি অস্ত্রভ্স্কির 'তুষারিকা', তাঁকে এটি মুগ্ধ করেছিল ছোটো বেলাতেই। রিম্স্কি-করসাকভের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন রোয়েরিখ, তবে তাঁর সঙ্গীতের সমস্ত ভাব-কল্পনাই যে শিল্পী রূপায়িত করতে পেরেছিলেন এমন নয়।

রোয়েরিখের মঞ্চসজ্জায় 'তুষারিকা'র প্রথম

অনুষ্ঠান হয় ১৯০৮ সালে প্যারিসের 'Opéra Comique'-এ, দ্বিতীয়টি ১৯১২ সালে পিটার্সবুর্গে আর তৃতীয়টি শিকাগোয় ১৯২২ সালে। ১৯১২ সালে স্তানিস্লাভ্স্কি ও নেমিরোভিচ-দানচেঙ্কো তাঁর কাছে প্রস্তাব দেন মস্কো আর্ট থিয়েটারে ইবসেনের 'পিয়ের গ্যুণ্ট' নাটকের মঞ্চসজ্জা করে দেবার জন্য। নাটকটি রাশিয়ায় মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে সেই প্রথম, তাই শিল্পীর ওপর চাপ পড়েছিল প্রচুর। ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি লিখেছেন: 'বর্তমানে এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমাদের সবকিছুরই চমৎকার সুরাহা হয়েছে। 'আর্টওয়ালাদের' সঙ্গে প্রথম একত্র কাজের যে অভিজ্ঞতা আমার হল তা অত্যুত্তম। এ সমস্ত কর্মীই সবচেয়ে সেরাটা অর্জনের জন্য একই রকম প্রগাঢ় প্রয়াসে আবিষ্ট এবং সুযোগ পেলেই সাহায্য করে পরস্পরকে। মিলেমিশে সানুরাগে চালানো কাজটা আমাকেও, 'আর্টওয়ালাদের' কাছে নবাগত একটি লোককেও এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছে যেন বহু বছর ধরেই আমরা একসঙ্গে খেটে আসছি।'

নাটকটি চলে চোদ্দটি দৃশ্যে। শেষ দৃশ্যের মঞ্চসজ্জায় সাতিশয় সাফল্য লাভ করেন রোয়েরিখ। কবি স. গরোদেৎস্কি তাঁকে লিখেছিলেন: 'গতকাল সলভেইগের কাছে পিয়ের গ্যুণ্টের প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যটা দেখে আমি কষ্ট আর আনন্দের অশ্রু সংবরণ করতে পারি নি। বহিষ্মান পাইন গাছ, নীল নদী, আর উঁচু কুঠি এখন থেকে চিরকালের জন্য আমার ভেতরটায় রয়ে গেল যেমন রয়ে গেল অপেক্ষমাণা সমুজ্জ্বলা সলভেইগ। কী অপূর্ব করে তুলেছেন নিসর্গদৃশ্যটা!'

১৯১২—১৯১৪ সালে রোয়েরিখ অনেক খাটেন মেটারলিঙ্কের 'রাজকন্যা মালেন' আর 'ভগিনী বিয়াত্রিস' নাটকের মঞ্চসজ্জা নিয়ে।

তিনি বলেছেন: 'মেটারলিঙ্ক নাটকমালা আমার কাছে শুধু নাটকের জন্য স্কেচ, তার অনুচিত্রণ মাত্র ছিল না, সাধারণভাবে প্রসঙ্গ নিয়ে বিন্যাসগুলো আমার খুবই মনের কাছাকাছি। দিতে চেয়েছিলাম স্বরস্বাদের পুরো একটা সিম্ফনি। মেটারলিঙ্কের নীল, বেগুনি, আলতার বর্ণ সঙ্গতি আছে প্রচুর, সেটা আমার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ফ্ল্যান্ডার্স এবং অতুলনীয় ব্রিউগে ভ্রমণ থেকে পেয়েছি একটা প্রগাঢ় মনোবেগ, আগেই যে রূপকল্প গড়ে উঠেছিল তার সমর্থন।'

শিল্পীর এই কাজগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেন স্বয়ং মেটারলিঙ্ক।

মঞ্চ নিয়ে রোয়েরিখের কাজের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান ধরে স্ত্রাভিন্স্কির সুরারোপে 'পবিত্র বসন্ত' ব্যালে। রোয়েরিখ শুধু তার মঞ্চশিল্পী নন, তার লিব্রেত্তো'রও স্রষ্টা। এই ব্যালের কাজটায় তিনি মেতে ওঠেন। এমনকি অনেক বছর পরে স্বদেশের বহু দূর থেকে 'পবিত্র বসন্তে' স্ত্রাভিন্স্কির সঙ্গীতে 'মানবিক আকুতির মহাচ্ছন্দ' স্মরণক্রমে তিনি লেখেন: ''বসন্ত'কে আমরা কেবল রুশ বা স্লাভ বলে ধরতে পারি না, অনেক তা প্রাচীন, সর্বমানবীয়।'

১৯১৩ সালের মে মাসে প্যারিসের শাঁজ-এলিজে থিয়েটারে উদ্বোধন হয় ব্যালের।

দেখা গেল অপ্রত্যাশিত একটা তুমুল প্রতিক্রিয়া। অনুষ্ঠানের সময় প্রেক্ষাগৃহ থেকে শিস আর হল্লায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল অর্কেস্ট্রা। দিয়াগিলেভ দাঁড়িয়েছিলেন উইংসের পেছনে। এতটুকু বিচলিত না হয়ে তিনি বলেন: 'হ্যাঁ, একেই বলে সত্যিকার বিজয়! দিক না শিস, গর্জাক। তার মানে প্রাণে লেগেছে।'

ব্যাপারটা কী?

'পবিত্র বসন্তে' স্ত্রাভিন্স্কি সুর দিচ্ছিলেন খুবই উদ্দীপনা আর বিশ্বাস নিয়ে। ১৯১২ সালে

মার্চ মাসে তিনি লিখেছিলেন: 'ঈশ্বর, কী সুখীই না লাগে যখন এটা শুনি...' আর ডিসেম্বরে রোয়েরিখকে: 'নিজিন্‌স্কি 'বসন্ত'কে মঞ্চস্থ করে উঠতে পারলে বাঁচি, ব্যাপারটা জটিল তো। সবকিছু থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি বিরল একটা কিছু হিশেবে জিনিসটা 'উৎরোবে'!'

প্রথম রজনীর পরিষ্কার ব্যর্থতা সত্ত্বেও দিয়াগিলেভ এবং স্ত্রাভিন্‌স্কি, কারুর ভুল হয় নি — জিনিসটা 'উৎরে'ই গেল। এক বছর পরেই প্যারিস এ সঙ্গীতকে এমনই মাথায় তোলে যে দিয়াগিলেভ তাকে 'নবকালের নবম সিম্ফনি' বলবার হেতু পান। আসলে প্রথম অনুষ্ঠানে গুরুতর ভুল হয়েছিল হিসাবে: ব্যালের সুরকার, নৃত্য-পরিচালক আর তার লিব্রেত্তো বচক ও সজ্জাশিল্পী, সবাই ছিলেন ভিন্নমুখী। যেমন স্ত্রাভিন্‌স্কি লিখেছেন: ''পবিত্র বসন্তে' আমি চেয়েছিলাম প্রকৃতির সমুজ্জ্বল পুনরুজ্জীবন, পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ত পুনরুজ্জীবন, মহাবিশ্বের নব গর্ভাধান...'

স্ত্রাভিন্‌স্কির রচনায় যে উদ্দাম স্বতঃস্ফূর্তি ছিল সেটাই সম্ভবত নিজিন্‌স্কিকে প্রবুদ্ধ করে থাকবে নাচে মানবিক আবেগের মত্ত উচ্ছ্বাস বাড়িয়ে তুলতে, যেটার সঙ্গে ব্যালেতে রোয়েরিখের লিব্রেত্তো আর মঞ্চসজ্জার মিল ছিল কথঞ্চিৎ। তাঁর কাছে প্রধান কথা আত্মোৎসর্গের মহিমা, যেটা 'মহীয়ান আত্মবলিদান' ব্যালের এই প্রথম নামেই সুপ্রকটিত।

আ. বেনুয়া, ল. বাক্‌স্ত, ক. করোভিন, আ. গলোভিনের সঙ্গে সঙ্গে রোয়েরিখও রুশ মঞ্চের চিত্রকলায় নতুনত্ব এনেছেন অনেক, ফ্রান্সে দিয়াগিলেভ প্রযোজিত 'রুশী মরশুমগুলির' সাফল্যে অনেক সহায়তা করেছেন। সেই সঙ্গে থিয়েটারের ব্যাপারে রোয়েরিখের ছিল নিজস্ব একটা মনোভঙ্গি। যেসব মঞ্চানুষ্ঠানে তিনি অংশ নিয়েছেন তাদের প্রকৃতিতেই সেটা প্রতীয়মান। নৈতিকের সঙ্গে নান্দনিককে মেলাবার প্রয়াসে দৃশ্যকাব্যাদির ভাবদর্শীয় বিষয়বস্তু নিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট দাবি ছিল রোয়েরিখের।

থিয়েটার ব্যাপক জনের শিল্প, প্রাচীনতম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রীড়াসমাবেশ, সংগুপ্ত ভজনপূজন থেকে তার উদ্ভব, তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে জনগণের জীবন, চারিপাশের জগত আর মানুষ, তার অনুভূতি, আবেগ, জীবনের অর্থ ও সত্যের জন্য তার নিরলস সন্ধান বিষয়ে জনগণের ধারণা। বিকাশের গতিপথে যে রূপেই তা পরিগ্রহ করুক, জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্ক এমনকি তখনো কেটে যায় নি যখন মঞ্চে দেখা দিল পেশাদার অভিনেতারা। নাটক আর দর্শক পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, নাট্যকলা সর্বদাই থাকবে জনগণের জন্য শিল্প, লোকশিল্প।

চিরকাল রোয়েরিখের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রুশী লোকশিল্পের মর্মেই আছে একটা মহাকাব্যিকতা। তাই সংশ্লেষিত নাট্যকলায় তিনি প্রাণপণে ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন মানবিক অনুভূতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মঞ্চসজ্জার সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য। লোককীর্তি রূপায়ণের সম্ভাবনাই তাঁকে মঞ্চে টেনেছিল।

অধ্যয়ন করতে হবে ইতিহাস আর শিখতে হবে ইতিহাসের কাছ থেকে। লৌকিক স্মৃতি থেকে আহরণ করতে হবে শিক্ষা, লৌকিক সৃজনের অম্লান সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে হবে সযত্নে, আধুনিক জীবনে খুঁজে পেতে হবে তার যথাযোগ্য স্থান — এই চিন্তাতেই বিজ্ঞানী, শিল্পী, অধ্যাপক রোয়েরিখ ছিলেন আলোড়িত।

৪। শিল্পী ও মনস্বী

১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সাল অবধি নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের কাজ সর্বদাই দেখানো হয়েছে বিদেশে রুশ শিল্পের প্রদর্শনীতে। প্যারিস, ভেনিস, বার্লিন, রোম, ব্রাসেলস, ভিয়েনা, লন্ডন পরিচয় পেয়েছে তাঁর শিল্পকর্মের। তাঁর ছবি কিনেছে রোমের জাতীয় মিউজিয়ম, প্যারিসের লুভ্র আর ল্যুক্সেমবুর্গ মিউজিয়ম, অন্যান্য ইউরোপীয় শহরের গ্যালারি। ১৯০৯ সালে রোয়েরিখ নির্বাচিত হন রুশ শিল্প অকাদেমিতে, বৃত হন ফ্রান্সের রেইম অকাদেমির সদস্যপদে।

প্রগাঢ় মৌলিক প্রতিভার জন্য শিল্পী হিশেবে রোয়েরিখকে অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ কাল কাটাতে হয় নি। বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও অনুধ্যানে তাঁর স্বকীয়তা অচিরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিল্প সমালোচকদের। ১৯০৭ সালে আ. রস্তিস্লাভোভ লেখেন: 'রোয়েরিখ সম্ভবত আমাদের কালের সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক শিল্পীদের একজন। উনি যে আমাদের এখানে একক, একেবারে একক। অপরের, এমনকি খুবই শক্তিশালী প্রভাব তাঁর কাছে বিজাতীয়, এমন কথা বলা চলে না, যেমন ভাস্‌নেৎসভ থেকে দ্রুবেল, প্রাচীন ইতালীয় শিল্পাচার্য আর মিনিয়েচার শিল্পী থেকে আমাদের ইয়ারোস্লাভ্‌ল ও নভগোরদের দেবপটুয়া, পিউভিস দ্যে শাভাঁ আর উত্তরী রীতিপন্থীদের থেকে পশ্চিমের সূক্ষ্মায়িত রেখাশিল্পীদের অতি জটিল ও বিচিত্র প্রভাব। কিন্তু এইসব প্রভাবাধীনতাতেও সর্বদাই অনুভূত হয় মৌলিকতা, নিজের বিশেষ চিত্রগত ও শৈলীগত স্বকীয়তার প্রয়াস।'

পরবর্তী কালে রোয়েরিখের একান্ত অনুরাগী সাহিত্যিক লেওনিদ আন্দ্রেয়েভ তাঁর শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে একটি লাগসই শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন — 'স্বরাজ্য'। সত্যিই রোয়েরিখ তাঁর আবিষ্কৃত প্রকরণে উপস্থিত করেছিলেন তাঁর নিজস্ব সুন্দরের জগত। ব্যঞ্জনায় শব্দটির ধারকত্ব ছিল এমনই যে বিভিন্ন ভাষ্যভেদে তার বহুল প্রচলন হয় শিল্পী ও শিল্পবেত্তাদের মধ্যে। যেন তারই পুনরাবৃত্তি করে এ শতকের বিশের দশকে শিল্প-সমালোচক এ. গল্লেরবাখ লিখলেন: 'রোয়েরিখ... এ নাম শিল্পীর সৃজনী সংকল্পে মর্ত্যে সঞ্জীবিত গোটা মহাবিশ্বের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে বহুদিন, গভীর তাৎপর্যের প্রতিমা নিয়ে গোটা বিশ্ব, প্রাচীন এই উক্তির প্রজ্ঞায় তা উদ্দীপিত: 'সোফিয়া' মানে দক্ষতা, সামগ্রী তৈরির নৈপুণ্য। খামোকাই সত্যকার শিল্পীদের 'প্রাজ্ঞ' বলে অভিহিত করেন নি পিন্ডার আর আরিস্টটল।'

রোয়েরিখের সৃষ্টিকর্মের দ্বিতীয়, পুরোপুরি পরিণত পর্বটার সূচনা ধরা যেতে পারে মোটামুটি

১৯০৬ সাল। ইতিমধ্যে তাঁর 'স্বরাজ্য' নিজের স্বকীয় চারিত্র্য অর্জন করেছে। দেশ ও বিদেশের প্রদর্শনীতে ঘন ঘন তাঁর ছবির আবির্ভাব এবং সাধুবাদ থেকে মনে হতে পারত যে শিল্পীর মূল্যায়নে এর অধিক কোনো চমকপ্রদের অবকাশ নেই। কিন্তু ১৯০৯ সালে পিটার্সবুর্গের 'সালোঁ'তে যখন রোয়েরিখ তাঁর এযাবৎ সঞ্চিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো দেখান, তখন, বেনুয়ার উক্তি মতে, মনে হয়েছিল যেন জাহাজ একপাশে হেলে পড়েছে আর গোটা 'সালোঁ' যেন শুধু রোয়েরিখের জন্য একটা ফ্রেম।

রোয়েরিখের 'লড়াই' ছবিটিকে প্রায় সবাই একবাক্যে ঘোষণা করে 'সালোঁর' সেরা চমক বলে। এতে দেখানো হয়েছে অসমসাহসী স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাইকিঙদের, নৌকো করে কাছিয়ে আসছে তারা, শুরু হচ্ছে লড়াই। অলক্ষুণে তাম্ররক্তিম আকাশে ভেসে যাচ্ছে ছেঁড়া ছেঁড়া ভারী মেঘ, তীরের দুর্গম গিরিশিলাগুলোর মতোই তারা ভয়াবহ। ফেনিয়ে উঠছে তুহিন জল। যোদ্ধাদের ঢাল আর বাতাসে ফুলে ওঠা পালে রক্তের ছটা।

ঐতিহাসিক খুঁটিনাটিগুলো শিল্পী তুলে ধরেছেন যথাযথ। অঙ্কনের সারল্য আর রঙের ছাড়া ছাড়া বিন্যাস যাতে মনে পড়ে যায় পুরনো মজেয়িকের কথা, তাতে সুদূর অতীতের অনুভূতিটাই প্রখর হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে রোয়েরিখের আগের চেয়ে একটু ভিন্ন দৃষ্টি ছবিতে অলক্ষ্য নয়। আগের ছবিগুলোয় রোয়েরিখ ইতিবৃত্তের ঘটনায় উদাসীন থাকেন নি, লড়াইয়ের দৃশ্যগুলোয় সর্বদাই টের পাওয়া যেত কোন পক্ষে শিল্পীর সহানুভূতি। 'লড়াই' ছবিটিতে কিন্তু শিল্পীর কাছে ন্যায়পক্ষ বা অন্যায়পক্ষ বলে কিছু নেই, কে হারবে, কে জিতবে সে বিষয়ে তিনি নির্বিকার। ছবিটার প্রধান কথা যুদ্ধের ফলাফল নয়, তার উদ্দাম ভৌতশক্তি, করাল দুর্বারতা, যা সংঘর্ষের ঘূর্ণ্যাবর্তে টেনে আনছে মানুষ, জাহাজ, প্রকৃতিকে।

আগে 'দুর্লক্ষণ' ছবিতে যে রূপকধর্মী চিত্রপ্রতিমার সন্ধান তিনি করেছিলেন, সেটা ছবিতেও আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর আগের কাজগুলোর যা বৈশিষ্ট্য, সেভাবে পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের নাটকীয় ঘটনা দিয়ে দর্শকদের দোলায়িত করতে তিনি চান নি 'লড়াই' ছবিটিতে। ছবির প্রথম প্রকারভেদে রোয়েরিখ আকাশে এঁকেছিলেন যুধ্যমান ভালকিরিয়াদের মূর্তি — এরা হল স্ক্যান্ডিনেভীয় অতিকথার কুমারী রণরঙ্গিণী। তারাই ছিল বিন্যাসের কেন্দ্রীয়াংশ। কেবল নিচের অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ফালিটায় ছিল নৌযুদ্ধ, যা দেখিয়েছিল যেন অপার্থিব মহাশক্তিদের সংঘর্ষের একটা ক্ষীণ প্রতিবিম্ব। কিন্তু যুদ্ধের ভৌতশক্তির এই প্রতীকী রূপটায় তুষ্ট হতে পারেন নি শিল্পী। 'অদৃশ্যই থাকুক' এই বলে তিনি ভালকিরিয়াদের আঁকেন বহিমান সূর্যাস্ত আর রক্তনীল মেঘের আকারে। এতে প্রকাশ পায় তাঁর উঁচু দরের শিল্পবোধ। আকাশের ভয়ংকরতায় চিত্রের ভাবাবেগ বাড়ে, রূপ পায় তাঁর দার্শনিকতা।

'লড়াই' ছবিটি এই দিক থেকেও চিত্তাকর্ষক যে সাধারণভাবেই প্রতীকবাদ বিষয়ে রোয়েরিখের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে এতে। তথাকথিত চিরায়ত, সোজা কথায় ব্যবহারজীর্ণ পৌরাণিক মূর্তি বর্জন করেন তিনি। সেইসঙ্গে তৎকালের স্বকপোলকল্পিত, আধুনিক প্রতীকবাদেও তিনি আস্থাহীন। সংস্কৃতির ঐতিহাসিক হিশেবে রোয়েরিখ ভালোই জানতেন যে সত্যিকারের প্রতীক জন্ম নেয় না এক ঘণ্টার খেয়ালে। অস্তিত্ব ও সমাজজীবনের পুরোপুরি বাস্তব ঘটনা থেকে জনগণ গড়ে তোলে দীর্ঘস্থায়ী, বোধগম্য প্রতীক।

আধ্ুনিক চিত্রকলা সমেত অন্য ধরনের পরিবেশে তার যান্ত্রিক স্থানান্তরণ সার্থক হতে পারে না কখনো। তাই নতুন চিত্রপ্রতিমার একাগ্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন তিনি।

ঠিক ঐতিহাসিক ক্যানভাসের জন্যই তার প্রয়োজন হল কেন?

রুশী ঐতিহাসিক চিত্রকলার ঐতিহ্য ছিল মূলত অতীতের পুনর্নির্মাণ, জনগণের চিত্তশক্তি ও সক্রিয়তার উৎস উন্মোচন।

রোয়েরিখের প্রথম দিককার ছবিগুলো এই নির্দিষ্ট কাজটাই এগিয়ে নিয়ে যায় ও তাকে প্রগাঢ় করে। কিন্তু বাস্তব পুনর্গঠনের প্রধান শক্তি হিশেবে যিনি শিল্পকে দেখেন, তাঁর দাবি কি এতেই মেটে? আধুনিক শিল্পের একটা বড়ো জায়গার জন্য যিনি সংগ্রাম করছেন, তিনি তাঁর সুন্দরের জগৎকে কি সীমিত রাখতে পারেন ধূসর অতীতের ঝাপসা দিশাবিন্দুগুলির মধ্যে? অবশ্যই নয়। যত দিন গেল, অতীতকে শিল্পী ততই ঠেলে দিলেন গৌণ স্থানে। ইতিহাস, লোকযান, অতিকথা পরিণত হল একটা উৎসে যেখান থেকে আহরিত হতে থাকল রূপকধর্মী ললিত কলার সম্ভার। লৌকিক সৃজনের বহু উপাদানে পুষ্ট হয়ে তা সমকালীনদের সঙ্গে আলাপের উপযোগী প্রত্যয়জনকতা আর নমনীয়তা এনে দিল।

ক্রমশই সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠল রোয়েরিখের আগ্রহের প্রশস্ত পরিধি, যেসব প্রশ্নের সমাধানে তিনি নিজের সমস্ত জ্ঞান, কর্মোদ্যোগ, প্রতিভা নিয়োগ করেছিলেন, তা দানা বাঁধল। মানববাদী ভাবনা, নৈতিক ও নান্দনিক লালন, বিশ্ব পুনর্গঠনের মতো মানবিক ক্রিয়াকলাপ — অতীতের নেহাৎ অভিজ্ঞা আর ব্যাখ্যার চেয়ে এইগুলিই হয়ে উঠল রোয়েরিখের কাছে প্রধান।

'লড়াই' ছবিটির কাজে সাধারণীকৃত দার্শনিক ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ সদ্ব্যবহারের জন্য শিল্পীর অন্বেষণই পরিস্ফুট। 'ভ্যারাঙ্গিয়ান ভাইকিঙদের সামুদ্রিক যুদ্ধ' এই প্রচলিত নামটির চেয়ে ছবিটির মর্মার্থ ভালো ফুটবে কবি আ. ব্লকের ছত্রে: 'কেবলি যুদ্ধ! শান্তি, সে শুধু স্বপ্ন...'

একই ধরনের অনন্য দ্যোতনায় রোয়েরিখের বহু নিসর্গচিত্রও বিশিষ্ট। শিল্পী তাদের নিষিক্ত করেছেন নিজের ভাবাদর্শীয় দর্শনে, প্রকৃতির প্রতিমূর্তিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন মানবিক ভাবাবেগ আর মেজাজ।

রোয়েরিখের ক্যানভাসে ব্যক্তিচরিত্রের অনুপস্থিতির কথা একাধিক বার উল্লিখিত হয়েছে সমালোচনায়। লোকজন আঁকলেও যে ব্যক্তিস্বরূপ একান্তই তাদের নিজস্ব সেটি হরণ করেছেন শিল্পী। রোয়েরিখের পক্ষে এটা খুবই সঙ্গত। নিজের 'স্বরাজ্যে' তিনি বসত দিতে চেয়েছিলেন স্বল্পকালীন নাটক ও প্রহসনের চরিত্রদের নয়, জীবনের সত্য সম্পর্কে, সু আর কু'য়ের হাজার হাজার বছরের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে, সবার জন্য সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের জয়যাত্রা সম্পর্কে অনেক অবিচল একটা ধারণার যারা বাহক, তাদের।

'লড়াই' ছবিটির মতোই 'পমরিয়ানে*॥ সকাল' (১৯০৬), 'পমরিয়ানে॥ সন্ধ্যা' (১৯০৭), 'অন্তরীক্ষে যুদ্ধ' (১৯০৯), 'সাগর পারে মহাভূমি' (১৯১০) চিত্রে রোয়েরিখ যা নিয়ে ভাবিত তা ঐতিহাসিক ও নৈসর্গিক চিত্রের চিরাচরিত ধারণানুগ নয়।

যেমন, 'পমরিয়ানে॥ সকাল' ছবিটি রচিত যেসব উপাদানে তার ব্যুৎপত্তিতে রোয়েরিখ অতুলন। কাঠের প্রাচীন ঘরবাড়ি সমেত নিসর্গচিত্র আর পশ্চিমী স্লাভদের দিনযাত্রার দৃশ্যে শিল্পী

---

* সাগর তীরের অধিবাসী। — অনুঃ

ইতিহাসাশ্রয়ী। কিন্তু আসলে ঐতিহাসিক উপাদান শুধু একটা পট যার প্রেক্ষিতে ফুটে উঠছে এক সুসম প্রসন্ন জীবনের সাধারণীকৃত শিল্পপ্রতিমা। বরাভয় প্রকৃতি, পোশাকী সাজে লোকজন, বর্ণের স্নিগ্ধ, শ্যামলাভ নীল টোন — এসবে বিগত যুগের উৎকণ্ঠিত দীনহীন জীবনের চেয়ে আলোকিত ভবিষ্যতেরই একটা স্বপ্ন আভাসিত।

'অন্তরীক্ষে যুদ্ধ' ছবিটি ভাবকল্পনা ও বিন্যাস, উভয়তই 'লড়াই'-এর অনুরূপ। বন্ধুর উপত্যকা তার হ্রদ আর মাচার ওপরে বানানো ঘরবাড়ি নিয়ে ছবির এক-পঞ্চমাংশের বেশি জায়গা নেয় নি। বাকিটা কুণ্ডলিত মেঘ, কখনো তা সোনালী রোদে বিদ্ধ, কখনো বজ্রগর্ভ মেঘের নীলে গম্ভীর। আলো আর অন্ধকারে যুদ্ধ, শিল্পী এখানে জোর দিয়েছেন প্রকৃতির চণ্ডশক্তিতে। মাচার ওপরে গড়া বসতিটা যেন ভৌতশক্তির সংঘর্ষের পরিণামের অপেক্ষায় চুপ করে গেছে। এই ঐতিহাসিক উপাদানটি অনায়াসে মুছে ফেলা বা বদলে দেওয়া যায়, তাতে শিল্পকর্মটির মূল দ্যোতনার বদল ঘটবে না।

'সাগর পারে মহাভূমি' ছবিটি উল্লেখযোগ্য। আপাতদৃষ্টিতে এর প্রসঙ্গটি সহজ — পাথর ছড়ানো সাগরতীর, তার পটে জাতীয় পোশাকে পুষ্পিত ডাল হাতে একটি মেয়ে। ছবিটি আঁকা হয় বলটিক অঞ্চলে। খুঁটিয়ে চিত্রিত সাজটা থেকে বোঝা যায় শিল্পীর নরকৌলিক আগ্রহ আর নিসর্গদৃশ্য থেকে দেখা যায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর নৈপুণ্য। কিন্তু স্বয়ং শিল্পীর ব্যাখ্যাটা এই রকম: 'সুদূরের হাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উত্তরের অজানা অপরূপ সব দেশের কথা ভাবছে মেয়েটি, সেই রূপকথার দেশ যার অধিষ্ঠান মানুষের হৃদয়ে।'

রোয়েরিখের কাজে প্রতীকী প্রবণতার উল্লেখ আমাদের শিল্পবেত্তারা করেছেন একাধিক বার। সমগ্রভাবে সেটা সঠিক। রোয়েরিখের কাছে একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল প্রতীকবাদের, কেননা তাঁর সৃজনী মন্ত্র, তাঁর 'শিল্পে সুন্দরের' আদর্শের পক্ষে প্রকৃতিবাদ (তৎসমবাদ, naturalism) একান্ত অস্বাভাবিক। তাই ঐতিহাসিক অথবা নৈসর্গিক চিত্রের সীমা অতিক্রম করে সাম্প্রতিক সামাজিক ও দার্শনিক সমস্যায় পৌঁছতে গিয়ে শিল্পীকে নিতেই হয়েছিল রূপকের আশ্রয়।

তাঁর শিল্পকর্মে লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছিল তাঁর আগ্রহের বৈচিত্র্য। শুধু ইজেলের কাজে সীমিত থাকতে তিনি পারেন নি। তালাশকিনোর স্টুডিও এবং থিয়েটারে 'আরো ব্যাপকভাবে জীবনে সুন্দরের আবাহন' বিষয়ে তাঁর কল্পনা ছাড়া পেয়েছিল অংশত। এই দিক থেকে স্থাপত্য এবং আলংকারিক মনুমেণ্ট শিল্পে তাঁর আগ্রহ দুর্বোধ্য নয়। রোয়েরিখ ছিলেন রুশ স্থপতিদের সমিতিতে ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর সদস্য, অংশ নেন ঐতিহাসিক স্মরণিকার পুনরুদ্ধারে।

মনুমেণ্ট ধরনের আলংকারিক কাজ তিনি শুরু করেছিলেন ১৯০২ সালেই — 'চাইকা' মজেয়িকের জন্য স্কেচ আর 'রাজার শিকার' প্যানেল। ১৯০৫ সালে রোয়েরিখ পিটার্সবুর্গে ভূতপূর্ব 'রোস্‌সিয়া' বীমা কোম্পানির ভবনের জন্য স্তম্ভশীর্ষের মাইওলিকার স্কেচ করেন। বিষয়বস্তু প্রাচীন রুশ যোদ্ধাদের বিভিন্ন দৃশ্য নিয়ে। রূপে সরল, সিলুয়েটে সুতীক্ষ্ণ, বর্ণে যথাযথ এই মাইওলিকাগুলি খুবই মানিয়ে গিয়েছিল ভবনের কঠোর বহির্ভাগের সঙ্গে।

১৯০৬ সালে যখন 'লড়াই' ছবিটি আঁকছিলেন, তখন তিনি এই বিষয় নিয়েই একটি মজেয়িক কম্পোজিশন করেন। এটি এখন রক্ষিত আছে লেনিনগ্রাদে, শিল্প অকাদেমির মজেয়িক বিভাগে।

মজেয়িক নিয়ে রোয়েরিখের ছিল একটা সুচিন্তিত, সুগভীর অভিমত। তিনি বলেন: 'প্রতিটি চিত্রকরেরই উচিত অন্তত খানিকটা মজেয়িক কাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। তা থেকে তিনি পাবেন ভাসা-ভাসা অলংকরণ নয়, ভাবতে হবে টোনের পুরো একটা ঐকতানের মনোনিবদ্ধ নির্বাচন নিয়ে। মজেয়িকের জন্য যা রচিত নয়, সে ছবি মজেয়িকে অর্পণ করা ঠিক নয়। যে উপকরণে তা রূপায়িত হবে স্কেচে তার প্রকাশ থাকা চাই। এই টেকনিকাল বিবেচনাটা যেমন রঙীন কাচের মজেয়িকে তেমনি আমাদের জীবনের মজেয়িকেও প্রযোজ্য। সেরা সাহিত্যকর্ম মজেয়িকের লক্ষণাক্রান্ত, মনুমেণ্টসুলভ প্রভাব আর সেই সঙ্গে সমস্ত খুঁটিনাটির হিশেবই তার শক্তি। মজেয়িক শিল্পীর কর্তব্য হল পাথরের সমস্ত প্রজ্জ্বলিত রঙ অক্ষুণ্ণ রেখে সাধারণীকরণ। কিন্তু জীবনেও তো প্রতিটি সাধারণীকরণ গড়ে ওঠে আলাদা আলাদা ঘাত, রঙ, ছায়া আর আলোকসম্পাতে।'

গৃহের অভ্যন্তর-সজ্জায় রোয়েরিখের একটা চিত্তাকর্ষক কাজ হল পিটার্সবুর্গের একটি ব্যক্তিগত গৃহের ভোজনকক্ষে 'মহাবীর' নিয়ে স্তম্ভশীর্ষ (১৯০৯)। বর্তমানে প্যানেলটি আছে রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়মে।

স্থিরচিত্র দিয়ে ভোজনকক্ষ অলংকৃত করাই ছিল রেওয়াজ — ভক্ষ্য পশুপাখি, ফলমূল, শব্জি; কখনো কখনো মৃগয়া বা রাখালিয়া জীবনের ছবিও থাকত। এই বহুব্যবহৃত ধারায় না গিয়ে রোয়েরিখ লোককাহিনী অবলম্বন করেন। তাঁর স্তম্ভশীর্ষের কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ 'ধনী অতিথি সাদকো'। নগরের দিকে ভেসে আসছে নভগোরদের মহাবীরের সুসজ্জিত নৌবহর, ইনি অস্ত্র হাতে আত্মরক্ষা করেন, বাণিজ্য চালান, তারযন্ত্র বাজিয়ে তুষ্ট করেন সমুদ্ররাজকে, আবার নিরাপদে ফিরে আসেন সমুদ্রগর্ভ থেকে...

জনগণের অন্তর্লোকই ঐশ্বর্যশালী, আর রোয়েরিখ তাকে উন্মীলিত করেছেন তাঁর প্যানেলে। আছে সেখানে রুশ লোককথার সমস্ত চরিত্র — হলধর মিকুলা সেলিয়ানিনোভিচ আর অশ্বপৃষ্ঠে মহাবীর ইলিয়া মুরোমেৎস, দস্যু সলোভেই আর চারণ কথক, আর যোদ্ধা।

১৯১১ সালে রোয়েরিখ রচনা করেন সুরকার রিম্‌স্কি-করসাকভের সমাধিফলকের প্রকল্প, কিছুটা আধুনিকীকৃত স্লাভ শৈলীতে। ১৯১৩ সালে করেন আ. ই. কুইঞ্জির সমাধিস্তম্ভের জন্য মজেয়িকের স্কেচ। দুটি স্মরণিকাই রয়েছে আলেক্‌সান্দর-নেভ্‌স্কি মঠের সমাধিক্ষেত্রে।

শিল্পশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের অধ্যয়নে অনেক সময় দিয়েছিলেন রোয়েরিখ। তাঁর প্রাবন্ধিক ক্রিয়াকলাপ এর পরিচায়ক। প্রায়ই তাঁর প্রবন্ধ বেরুত দৈনিক কাগজে, 'স্তারিয়ে গোদি', 'ভেস্তনিক ইয়েভরোপি,' 'ভেসি,' 'জলোতয়ে রুনো' প্রভৃতি পত্রিকায়। শিল্পের তীক্ষ্ণ সমস্যাদি নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় উঠত, তা থেকে সরে থাকতে পারতেন না তিনি। বিশ শতকের গোড়ায় শিল্পের অবক্ষয় নাকি পুনরুজ্জীবন, সৃজনের সমাজমুখীনতা নাকি 'স্বাধীনতা', বাস্তববাদ নাকি অন্য কোনো শিল্পপ্রকরণ — এই নিয়ে তর্ক জমে উঠত রুশ সমালোচনা সাহিত্যে।

রোয়েরিখের সাহিত্যিক রচনায় যথেষ্টই প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর বিশ্ববীক্ষা। এটা গড়ে উঠতে থাকে আগেই। ছেলেবেলাতেই পৈত্রিক বাড়িতে লোকসমাগম ও নিরন্তর দার্শনিক আলোচনা তিনি স্মরণ করেছেন। তারপর উচ্চশিক্ষাকালে উত্তপ্ত বিতর্কের পালা। টগবগ করত তরুণ চিন্তা, এক আচার্যকে বর্জন করে সন্ধান চলত অন্যের।

নিজের দার্শনিক ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি

রোয়েরিখ প্রথম পেশ করেন 'শিল্পে আনন্দ' (১৯০৮) নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে।

জীবনের সমন্বয় সাধনে তিনি প্রধান ভূমিকা দেন শিল্পকে। শিল্পই নিয়ে আসে সৌন্দর্যের আনন্দ, সৃজনের আনন্দ, বিশ্ব পরিজ্ঞানের আনন্দ, আলোকিত মানবিক প্রজ্ঞার আনন্দ। মানুষের আত্মিক বিবর্তনের মাপকাঠি হল শিল্প। নিজের সিদ্ধান্ত তিনি সমর্থন করেন ইতিহাসের ঘটনা এবং প্রস্তর যুগ পর্যন্ত প্রাচীন স্মরণিকাদির নজির দিয়ে: 'জীবনের আনন্দে স্বাধীন প্রস্তর যুগ ভরপুর। পরবর্তী কালের ক্ষুধার্ত লোলুপ নেকড়েরা নয়, অরণ্যরাজ ভল্লুক, সওয়াী এবং আহার্যের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, পরাক্রান্ত আর উদার, ক্ষিপ্র আর গুরুভার, রোষকষায়িত অথচ হিতৈষী, কেড়ে নেয় আবার ছাড় দেয় — এই হল প্রস্তর যুগের মানুষের টাইপ... সামঞ্জস্য ও ছন্দের স্বতঃচেতনায় চালিত মানুষ অবশেষে পুরোপুরি আত্মনিবেদন করে শিল্পে। পুরোপলীয় দুই যুগে বিজয়ী উন্নত করে তার বাসস্থান এবং গোটা জীবনযাত্রা।' প্রবন্ধে তিনি রুশ ও বিশ্ব ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট ঘটনাদি থেকে শিল্প এবং বিভিন্ন যুগের সামাজিক বিকাশের নির্ভরশীলতা অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন।

অবজেকটিভ ভাববাদের অধিকাংশ প্রতিনিধির মতো তিনিও বিশ্বের বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করেন নি, নিজের নন্দনতত্ত্বে এগিয়েছেন তা থেকেই। কিন্তু জীবনের সঙ্গে শিল্পের জটিল সম্পর্কের বিচারে তিনি কারণের স্থলাভিষিক্ত করেছেন কার্যকে, শিল্প ও 'আত্মার শক্তিকে' গণ্য করেছেন 'জীবনের প্রথম চালিকা শক্তি' বলে।

যে বিশ্বব্যবস্থা থেকে মানবিক প্রজ্ঞার জন্ম, তাতে একটা প্রগাঢ় ও অটল বিশ্বাসই আমরা এখানে পাচ্ছি। এই বিশ্ববিশ্বাস রোয়েরিখের যুক্তিবাদকে নিয়ে এসেছে তলস্তোয়ের দার্শনিক বিশ্ববীক্ষার কাছাকাছি। মহান রুশ সাহিত্যিক ও মানববাদী বিপুল প্রভাব ফেলেছিলেন তরুণ রোয়েরিখের ওপর। পরেকার প্রবন্ধগুলিতে তলস্তোয়ের এবং তলস্তোয় যাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন সেই ব্রিটিশ শিল্প-তাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক জন রেস্কিনের উদ্ধৃতি আছে ঘন ঘন।

রেস্কিনের কাছে শিল্পের মূল কাজ হল ধর্মীয়-নৈতিক ধারণার রূপায়ণ। তাঁর চিন্তা ছিল 'ঐশ্বরিক প্রকৃতির' ধর্মীয় বোধ, তার 'আদর্শ বিধি' নিয়ে।

তলস্তোয়ের সৃষ্টি সর্বদাই আশ্রয় করেছে বাস্তব জীবনের জ্ঞানকে, দার্শনিক হিশেবে তিনি যুক্তিবাদকে বর্জন করেন নি। তাহলে রেস্কিনে তলস্তোয় আকৃষ্ট হলেন কেন? অংশত নিশ্চয় ধর্মীয়-নৈতিক ভিত্তির প্রবর্তনা এবং বুর্জোয়া সমাজের আত্মিক সংকটের তীব্র সমালোচনা তার কারণ। জীবনের ক্রমাগত পৌরীভবনের মধ্যে যে বিপদ নিহিত, সেটা রেস্কিনকে চঞ্চল করে তুলেছিল বিশেষ করে। ঠিক এইজন্যই গান্ধীও ছিলেন এই ব্রিটিশ সমালোচকের অনুরাগী। জীবনের বিদ্যমান ব্যবস্থায় অতৃপ্তি এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নিশ্চয় রোয়েরিখের চিন্তাও সাড়া দিয়েছিল।

তাহলেও শিল্পী এমন কতকগুলি স্বাধীন সিদ্ধান্তে আসেন যা ব্রিটিশ মনস্বীর কিছু কিছু মূল প্রত্যয়ের তীব্র বিরোধী। যেমন 'প্রকৃতি সমীপে' (১৯০১) প্রবন্ধে রোয়েরিখ লেখেন: 'প্রকৃতি থেকে বিকশিত, মানবের সৃষ্ট নগর আধিপত্য করছে মানবের ওপর। বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে নগর প্রকৃতির সরাসরি বিপরীত; যা মেলানো যায় না তাকে মেলাবার কোনোরকম সাধারণীকৃত প্রয়াস ছাড়াই তা থাকুক সরাসরি বিপরীত সৌন্দর্যে... শহরের রূপ আর প্রকৃতির রূপের মধ্যে বৈপরীত্যে ভয়াবহ কিছু নেই।

সুন্দর সুন্দর বিপরীত বর্ণ যেমন পরস্পরকে নাকচ করে না, শহর ও প্রকৃতির সৌন্দর্যও তেমনি তাদের বৈপরীত্যে হাতে হাত মিলিয়ে চলে এবং উভয়ত ছাপ জোরালো করে এবং 'অজানার' রূপে যে তৃতীয় স্বরগ্রামে রণিত তা দিয়ে ব্যজিয়ে দেয় এক প্রবল গান্ধার।'

এ যেন প্রকৃতির কোলে আসার ডাক দিয়েও রোয়েরিখ নগরকে দিচ্ছেন প্রায় তার সমান স্থান। শহরের সঙ্গে প্রকৃতির, অর্থাৎ স্বাভাবিক 'আদর্শ বিধির' সঙ্গে মানবসভ্যতার পারস্পরিক ক্রিয়া অথবা অন্য কথায় 'ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে' মানবিক ইচ্ছার অভিঘাতে, রোয়েরিখের মতে, নতুন একটা অর্থ গড়ে ওঠে, মানুষের বোধি ও সংকল্প ছাড়া যা সম্ভব হত না।

এটা শুধু রেস্কিনের নয় তলস্তোয়ের মতামতের ওপরেও একটা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী। বেশ দেখা যাচ্ছে যে 'তলস্তোয়বাদে' পরে যেসব সরলীকৃত প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তাতে সায় ছিল না রোয়েরিখের।

তাহলেও নিজেদের সৃষ্টিকে শুভের প্রতিষ্ঠাধীন করে তলস্তোয় ও রোয়েরিখ জাতীয় সমস্যা সমেত বহু সমস্যার সমাধানে এগিয়েছিলেন একই ভাবে। এটা লক্ষণীয় যে নিজেদের সৃষ্টিতে জাতীয় চরিত্রের সমুজ্জ্বল অভিব্যক্তি সত্ত্বেও তলস্তোয় এবং রোয়েরিখ উভয়েই ছিলেন স্বজাতিবাদের প্রতি বিরূপ। নৈতিক মানদণ্ডের সন্ধানে সাহিত্যিক ও শিল্পী উভয়েই বিভিন্ন জাতি ও যুগের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। রোয়েরিখ লিখেছেন: 'জ্ঞানের নিকেতনে আমরা জানতে পারি যে আলাদা আলাদা জাতিসত্তা মূল্য ধরে না। নির্দিষ্ট একটা উপজাতি কী করল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের মহা সমভূমিতে কী ঘটল, সেইটেই শিক্ষাপ্রদ।'

তলস্তোয় ও রোয়েরিখের রচনায় একটা বড়ো স্থান নিয়েছে ধর্মবিশ্বাসের সমস্যা। সাহিত্যিক ও শিল্পী 'সর্বোচ্চ সুনীতির' যে ধারণা পোষণ করতেন তা নিয়ে তাঁদের মূল্যায়নে যত বেশি মতভেদ ঘটেছে, যত বেশি তাঁদের অনুরাগী ও বিরোধী জুটেছে এমন আর কিছুতে হয় নি। তলস্তোয়ের ধর্মীয়-নৈতিক এষণার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রোয়েরিখ 'ঐশ্বরিক বিধান'কে শুধরে নিয়েছেন নিজের মতো করে। একটি কবিতায় রোয়েরিখ লিখেছেন:

> অবশেষে ঋষিকে পেলাম।
> জানেন তো, এইখানে এই পৃথিবীতে
> ঋষি মেলা কতটা কঠিন।
> শুধালাম আমায় সে দেখাবে কি পথ,
> নেবে কি আমার কাজ
> অনুগ্রহভরে?
> বহুক্ষণ চেয়ে থেকে শুধাল সে মোরে
> কী আমার সবচেয়ে প্রিয়,
> সবচেয়ে মূল্যবান? জবাব দিলাম:
> 'সৌন্দর্য।' 'যা প্রিয় সবচেয়ে
> তাকে রেখে যেতে হবে।' 'এমন অনুজ্ঞা
> কে দিল?' শুধানু তাকে।
> 'এ আদেশ ঈশ্বরের,' ঋষি বলে ধীরে।
> 'তাঁরই কাছে আমাদের নিয়ে যায় যাহা
> সে অপরূপকে আমি যাব নাকো রেখে, —
> শাস্তি দেন, দেবেন ঈশ্বর।'

রোয়েরিখের শুধু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে নয়, তাঁর শিল্প, তা সে নিসর্গ, ঐতিহাসিক চিত্র, অতিকথামূলক কম্পোজিশন বা মঞ্চসজ্জা যাই হোক, তারও ভিত্তিতে আছে জীবনের সামঞ্জস্য বিধানের (সত্যিকারের অর্থে যা 'সৌন্দর্য') এষণা। ধর্মীয় চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্যও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এতে।

প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় মনুমেন্টধর্মী শিল্পীরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেতেন গির্জার অভ্যন্তর

সজ্জায়। রোয়েরিখের সমকালীন যশস্বীরা অনেকে — ভ. ভাস্‌নেৎসভ, ভ্রুবেল, নেস্তেরভ মন্দিরচিত্রণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ধর্মীয় চিত্রে নিজেদের বিশ্ববীক্ষা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন তাঁরা। স্মরণীয় যে ম. ভ. নেস্তেরভ তাঁর শ্রমভারাক্রান্ত কুড়িটির বেশি বছর দিয়েছেন আইকন বা দেবপট অঙ্কনে, কোনো ক্ষেত্রে পরিস্থিতি তাঁর সৃজনী স্বার্থের অনুকূল না হলে 'লাভজনক' বরাত তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন প্রায়ই।

· আর রোয়েরিখের বৈশিষ্ট্য হল 'উপাসনা গৃহ' হিশেবে নয়, 'উপাসনা' হিশেবেই ধর্মমন্দিরকে দেখা। তিনি বলতে ভালোবাসতেন: 'সৌন্দর্যের জন্য চলি সানন্দে। সৌন্দর্য দিয়েই জয়লাভ করব। সৌন্দর্যই উপাসনা করি।' গির্জায় তাঁর কাজ কখনো ধর্মীয় প্রতিমার রীতিসিদ্ধ ব্যাখ্যানে পর্যবসিত হয় নি। গির্জার দাবির সঙ্গে রোয়েরিখের আঁকা দেবপট কতটা মিলছে এ প্রশ্ন যে পিটার্সবুর্গ, স্মোলেনস্ক এবং পরে হারবিন ও প্যারিসের বিশপ মহলে উঠেছিল সেটা অকারণে নয়। এবং অনপরিচিত বিশপ ইওয়ান সান-ফ্রানৎসিসকি (প্রিন্স দ. শাখোভ্‌স্কয়), পরে যিনি ধর্মপ্রচারের জন্য 'ভয়েস অব আমেরিকা'র মঞ্চটি পছন্দ করেন, রোয়েরিখের সঙ্গে বিতর্কে ঘোল খেয়ে তিনি গির্জার দরজা একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেন রোয়েরিখের জন্য।

পুরাতনীতে অগাধ ব্যুৎপত্তি ও তার জন্য ভালোবাসায় রোয়েরিখ ছিলেন প্রাচীন রুশ আইকন বা দেবপট কলার সেরা ঐতিহ্যের প্রতি সজাগ ও সযত্ন। 'ঈশ্বরের' সামনে নম্রতা, অনুশোচনা, ভয় না থাকায় গির্জার জন্য রোয়েরিখের কাজকে মেনে নিতে পারে নি যেমন গির্জার বহু পুরোহিত তেমনি তার ভক্তসম্প্রদায়। স্পষ্টতই লোকেদের উদ্দেশ্যে বাইবেলের এই উক্তিই রোয়েরিখ শিরোধার্য করেছিলেন: 'আর আমি বলি, তোমরাই দেবতা।'

ধর্মীয় প্রসঙ্গ নিয়ে রোয়েরিখের প্রসিদ্ধ রচনাগুলির মধ্যে পড়ে ১৯০৪—১৯০৭ সালে আঁকা ইজেল কম্পোজিশন ও মজেয়িকের জন্য স্কেচ: 'দেবদূতদের ধনভাণ্ডার', 'বরিস আর গ্লেব', 'খিস্টশিষ্য পিটার ও পল'। এগুলি রচিত প্রাচীন রুশ চিত্রকলার পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের ভিত্তিতে। তাদের বৈশিষ্ট্য পুরনো দেবপটের বিন্যাস রীতি, লিপিতে ঝালরের কাজ, তিন-চারটি রঙের মিলন।

১৯০৬ সালে কিয়েভের গলুবেভদের পারখোমভকা মহালে গির্জা চিত্রণের একটা বড়ো রকমের ফরমাশ পেয়ে রোয়েরিখ বারোটি স্কেচ করেন। এর পর শ্লিসেলবুর্গ (১৯০৬) ও পচায়েভ (১৯১০) গির্জার মজেয়িকের জন্য স্কেচ, প্‌স্কোভের ঘণ্টিঘর চিত্রণের জন্য চারটি স্কেচ (১৯১৩), নীসে লিভশিৎস উপাসনা কুটিরের জন্য বারোটি প্যানেল (১৯১৩)।

ধর্মীয় প্রসঙ্গের উন্মোচনে রোয়েরিখ খুবই মৌলিক। এই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখ্য তালাশকিনোতে গির্জার সজ্জা। দূর থেকেই চোখ টানে তোরণের আশ্চর্য সুন্দর মজেয়িক। ঝকঝক করে তা আগুনে-লাল, সোনালী আর ফিরোজা রঙে। তোরণের মধ্যভাগে 'অলৌকিক ত্রাতা'র বিশাল মূর্তি। প্রকাশ রীতির সংযমে মনে পড়বে ১২-১৩ শতকের আইকন বা দেবপটের কথা। মূর্তির ডাইনে ও বাঁয়ে বিষাণবাদক দেবদূত, তাদের পেছনে দুর্গের বুরুজ আর প্রাচীর, কম্পোজিশন শেষ হয়েছে বহিমান মেঘের ওপরে 'অনৈহিক নগর' দিয়ে। খ্রিস্টের শোকার্ত, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মানবিক ব্যথায় উদ্বেল।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায়

আয়নার মতো পালিশ করা কুচি কুচি যে উপকরণের চল ছিল, প্রাচীন রুশ মজেয়িকের রীতিকে পুণরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে রোয়েরিখ তা বর্জন করেন, বেছে নেন পালিশ না-করা অপরূপে ঝিলিমিলিতে গনগনে রঙীন কাচ। প্রতিমূর্তির অর্থময়তায়, বিন্যাসের দ্যোতনায়, কাচের বড়ো বড়ো খণ্ডে মজেয়িক হয়ে ওঠে খাঁটি মনুমেণ্টধর্মী। ধর্মমন্দিরের অভ্যন্তর সজ্জা 'স্বর্গীয়া মহারাণী' কম্পোজিশনটি আমাদের কাল পর্যন্ত টিকে থাকে নি। ধর্মীয় বিষয়বস্তুর স্বকীয় ব্যাখ্যানের জন্য এটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। বেদীর পেছনে ছবিটিকে ঠাঁই দিতে গেলে স্মোলেনস্কের বিশপ মহল বেঁকে বসে, কিন্তু গির্জা উঠছিল তেনিশেভার নিজের টাকায়, তাই বাধাটা এড়ানো যায়।

ছবিতে সিংহাসনারূঢ় মহারাণীর কোলে ঐতিহ্যগত শিশুটি ছিল না। সব মিলিয়ে এটি একটি জটিল প্রতীকী কম্পোজিশন। সিংহাসন স্থাপিত কঠিন পার্থিব ভূমির ওপর, 'জীবনের নদীতে' তা বিধৌত, উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়ে পলকা ডিঙিতে করে লোকে আসছে মহারাণীর পায়ের দিকে। মাথা তাঁর অন্তরীক্ষে, প্রশস্তি গাইছে দেবদূতেরা। ক্রুশের উদ্দেশে নতশির পয়গম্বরদের মিছিলে চিত্র সম্পূর্ণ।

গির্জার স্থাপত্য কাজে লাগিয়ে রোয়েরিখ জটিল তিন-ধাপী কম্পোজিশনটিকে উত্তীর্ণ করেছেন অশেষ নৈপুণ্যে, লোকশিল্পের উপাদানে রচিত অলংকরণে ফুটে উঠেছে একটা বিশেষ সৌন্দর্য ও শোভা।

তবে স্বয়ং 'স্বর্গীয়া মহারাণী'র পরিকল্পনায় বেশ অনুভূত হয় প্রাচ্যের সর্বেশ্বরবাদ যাতে ঈশ্বর শুধু তার সৃষ্টিতেই স্বীকৃত।

পরে রোয়েরিখ এই ভাবনাটা প্রকাশ করেছেন আরো সুনির্দিষ্ট রূপে 'বিশ্বজননী' (১৯২৪) ক্যানভাসে। কম্পোজিশনে ছবিটি 'স্বর্গীয়া মহারাণীর' অনুরূপ, কিন্তু একেবারেই অন্য একটা সাধারণীকৃত মহাজাগতিক পরিসরে তা কল্পিত। নাক্ষত্রিক অতলতার গভীর নীল পটে, ঝিকিমিকি রূপোলী-সোনালী কিরণে ফুটে উঠছে সিংহাসনে সমাসীনা বিশ্বজননী। 'স্বর্গীয়া মহারাণী'র মতো এখানেও সিংহাসন মর্ত্যে স্থাপিত, তবে 'জীবনের নদী' আভাসিত হয়েছে কেবল তিনটি স্বচ্ছ সোনালী মাছ দিয়ে। কোনোরকম আচারগত বা জাতীয় লক্ষণ ছবিটিতে নেই। পোশাকের লম্বিত নরম ভাঁজগুলি অল্পকিছু জ্যামিতিক নকশায় অলংকৃত। মুখ আধখানা উত্তরীয়ে ঢাকা। এতে বোঝানো হয়েছে যে বিশ্বের অনেক নিয়মই এখনো মানুষের অজ্ঞাত। সর্বেশ্বরবাদী 'বিশ্বজননী' প্রাচ্যেরই কাছাকাছি, মানবজাতির শাস্ত্রীয় করুণাময়ী বরদাত্রীর সঙ্গে তার মিল নেই বিশেষ। লোকে তাঁর কাছে করুণা নয় জ্ঞানের প্রার্থী।

তালাশকিনো গির্জার ছবি নিয়ে রোয়েরিখ কাজ শুরু করেছিলেন ১৯১১ সালে, কিন্তু 'স্বর্গীয়া মহারাণীর' কম্পোজিশন তাঁর মনে মনে রূপ নিয়েছিল অনেক আগে। প্রথম স্কেচগুলো তিনি করেন ১৯০৬ সালেই, শিল্পীর সৃষ্টিকর্মে যখন ভারত প্রসঙ্গ সবে দেখা দিতে শুরু করে। ১৯০৫ সালে তিনি লেখেন 'দেবস্সরি অবুন্তু' রূপকথা এবং ১৯০৬ সালে 'দেবস্সরি অবুন্তু' এবং 'দেবস্সরি অবুন্তু আর পাখিরা' ক্যানভাস। নিজের দিনলিপিতে রোয়েরিখ এটির উল্লেখ করেছেন ভারতের উদ্দেশে তাঁর প্রথম সৃজনী নৈবেদ্য বলে। পরের বছরগুলোয় যেমন তাঁর সাহিত্যকর্মে তেমনি চিত্রকলায় ক্রমেই বেশি করে স্থান নিতে থাকে প্রাচ্য প্রসঙ্গ, লক্ষণীয় হয়ে ওঠে শিল্পীর বিশ্ববীক্ষার ওপর প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব।

উনিশ শতকে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেশ প্রসারিত হয়।



পুত্তলিকা। ১৯০১। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



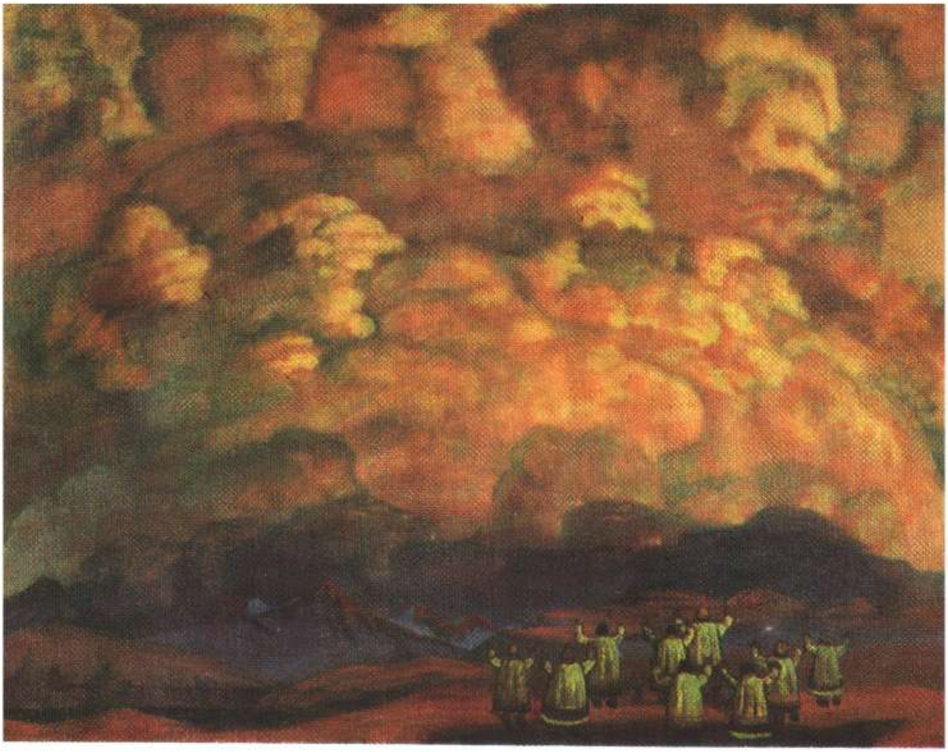
সিন্ধুপারের অতিথি। ১৯০১। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো।



নিপার তীরের স্লাভ। ১৯০৫। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম,
লেনিনগ্রাদ।



অন্তরীক্ষে যুদ্ধ। ১৯১২। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



আকাশের আদেশ। ১৯১৫। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম,
লেনিনগ্রাদ।



রোগত্রাতা পান্তেলেইমন। ১৯১৬। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো।



সন্ত নিকোলাই। ১৯১৬। কিয়েভ রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম,
কিয়েভ।



তিনটি পুলক। ১৯১৬। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম,
লেনিনগ্রাদ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে খোলে সংস্কৃত অনুষদ। রাশিয়ার বিদ্বৎ সমাজ থেকে উঠে আসেন বিশ্বস্বীকৃত ভারতবিদ ই. প. মিনায়েভ।

বিশ শতকের গোড়ায় রুশ ভারতবিদ্যা বিকশিত হতে থাকে। মিনায়েভের শিষ্য স. অলদেনবুর্গ ও ফ. শ্যেরবাৎস্কির কাজ মনোযোগ আকর্ষণ করে ভারতবর্ষেরও।

জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিক প্রভাব বিষয়ে রোয়েরিখের ধারণা, অতীতের প্রাজ্ঞ শিক্ষা আত্মস্থ করা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুষ্ট হয় এইসব রুশ ও বিদেশী পণ্ডিতদের গবেষণায় — তাঁরা ছিলেন অতীতের বিস্ময়কর জ্ঞানের গুণগ্রাহী। এইসব গবেষণায় রোয়েরিখের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় শুধু অতীত নয়, বর্তমান ভারতেও। বিশেষ করে ১৮৯৭ সালে অনন্যসাধারণ মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে যে 'রামকৃষ্ণ মিশন' আন্দোলন দেখা দেয়, তাতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি।

বিবেকানন্দের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল গুরু রামকৃষ্ণের মতবাদ থেকে। ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে ইনি আশ্চর্য এক ব্যক্তি। জাতিভেদ মানতেন না তিনি, প্রচার করতেন সর্বধর্মের ঐক্য।

বিবেকানন্দ ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন, পত্রালাপ চালাতেন এইচ. স্পেনসারের সঙ্গে। প্রধানত তিনি আলোড়িত ছিলেন নৈতিক সমস্যায়। লিখেছেন: 'যে জাতি বা সামাজিক স্তরের সে অন্তর্গত তার আদর্শ অনুসারে যা তাকে উন্নত ও ধন্য করবে, প্রত্যেকের উচিত সেই আচরণ... কেউ যদি কোনো দর্শনতন্ত্রের চর্চা না-ও করে থাকে, কোনো ঈশ্বরকেও যদি সে বিশ্বাস না করে, জীবনে যদি একবারও প্রার্থনা না করে থাকে, তাহলেও যদি সে কেবল সৎকর্ম মারফত পরের জন্য জীবন দান করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে উপাসনা ধর্মপরায়ণকে এবং জ্ঞান দার্শনিককে যে মার্গে পৌঁছে দেয়, সে তারই যোগ্য।'

বিবেকানন্দের দর্শনের একটা বলিষ্ঠ দিক হল 'অপ্রতিরোধ' তত্ত্বের বিরোধিতা। এ তত্ত্বের পেছনে একটা উচ্চ নৈতিক আদর্শ আছে বলে মানলেও তিনি বলেন যে বর্তমান সমাজের বাস্তবতায় তা অনুসরণ করার অর্থ মানবজাতির অধিকাংশকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া।

ভারতের মৌলিক ধরনের দর্শনচিন্তার পরিচয় রোয়েরিখ পান প্রথম যে মনীষীদের রচনা থেকে, তাঁরা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। আর চিরায়ত ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে 'ভগবদ্‌গীতা' তাঁকে প্রভাবিত করে সবচেয়ে বেশি। শিল্পীর আদি লেখাগুলোয় তার উল্লেখ দেখা যাবে একাধিকবার।

'ভগবদ্‌গীতা'র পর রোয়েরিখের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় বৌদ্ধ দর্শনে, এ ব্যাপারেও লক্ষণীয় বিবেকানন্দের প্রভাব, যিনি বুদ্ধকে মনে করতেন অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এক ব্যক্তি, বিশ্বকে যিনি 'উলটে দিতে' সক্ষম। পরবর্তী কালে রোয়েরিখ বৌদ্ধ ধর্মের সমস্ত ব্যাখ্যাই করেছেন জীবনকে পুনর্গঠনের জন্য, তাতে সক্রিয় হস্তক্ষেপের দিকটা তুলে ধরার জন্য।

সমকালীনদের মধ্যে রোয়েরিখের কাছে সবচেয়ে বরণীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আকৃষ্ট হন শুধু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মেই নয়, তাঁর দার্শনিক মতামত ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল যৌবনেই। ১৮৯২ সালে বেশ সাড়া পড়ে তাঁর 'সোশ্যালিজম' প্রবন্ধে।

বহু দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথে প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির পুরোধাদের মানসিকতা।

তিনি বুঝেছিলেন, উপনিবেশবাদের পতন পশ্চিমী শক্তিদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শক্তিহানির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর সহানুভূতি।

ভারতীয় দর্শনে নিমগ্ন হয়ে রোয়েরিখ গ্রহণ করেন উনিশ-বিশ শতকের গোড়াকার ভারতীয় মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি, যাঁরা মনে করতেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জাতি ও বর্ণের অসাম্যের উপনিবেশবাদী ভাবাদর্শীয় অভিমতকে বিদীর্ণ করে দিতে পারে।

রোয়েরিখের বিশ্ববীক্ষাকে প্রায়ই তথাকথিত নিগূঢ়বাদ অধ্যাত্মবাদ এবং সাধারণভাবে রহস্যময় প্রাচ্যের মিস্টিসিজমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখা হয়। সর্বাগ্রে স্মরণ করা যাক এ বিষয়ে স্বয়ং শিল্পীর মনোভাব কী। ১৯৩৭ সালে যখন তাঁর বইগুলির ব্যাপক প্রচার হয় এবং তা নিয়ে মন্তব্যাদি ছাপা হতে থাকে, তখন 'দিনলিপির পাতায়' রোয়েরিখ লিখেছেন: 'নানান দেশে আমার মিস্টিসিজমের কথা লেখা হচ্ছে। যেন-তেন প্রকারেণ একটা ব্যাখ্যা খাড়া করা হচ্ছে অথচ আমি আদপেই বুঝে উঠতে পারছি না কী এ'রা চাইছেন। অনেক বার আমায় বলতে হয়েছে যে 'মিস্টিসিজম' — এই অনির্দিষ্ট শব্দটায় আমি ভয় পাই। ইংরেজি 'মিস্ট' বা কুয়াশা কথাটা তা আমায় মনে পড়িয়ে দেয় খুবই। কুয়াশাচ্ছন্ন নিরাকার কোনো কিছুই আমার প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। চাই সুনির্দিষ্টতা আর আলোকস্পষ্টতা। মিস্টিসিজম বলতে লোকে যদি বোঝে সত্যের সন্ধান এবং নিরন্তর পরিজ্ঞান, তাহলে এরূপ সংজ্ঞার বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে লোকে সত্যকার পরিজ্ঞান নয়, বোঝে অন্যকিছু, সেটা কী তা তারা নিজেরাই বলতে পারে না। আর সব রকমের অনির্দিষ্টতাই অনিষ্টকর। প্রাচীন কালে গুপ্তাচারে যারা যোগ দিত তাদের বলা হত মিস্টিক। কিন্তু কী গুপ্তাচার চলছে এখন? যে বৈজ্ঞানিক পরিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে মর্ত্যের ঊর্ধ্বে, সূক্ষ্মতম তেজকে জানার কাছাকাছি এসেছে, তাকে তো আমরা গুপ্তাচার বলি না। জিজ্ঞেস করি, রাজ্যের লিখিয়েরা আমার মিস্টিসিজম দেখছেন কিসে?'

রোয়েরিখের পক্ষে এরূপ জিজ্ঞসা একান্ত স্বাভাবিক। যেখানে অপরূপ নেই সে জগতে রোয়েরিখের কাছে ধর্ম, দর্শন, বিদ্যা নির্বিশেষে অন্ধবিশ্বাসীদের একটা নিষ্প্রাণ ছক।

মানুষের অমরতা, তার সংগুপ্ত মানসশক্তি, এমনকি মানুষের মহাজাগতিক ক্রিয়া ও বিবর্তনের প্রশ্নকে একান্ত সঙ্গত বলে গণ্য করতেন রোয়েরিখ। কিন্তু তার সমাধানের জন্য তাঁর আবেদন ছিল বিজ্ঞানের কাছে, মিস্টিসিজমের কাছে নয়। কট্টর মিস্টিকের পক্ষে যা শোভা পায় তেমন প্রশ্ন তোলা লজ্জাকর বলে রোয়েরিখ মনে করতেন না, কিন্তু জবাব পেতে চাইতেন কেবল সত্যিকারের চিন্তাশীল এক বৈজ্ঞানিকের মতো।

চিত্তবৃত্তির স্বল্পব্যাখ্যাত যেসব ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল তার জন্য তিনি খ্যাতনামা মনোবিদ প্রফেসর ভ. ম. বেখতেরেভের দ্বারস্থ হতেন।

'পরলোকে' আগ্রহ প্রসঙ্গে নভিকভ, আক্সাকভ, দাল, বুৎলেরভ প্রভৃতি রুশ সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের যেসব কৃতীর নাম তাঁর দিনলিপিতে উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে মনে হয় রাশিয়ায় নিগূঢ় বিদ্যার ইতিহাস নিয়ে রোয়েরিখ আগ্রহী ছিলেন। পিটার্সবুর্গে 'প্রেতদর্শীদের' প্রেতলৌকিক বৈঠকে তিনি যে একাধিকবার হাজিরা দিয়েছেন, শিল্পী সেটা লুকোন নি। তবে তাদের 'অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা' যাচাই করার পর প্রেততত্ত্বের প্রতি তীব্র বিরূপতা জাগে রোয়েরিখের।

রোয়েরিখের বিশ্ববীক্ষার ওপর প্রাচ্যের প্রভাব তথা ভারতীয় দর্শনের কিছু কিছু ভাববাদী অঙ্গের প্রভাব আলোচনা কালে আমরা অবশ্যই তলস্তোয়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রোয়েরিখের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করতে পারি। কিন্তু নিগূঢ়বাদী-প্রেততাত্ত্বিক 'সম্বোধি'কে তাঁর বিশ্ববীক্ষার ঘোলাটে উৎস বলে ধরার অর্থ যে-শিল্পী ও বিজ্ঞানী ছিলেন স্বকালের পুরোগামী বিজ্ঞান ও মানববাদী শিল্পের দলে তাঁর ওপর কুৎসার কালিমা লেপন করা।

রোয়েরিখের কাছে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ছিল হয় ইতিবাচক নয় নেতিবাচক ভাবাদর্শের বাহক। নিরপেক্ষ শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না তাঁর কাছে, তার অনুগামীদের তিনি বলেছিলেন, 'মাঝামাঝির বিজ্ঞবৃন্দ — দেবদূতও নেই, পিশাচও নেই, এঁদের সমস্ত সৃষ্টির মতোই এঁনারা অনাবশ্যক'।

তিনি লিখেছেন: 'জনগণের গতিস্রোতে প্রথম স্থান শ্রমের পুনর্মূল্যায়ন, সৃষ্টি ও জ্ঞানের ব্যাপক বোধ তার শীর্ষস্থানীয়। এ থেকে পরিষ্কার যে পুরুষান্তরে প্রধান হয়ে উঠবে শিল্প ও বিজ্ঞান। তাছাড়া আর্ত মানবজাতির যা অত বেশি প্রয়োজন, তেমন একটা আন্তর্জাতিক উন্নত ভাষাই হল এই দুটি চালিকা। শিল্প, সে হল জনগণের হৃদয়। জ্ঞান — জনগণের মস্তিষ্ক। শুধু হৃদয় আর সুবুদ্ধি দিয়েই মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, বুঝতে পারে পরস্পরকে।'

রোয়েরিখ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে বিবর্তনে বৈষয়িক ও আত্মিক ব্যাপারটা একই রকম অবর্জনীয়। ভবিষ্যৎ মানবের রূপলাভে শেষোক্তের অগ্রাধিকার তাঁর কাছে ছিল তর্কাতীত। শিল্পী তাঁর বহুমুখী ক্রিয়াকলাপে যে অস্ত্র ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন তা বরাবরের মতো নির্ধারিত হয়েছে এই থেকেই।

নৈতিক ও নান্দনিককে এক করে দেখে রোয়েরিখ মনে করতেন, সমুন্নত মানবিক আদর্শে চালিত শিল্পের হওয়া উচিত অপরূপ ও আনন্দময়ের অভিব্যক্তি।

মানবিক অনুভব লালিত করে তোলায় সুন্দরের প্রভাবে বিশ্বাস করতেন রোয়েরিখ, তাই শিল্পকে তিনি গণ্য করতেন নান্দনিকে নৈতিকের প্রক্ষেপ বলে শুধু নয়, নৈতিকে নান্দনিকের পরিবিকাশ হিশেবে। শিল্পের আনুষ্ঠানিক কোনো ঘরা-নায় নয়, এই ধরনের রূপান্তরের সার্থকতায় নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাঁর অন্বিষ্ট শিল্পের প্রাণবত্তা।

অনড় কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা সত্যলাভে রোয়েরিখের বিশ্বাস ছিল না। তাঁর কল্পপ্রতিমাগুলির প্রহেলিকা জগদ্‌বহির্ভূত দিব্যাদিষ্ট কোনো মিস্টিক প্রতিমূর্তির পরিচায়ক নয়, অপরিসীম বিশ্ব ও তাতে মানবিক সম্ভাবনায় তা সোচ্চার।

কিন্তু এ প্রহেলিকার পেছনে চুলচেরা গবেষণা আর সমালোচনায় ধরা পড়বে কি যা দেখেছিলেন রোয়েরিখ স্বয়ং। সত্যিকার প্রতিটি শিল্পীর মধ্যেই থাকে দৃষ্টির একান্ত গভীর একটা স্বাতন্ত্র্য। রোয়েরিখ বলতেন: 'বাক্যের সীমা আছে, কিন্তু হৃদয়ের অনুভূতি ও ব্যাপ্তির পরিসীমা নেই।' এক্ষেত্রে শিল্পীর অনুপ্রেরণা কোনো একটা যথাযথ সূত্রে বাঁধা পড়ছে কিনা তা বলার অর্থ হয় কি? সম্ভবত এইটেই সত্যকার প্রতিভার লক্ষণ, যা অদ্যাবধি অদৃষ্টপূর্ব কিছু একটার উন্মোচনে নিমগ্ন।

৫। বৃহৎ ঘটনার প্রাক্কালে

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখ তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলি শুরু করেছিলেন এই কথায়: 'জীবনের বর্ণনা সহজ নয়, অনেক বৈচিত্র্য তাতে। কেউ কেউ একে এমনকি বলেছেন স্ববিরোধী। অবশ্যই তাঁরা জানতেন না কী তাগিদ আর অবস্থাচক্রে দানা বেঁধেছে নানাবিধ শ্রম। জীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমি শ্রমই বলব। কেননা সবই ঘটেছে ব্যক্তিগত কোনো পরিতৃপ্তির লোভে নয়, হিতকর শ্রম ও নির্মাণের জন্য।'

রোয়েরিখের দিনলিপিতে এবং তাঁর সমকালীনদের স্মৃতিচারণে এমন সব 'মধুর অকিঞ্চিৎকরতার' খবর আছে অল্পই যাতে জীবনীতে অন্তরঙ্গের সুর মেলে। সে দিকটা সবই যেন চাপা পড়ে গেছে তাঁর সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, সৃজনী আর বৈজ্ঞানিক কর্মে।

তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের আদলে খাটুনির ছাপই পরিস্ফুট। যেখানে কাজ করতেন, সেটা কাজেরই ঘর, ফ্যাশনদুরস্ত আসবাব আর দামী সুভেনিরে সাজানো নামকরা শিল্পীদের স্টুডিও নয়। সেখানে ছিল বইভরা টেবিল, রঙের টিউব আর বয়াম, প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধানের আবিষ্কার আর মণিকের নমুনা।

একই সঙ্গে গোটাকত ছবি নিয়ে কাজ করার অভ্যাস ছিল রোয়েরিখের, তাই অনেকটা জায়গা জুড়ত শুরু করা ছবির ইজেলে। সিলিং থেকে ঝুলত স্টাফ করা সিন্ধুচিল। সে কথা স্মরণ করে শিল্পী লিখেছেন: 'সন্ধানীর তরীর সামনে ওড়ে আশার সিন্ধুচিল। দেখো, দেখো, কোন দিকেতে যাচ্ছে উড়ে সিন্ধুচিল। লোকে চেয়ে দেখে সিন্ধুচিলের ওড়া, আশার আকাঙ্ক্ষার ওড়া। কেনই বা আশা করব না আগামী কালের, রক্তিম সূর্যোদয়ের, শুভময় সৌন্দর্যের?! উড়ে যাচ্ছে অপরূপ সব সিন্ধুচিল আর এমন শ্রম নেই যার সামনে সিন্ধুচিল না ওড়ে।'

পুরনোর নেশা শিল্পীর প্রকাশ পেত সংস্কার করে নেওয়া মহান পিটারের আমলের একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলে, এতে কাজ করতে তিনি ভালোবাসতেন। বৈঠকখানা ঘরটি ছিল পুরনো আসবাবে সাজানো।

শ্রমের প্রতি সম্ভ্রম থেকে জিনিসপত্রের জন্য রোয়েরিখের ছিল প্রগাঢ় যত্ন। নানান দেশে দীর্ঘ সফরে তাঁর সঙ্গে থেকেছে সেই একই টয়লেট কেস। সমারোহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পোশাকের আলমারিতে ছিল চমৎকার করে বানানো একটি ড্রেস কোট, কাজের বহু কুর্তা বাতিল হয়ে যাবার পরও এটি অক্ষত ছিল।

শিশুদের ঘরখানাও দেখাত যেন ছোটোখাটো

একটি স্টুডিও। ছেলেদের মানুষ করে তোলার জন্য অনেক মনোযোগ ও সময় দিতেন নিকোলাই রোয়েরিখ এবং ইয়েলেনা ইভানোভ্না। বড়ো ছেলে ইউরির জন্ম হয় ১৯০২ সালে, নভগোরদ গুবের্নিয়ার অকুলোভকায়, আর ছোটো স্ভিয়াতোস্লাভের জন্ম পিটার্সবুর্গে, ১৯০৪ সালে। প্রথম থেকেই ছেলেদের মধ্যে অধ্যবসায়, পর্যবেক্ষণশীলতা, উদ্যোগের গুণ জাগিয়ে তুলতেন তাঁরা। শিশুরা অনুভব করত যে তারা পরিবারের পূর্ণ সদস্য। ভ্রমণে সঙ্গে থাকত তারা, আর যদি বা রেখে যেতে হত তাহলে চিঠি লেখালেখি চলত। বালক পত্রলেখকেরা তাদের বয়সের তুলনায় আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি দেখায়। পিয়াতিগোর্স্কে পিতার কাছে সাত বছরের স্ভিয়াতোস্লাভ লেখে: 'প্রিয় বাবা, আমি তোমায় চিঠি লিখছি, ওদিকে আমাদের বাগানে দারুণ ঝড়, বাজ ডাকছে। আমি বসে আছি ছোটোদের ঘরটায়। এই চোর্তিকভ কে জানতে ভারি ইচ্ছে করছে। আজ আমরা একটা ডাঁশ মাছি ধরেছি, তার ডানা সোনালিতে ঝিলমিল করে, পেট ঝিলমিল করে নীল, সবুজ, আর হলদেটে সবুজে। আমাদের শবজি ভুঁইটা বড়ো, সব গাছেরই অঙ্কুর বেরিয়েছে। পাহাড়ে বুনো ছাগল দেখা যায় না? গুবরে পোকা আর পাথরগুলো কীরকম? আমার ভুঁইয়ে সূর্যমুখী, মুলো, শুলফা আর আলুর গাছ বাড়ছে, ইউরিকের ভুঁইয়ে স্পিনিজ শাক, পেঁয়াজ, গাজর, স্যালাড, জাপানী ঘাস, মটরশুটি আর আলু...'

বিদ্যালয়ে থাকতেই ইউরি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ব. তুরায়েভের কাছে মিশরের ইতিহাস এবং প্রাচ্যবিদ আ. রুদনেভের কাছে মোঙ্গল ভাষা শিক্ষা করেন।

শিল্পীর সুসমন্বিত নিয়ত পরিশ্রমী পরিবারটিতে সৃজনের স্থান ছিল সবার ওপরে। স্বয়ং নিকোলাই রোয়েরিখের কর্মক্ষমতায় চমৎকৃত হয়েছেন তাঁর সমকালীনেরা অনেকে। শিল্পী ই. গ্রাবার লিখেছেন: 'মইকার দিক থেকে 'শিল্প প্রণোদন সমিতি'র ভবনে তাঁর ফ্ল্যাটে এলে দেখা যাবে বিরাট এক প্যানেল নিয়ে তিনি খাটছেন। আগের সাক্ষাৎকারের পর যে মাস দুয়েক কেটেছে, তার ভেতর করা আরো গণ্ডা গণ্ডা কাজ তিনি দেখাবেন সাগ্রহে, কোনোটা কারুর চেয়ে কম যায় না, খেলো গতানুগতিক কিছু, বিরক্তি ধরিয়ে দেবার মতো কিছু নেই, সবই আগের মতোই নতুন আর অপ্রত্যাশিত, ছোটো ছোটো এইসব ক্যানভাস আগের মতোই অপূর্ব, ছবিগুলি বিন্যাসে সুগঠিত, বর্ণে সুষমামণ্ডিত। পনের মিনিট যেতেই সেক্রেটারি একতাড়া কাগজ নিয়ে আসে সই করাবার জন্য। না পড়েই তিনি দ্রুত স্বাক্ষর দিয়ে যান, জানা আছে যে কোনো খিটকেল হবে না, তাঁর দপ্তরটিতে সুব্যবস্থা তো আদর্শস্থানীয়। আরো পনের মিনিট যেতেই ছুটে আসে কেরানি, — গ্র্যাণ্ড ডাচেস এসেছেন। আমি যেন আহারের জন্য থেকে যাই — কোনোরকমে এইটুকু বলেই ছুটলেন তিনি; এইভাবেই জরুরী কাগজে সই দিতে দিতে, আগন্তুকদের শত্রু-মিত্র অতিথিদের সমান সৌজন্যে, প্রথমদের ক্ষেত্রে এমনকি বেশি সৌজন্যে আপ্যায়ন করতে করতেই চমৎকার চমৎকার ছবি এঁকেছেন তিনি, ফিরেছেন থেকে থেকেই টেলিফোন আলাপে ব্যাহত চিত্রাঙ্কনে। দিনের পর দিন এইভাবেই চলেছে তাঁর অশ্রান্ত উত্তুঙ্গ জীবন।'

রোয়েরিখের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সুযোগ যাঁদের হয়েছে, তাঁরা মনে রেখেছেন তাঁর নিখুঁত ব্যবহার, শান্ত শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর, সংযত সুনির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গি, সমতালে ধীরস্থির চলন। রোয়েরিখকে ব্যতিব্যস্ত বা বিহ্বল হতে কেউ দেখে নি কখনো। লোককে তিনি জিতে নিতেন

হিতৈষণায়, আন্তরিকতায়। গ্রাবার ঠিকই বলেছেন যে শত্রু-মিত্র সকলের প্রতিই তাঁর ছিল এই আচরণ, তাই প্রথমোক্তরা কাজের ব্যাপারে রোয়েরিখের সঙ্গে যোগ দিত সাগ্রহেই। শিল্প ও শিল্পীর ব্যাপারে রোয়েরিখ যে যথাসাধ্য কাজে লাগতে প্রস্তুত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না তাদের।

তাঁর মতামত, তাঁর ভাবনার যারা বিরোধী তাঁদের সঙ্গে প্রায়ই সংঘাতে আসতে হয়েছে রোয়েরিখকে, বুক ফুলিয়েই লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি। কিন্তু যার সঙ্গেই সংঘর্ষ বাধুক, প্রতিপক্ষের ক্রিয়ার সামাজিক তাৎপর্যটাই ছিল তাঁর কাছে বিবেচ্য, তার ব্যক্তিগত গুণাগুণ নয়। অত্যন্ত গোলমেলে যেসব ব্যাপার অন্যে হাতে নিতে চাইত না, তাতে রোয়েরিখের সাফল্য নিশ্চিত হয় এই সহিষ্ণুতার কারণে।

কাজ নিয়ে জার দরবার পর্যন্ত নানান ধাপের কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে রোয়েরিখ সাধারণত অনুকূল সিদ্ধান্তই আদায় করে ফিরতেন। এইজন্যই চমৎকার কূটনীতিক বলে খ্যাতি জুটেছিল তাঁর। তাঁর বিষয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো পদোন্নতি নিয়ে গুজবটা ফেঁপে উঠেছিল এই থেকেই, যদিও শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়টির অধ্যক্ষতা ছাড়া কোনো সরকারী চাকরির জন্যই তিনি চেষ্টা করেন নি।

একথা ঠিক যে ১৯১৪ সালের যুদ্ধের কিছু আগে রোয়েরিখ রাষ্ট্রীয় মন্ত্রকের খেতাব পেয়েছিলেন। তবে খেতাব বিতরণে 'ওপরমহলের' কোনো কার্পণ্য ছিল না বলেই মনে হয়, কেননা এক বছর বাদে দ্বিতীয় বার খেতাবটি পান রোয়েরিখ আর শিল্পী বিলিবিন কৌতুক কবিতায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন যে এবার থেকে প্রতি বসন্তে রোয়েরিখ রাষ্ট্রীয় মন্ত্রকের পদ পেতে থাকবেন।

তাঁর সময়ে প্রদর্শনীর পদক ও পারিতোষিক দিয়ে শিল্পীদের পুরস্কৃত করার যে রেওয়াজ ছিল বহুলপ্রচলিত, রোয়েরিখ ছিলেন তারও বিরোধী। এরূপ পুরস্কারের অলীকতা নিয়ে তিনি সংবাদপত্রে লিখেছেন একাধিক বার। আর ১৯০৮ সালে মিলানের প্রদর্শনীতে তাঁকেই দেওয়া হল স্বর্ণপদক। সেটা গ্রহণে তিনি অস্বীকৃত হন। জুরির সদস্যরা এতে হতভম্ব ও শশব্যস্ত হয়ে শিল্পীকে বোঝাতে যান যে এর চেয়ে বড়ো পুরস্কার তাঁদের এক্তিয়ারে নেই। ব্রাসেলসের প্রদর্শনীতেও স্বর্ণপদক জোটে তাঁর। সেটি তাঁকে পাঠানো হয় বেলজিয়ান দূতস্থান মারফত। পদক প্রত্যাখ্যান গড়ায় কূটনৈতিক পত্রবিনিময়ে।

এসব থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তাঁর কিছু কিছু সমকালীনের কটাক্ষ সত্ত্বেও পদ ও পুরস্কারের জন্য রোয়েরিখ বিশেষ লালায়িত ছিলেন না, যদিও তাঁর পরিচালিত কর্মকাণ্ডের স্বার্থে কাজে লাগলে তা তিনি বর্জন করেন নি। কোনো কিছুর ব্যাপারে যদি তাঁর দুর্বলতা থেকে থাকে তবে সেটা প্রাচীন শিল্পীদের আঁকা চিত্রসংগ্রহ নিয়ে। তাঁকে ও ইয়েলেনা ইভানোভনাকে লোকে জানত নিরবসন্ন সংগ্রাহক বলে। প্রায়ই তাঁদের দেখা যেত প্রাচীন সামগ্রীর দোকানে আর নিলামে। শিল্পীর অনেক স্মৃতিচারণই সংগ্রহ প্রসঙ্গে নানান ঘটনা নিয়ে।

একটা নিলামের কথা রোয়েরিখ বলেছেন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই অবিক্রিত রয়ে যায়। রোজগার গুণেটুনে চলে যাবার উপক্রম করছিল খাজাঞ্চি মেয়েটি। কিন্তু রোয়েরিখের নজরে পড়ে আয়নার ওপরে দুই জানলার মাঝখানে কী একটা অস্পষ্ট ছবি। সংগ্রাহকের স্বতঃচেতনায় ছবিটি দেখাতে বলেন তিনি। পশারিণী, তার মতে চমৎকার তবে ঈষৎ দোষদুষ্ট ছবিগুলোর দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করে নিঃসংশয়ে জানিয়ে দিলে:

'ওটা পেড়ে লাভ নেই, হাজার হোক আপনি তো আর কিনবেন না।'

পেড়াপিড়ি করতে লাগলেন রোয়েরিখ। উদ্যোগী মহিলাটি তখন প্রস্তাব দিলেন:

'বেশ, আপনার জন্য ওটা পেড়ে আনব, কিন্তু এক্ষুনি টেবিলে পঁচিশ রুবল ফেলুন, ওটা নিয়ে ফের মইয়ে ওঠার সাধ নেই আমার।'

এইভাবেই ক্যাশে জমা হল পঁচিশ রুবলী নোট আর রোয়েরিখ হস্তগত করলেন ছোটো একটি ছবি, এতই তা কালচে মেরে গেছে যে তার বিষয়বস্তুই সনাক্ত করা দায়। সাফ-সুফ করার পরে দেখা গেল ওটা পিটার ব্রেইগেলের শীতদৃশ্য।

'দিনলিপির পাতায় রোয়েরিখ লিখেছেন: 'ছবি আবিষ্কারেই গেছে বহু অবিস্মরণীয় ঘণ্টা, তার অনেকগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আশ্চর্য কিছু ঘটনা। রুবেন্সের ছবি পাই পুরনো মলাটে বাঁধানো অবস্থায়। প্রচুর উল্লাস বোধ করেছিলাম হঠাৎ ভান-ওর্লে'কে আবিষ্কার করে। কে জানে কী উদ্দেশ্যে ছবিটি ছিল একেবারে রঙ লেপা, ওপরে একটা ন্যক্কারজনক বুড়ো। ইয়েলেনা ইভানোভনা নিজেই ছবি সাফ করতে ভালোবাসতেন, পরবর্তীকালের পোঁচগুলোর তল থেকে যখন দেখা দিল শিল্পগুরুর আঁকা চমৎকার একটি মাথা, তাঁর আনন্দ তখন আর ধরে না...'

রোয়েরিখের সংগ্রহে ছিল প্রায় ৩০০টি শিল্পকর্ম। পরে তা প্রদত্ত হয় হার্মিটাজে। এর ভেতর ছিল রুবেন্স, অস্টাডে, ক্রানাখ প্রভৃতি শিল্পাচার্যদের ছবি। পুরনো নেডারল্যান্ডীয় চিত্রকলার নির্বাচনটা ছিল বেশ ভালো।

প্রবন্ধাদিতে তিনি সংগ্রহবিদ্যার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন একাধিক বার। সাংস্কৃতিক মূল্যাধার রক্ষণে তাঁর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে এর নৈকট্য অতি নিবিড়। সংগ্রহকর্মের বিপুল শিক্ষামূলক গুরুত্বের উল্লেখ করেছেন তিনি, ত্রেতিয়াকোভের অত্যন্ত কদর করতেন। ইনি শুধু রাশি রাশি প্রথম শ্রেণীর শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেছেন তাই নয়, সে সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে রুশ চিত্রকলার ইতিহাসকেও তুলে ধরতে পেরেছেন।

সংগ্রহের জন্য তিনি সবিশেষ প্রচার করতেন যুবসম্প্রদায়ের কাছে, উৎসাহ দিতেন তাদের। বলাই বাহুল্য, শুরুতেই রুবেন্সের ছবির জন্য সন্ধান বা রেপিনের কাজ সংগ্রহ করার পরামর্শ তিনি দিতেন না। তাঁর মতে, পোস্ট-কার্ডগুলির নিপুণ সংগ্রহে অশেষ উপকার হয় শিল্পানুরাগের জাগরণে। তাই তিনি শিল্পের প্রতিলিপি এবং শিল্পবিষয়ক পুস্তকের প্রকাশনায় সক্রিয় অংশ নিতেন।

তাঁর সময়কার অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীর সঙ্গে রোয়েরিখের নিবিড় সাযুজ্য ছিল। যেমন লেওনিদ আন্দ্রেয়েভের সঙ্গে খুবই সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে তাঁর। রোয়েরিখের আশাবাদী আর আন্দ্রেয়েভের প্রায় নৈরাশ্যবাদী বিশ্ববীক্ষা মনে হবে যেন সুরাসুরগোত্রীয়। কিন্তু দুই চরম প্রান্ত যেন পরস্পরের অনুপূরণ করে মাঝে মাঝে বেশ মিলেমিশে যায়। লেওনিদ আন্দ্রেয়েভের কাছে রোয়েরিখের চিঠিটি (১৯১৪) তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গ বনিবনার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক: 'প্রিয়বরেষু লেওনিদ নিকোলায়েভিচ, কথা যদি মর্ম স্পর্শ করে, তাহলে আপনার মতো আমার মনের কাছে আপনা অপরূপ এক শিল্পীর কথা আমাকে শুধু গভীরভাবে স্পর্শ করেছে তাই নয়, আনন্দ এনে দিয়েছে। আমাদের কালে এ আনন্দ অতি বিরল, তার জন্য চুম্বন করি আপনাকে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি বুঝবেন যে আপনার মতামত আমায় আনন্দ দিয়েছে। প্রতিপক্ষ আমার অনেক, কিন্তু ভাগ্যের এই নির্বন্ধ যে 'সগর্বেই নাম করতে পারি আমার শত্রুদের, সগর্বেই নাম করতে পারি মিত্রদেরও'। ভাগ্যের নির্বন্ধ এই যে 'আজকের'

মুমূর্ষু দিনে, জীবনের ফেনা আর ধুলোর মধ্যে আমার কাছে এসেছে আপনার মতো লোকেদের কণ্ঠস্বর, আমি যার অনুরাগী, গুণগ্রাহী, দরদী। এ যে আনন্দ! 'বিশেষজ্ঞদের' অভিজ্ঞ কণ্ঠস্বরের মধ্যে আপনি আমার কাজের কথা বললেন মানবিক ভাষায়। আপনি লিখেছেন, বিশেষজ্ঞ না হয়ে কী বা লেখা যায়? কিন্তু বিশেষজ্ঞতার পরিধির বাইরে গিয়ে জীবনের কাছে, প্রাণের কাছে এইটেই যে জরুরী...'

করাল ঘটনাবলির পূর্বানুভূতি এবং নিজের আত্মিক এষণাকে সামাজিক স্বার্থাধীন করে তোলার প্রয়াসে রোয়েরিখ কবি আলেক্সান্দর ব্লকের কাছাকাছি আসেন। এক্ষেত্রে 'আত্মার আত্মীয়' কথাটা খুবই খাটে।

বাইরের সংযম আর ভেতরের আগুনে রোয়েরিখ ও ব্লকের মধ্যে মিল আছে অনেক। তাঁদের শিল্পের 'লোহিতাভায়' 'জীবনের বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড' চট করে নজরে পড়ত না। একজনের কবিতা আর অন্যজনের চিত্রকলা মনে হত তখনকার জরুরী সমস্যা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু কাল সম্পর্কে তাঁদের ছিল আলাদা একটা বোধ, যাতে বর্তমানের অন্তর্গত হয়ে থাকে বিগত হাজার হাজার বছর। তাঁদের সৃষ্টিতে বর্তমানের যাচাই হয় অতীত দিয়ে।

জীবনের কলরোল ক্ষীণ।
ফিরে যায় চিন্তার জোয়ার।
কালো মখমলে কোন হাওয়া
গেয়ে যায় ভাবিষ্যের গান।

এই অন্ধকার দেশে নয়,
জেগে কি উঠব অন্য কোথা?
এই জীবনের স্মৃতি নিয়ে
স্বপ্নে শ্বাস ফেলব কখনো?

যা আছে, যা ছিল সবই বাঁচা!
দূর হোক স্বপ্ন চিন্তা সব।
ফিরে আসা জোয়ারের ঢেউ
ছুঁড়ে ফেলে মখমলী রাতে।

ইতালির উদ্দেশে নিবেদিত ব্লকের কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপট নিয়ে রোয়েরিখ যখন কাজ করছিলেন, তখন কবির ঠিক এই ছত্রগুলিই অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁকে। মনে হয়, ব্লককেও অনুপ্রাণিত করেছিল রোয়েরিখের চিত্রকলা। ১৯১৪ সালে 'আপল্লোন' পত্রিকায় ছাপাবার জন্য স. মাকোভ্স্কি প্রচ্ছদপটের মূল ছবিটি ধার চান ব্লকের কাছে। কবি লিখে পাঠান: 'ন. ক. রোয়েরিখের ছবিটি আমার জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, কাচে বাঁধাই হয়ে তা টাঙানো আছে আমার চোখের সামনে, এমনকি এই মাসটার জন্যও তার বিচ্ছেদ আমার পক্ষে কষ্টকর... যে মনোভাব থেকে আমার এই আপত্তি, মনে হয় সেটা আপনার কাছে বোধগম্য, অনুরোধ করি তার জন্য আমায় যেন বেশি দোষী না করেন।'

'দিনলিপির পাতা'য় ব্লক সম্পর্কে রোয়েরিখ লিখেছেন: 'মনে আছে, তাঁর 'ইতালীয় সঙ্গীতে'র প্রচ্ছদপটের জন্য উনি আমার কাছে এসেছিলেন, যে ইতালির কথা আমরা বলাবলি করেছিলাম, তার আর তখন অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু কতগুলি অবিস্মরণীয় বহ্নিমান দিশাচিহ্ন তা রেখে গেছে। এবং এইসব অভূতপূর্ব আলো আর বজ্রধ্বনিত ক্ষেত্র আর আগুনে প্রস্ফুটিত খড়্গ — এই সমস্ত দিক্স্তম্ভকে ব্লক বাস্তব বলে জানতেন। তাদের বিষয়ে তিনি পরিভাষা কণ্টকিত করে বলতে যেতেন না, কিন্তু তাদের বাইরের অনির্বচনীয়তা আর ভেতরের অপরিবর্তনীয়তাকে মানতেন তিনি।'

সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সূত্রে মাক্সিম গোর্কির সঙ্গে রোয়েরিখের পরিচয় ছিল অবধারিত।

গোর্কির সাহিত্যপ্রতিভাকে তিনি খুবই উঁচু স্থান দিতেন, পরামর্শ চাইতেন তাঁর কাছে। আলেক্সেই মাক্সিমভিচ গোর্কির কাগজপত্রের মধ্যে ১৯১৬ সালের ৪ নভেম্বর তারিখ দেওয়া রোয়েরিখের একটি চিঠি আছে: 'প্রিয়বরেষু আলেক্সেই মাক্সিমভিচ, আপনাকে প্রুফ পাঠাচ্ছি। আপনার সমস্ত মন্তব্যের জন্য সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ থাকব। দেখা হলে বেশ হয়; আপনার কথায় সঞ্জীবনী বায়ু প্রচুর, চোখ আপনার অনেক দূর পর্যন্ত দেখে। মারিয়া ফিওদরোভনাকে আমার গভীর অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার একান্ত অনুগত রোয়েরিখ।'

গোর্কি সম্পর্কে শিল্পীর কতকগুলি স্মৃতিকথা উল্লেখযোগ্য: 'মনে আছে, বড়ো একটি সাহিত্য সংগঠনে একবার যখন তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হয়, আমি তখন গোর্কির মত চাই। উনি হেসে বললেন: 'এ নিয়ে আলোচনার কী আছে। কীভাবে, কী করতে হবে, শিল্পী হিশেবে সেটা আপনিই ভালো অনুভব করবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনুভবই করবেন, আপনি যে স্বজ্ঞাবাদী। মাঝে মাঝে যুক্তিতর্ক ছাড়াও মর্মটা ধরা প্রয়োজন।"

গোর্কি এবং রোয়েরিখ দু'জনেই নিজেদের কালকে পালাবদলের যুগ বলে অনুভব করতেন। তবে বলাই বাহুল্য, স্বদেশের উত্তম ভবিষ্যতের সংগ্রাম তাঁরা নিজেদের সৃষ্টিকর্মে প্রতিবিম্বিত করেছেন নিজের নিজের মতো করে।

১৯১৪ সালের যুদ্ধের আগে রোয়েরিখের চিত্রে প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়েছে পাপশোধের প্রসঙ্গ, যা প্রথম রূপ নেয় 'শেষ দেবদূত' (১৯১২) ক্যানভাসে। অগ্নিশিখায় পরিবৃত পৃথিবীর ওপর রক্তিম মেঘে বাইবেল কথিত দেবদূত শাস্তি বিধান করছেন অনুষ্ঠিত সমস্ত দুষ্কর্মের জন্য আর দূর দিগন্তের বিদ্যুৎ-ঝলকে যেন সমস্ত মালিন্য থেকে পরিশুদ্ধ মর্তে নবজীবনের আভাস।

রোয়েরিখের শিল্পকর্মের সাধারণ ধারা এবং শিল্প বিষয়ে তাঁর মতামতের পক্ষে বিপর্যয়, বা দুর্ভাগ্যের প্রসঙ্গ মনে হতে পারে বিজাতীয়। তাহলেও তদানীন্তন বাস্তবতার প্রতি শিল্পীর বিরূপতা থেকে নিদারুণ শাস্তির যে ভাবনা এসেছে তা অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলে গেছে তাঁর চিত্রকলায়।

'শেষ দেবদূত' ছবিটির প্রায় একই সময়ে দেখা দেয় 'পৌরুষের খড়্গ' (১৯১২) ক্যানভাস। দুর্গতোরণে ঘুমন্ত সান্ত্রীর কাছে খড়্গ নিয়ে এসেছে দেবদূত। সর্বশক্তিতে শত্রুর মোকাবেলা করার সময় এসেছে।

রোয়েরিখ যেন সামরিক দাবাগ্নির অনলাভা দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর 'দিনলিপির পাতা'য় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য আছে: 'নিদ্রিত প্রহরীদের কাছে আনা হচ্ছে খড়্গ। দেখা দিয়েছে 'পৌরুষের খড়্গে'র প্রয়োজন। সময় হয়ে আসছে। তখনই ১৯১৪ সালের গোড়ায় তাড়াতাড়ি করে আঁকা হয় বেলজিয়ান সিংহ নিয়ে 'অনলাভা', 'নাগিনীর চিৎকার', উড্ডীন 'রাজমুকুট', 'মৃত্যুদণ্ডিত নগর' এবং অন্য সেইসব ছবি যার অর্থ আমাদের কাছে বোধগম্য হয় পরে।'

'মৃত্যুদণ্ডিত নগর' ছবিটি দেখে গা ছমছম করে। লাল মেশানো সবুজ রঙের এক বিশাল অজগর পাকে পাকে জড়িয়েছে নগরপ্রাচীর, রুদ্ধ করে রেখেছে বহির্গমনের সমস্ত পথ, তার মরণ-আলিঙ্গনে এই যেন চূর্ণ হয়ে যাবে পাথর।

রোয়েরিখের কোনো বাস্তবধর্মী নিসর্গচিত্র বা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের ক্যানভাস না নিয়ে গোর্কি যে ঠিক এই প্রতীকধর্মী ছবিটিই বেছেছিলেন, তার একটা মানে আছে সম্ভবত।

'অনলাভা'... সারা আকাশ ছেয়ে গেছে অগ্নিকাণ্ডের রক্তিম ছটায়। বেলজিয়মের রাষ্ট্রপ্রতীক অনুসরণে রীতিপ্রধান শৈলীতে

অঙ্কিত এক সিংহমূর্তি ভূপাতিত, তার সামনে মধ্যযুগীয় এক কেল্লার কাছে নিশ্চল যোদ্ধা। তার তরবারি আর ঢাল মাটিতে ঠেকানো, আগুনের তাণ্ডবের সামনে তা নিষ্ফল। বাকি শুধু সসম্মানে কর্তব্য পালনে মৃত্যুবরণ।

'রাজমুকুট'... তিন রাজা তরোয়ালে তরোয়াল ঠেকিয়ে শপথ নিয়েছে সামরিক মৈত্রীর। কিন্তু স্পষ্টতই তরবারি উদ্যত হয় নি ন্যায়ের জন্য, সাফল্যের আশা নেই তাদের। মাথা থেকে মুকুট খসে ভেসে যাচ্ছে আকাশের সুদূরে।

শেষত 'মানবিক ব্যাপার'... ন্যাড়া পাহাড়ের কিনারে সাবেক কালের পোশাক পরা অস্থির একদল লোক। কিসে যেন ভয়ানক নাড়া খেয়েছে সবাই, উত্তেজিত আলোচনা করছে। পলিতকেশ এক বৃদ্ধ হাত তুলে আবেদন করছে আকাশের উদ্দেশে, আরেকজন সক্ষোভে তাকিয়ে আছে নিচে নগরের ধ্বংসস্তূপের দিকে।

নিজের 'দৈবজ্ঞসুলভ' স্বপ্নকে রোয়েরিখ অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় রূপ দিয়েছেন। রুশ প্রতীকবাদীদের প্রিয় লাল রঙ ছবিতে আছে অনেক। শঙ্কার শিহর জাগে তাতে। ওস্তাদের মতো শিল্পী কাজে লাগিয়েছেন নাগ, দেবদূত, সর্বভুক হুতাশনের বাইবেলোক্ত পরিচিত কল্পপ্রতিমা, লৌকিক মহাগাথা অনুসরণে প্রকৃতির ভৌত শক্তিকে বিজড়িত করেন মানবিক ব্যাপারের সঙ্গে, পুরনো রুশী দেবপট (আইকন) অথবা প্রিণ্টের আদলে তাকে করে তোলেন প্রথাশ্রয়ী।

১৯১৫ সালে 'শিল্প জগত' প্রদর্শনীতে রোয়েরিখের এইসব ছবি সত্যি করেই চাঞ্চল্য জাগায়। তাঁর সহজবোধ্য প্রতীক অব্যর্থে তুলে ধরে তৎকালের ট্রাজেডি, দুর্বৃত্ত রাজপুরুষেরা যাকে রক্তস্নানে টেনে এনেছে সে দেশটার ভয়াবহ অসহায়তা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খবর রোয়েরিখ পান তালাশকিনোতে। স্বদেশভক্ত সন্তান, যে মনে করে শান্তিতে এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে ঐক্যেই কল্যাণ, কী সে করবে? প্রশ্নটা জটিল এবং শোকাবহ।

সর্বান্তঃকরণে রোয়েরিখ ছিলেন রুশ জনগণের পক্ষে। ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমিক হিশেবে তিনি জানতেন যে স্বভূমি রক্ষায় জনগণের সংকল্প সুদৃঢ়। তিনি লেখেন: 'আমাদের জমিকে ছারখার করতে আসছে শত্রু, আর প্রতিটি টিবি, প্রতিটি স্রোতস্বিনী, পাইনকুঞ্জ হয়ে উঠছে আরো প্রিয়তম, আদরণীয়। বাইরের ও ভেতরের প্রতি ইঞ্চি জমি যে জনগণ রক্ষা করছে সেটা এইজন্য নয় যে ওটা তাদের, তার কারণ এ জমি সুন্দর, অপরূপ, সত্যিই নিগূঢ় মহৎ তাৎপর্যে ব্যাপ্ত।'

জাতীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য রোয়েরিখ সর্বদা প্রস্তুত থাকলেও উগ্র শোভিনিস্টদের বিরোধী ছিলেন তিনি। শাসক ওপর মহলের আগ্রাসনী অভিসন্ধির সঙ্গে দেশ কল্যাণের সম্পর্ক যাঁরা দেখতে চান নি, রুশ বুদ্ধিজীবীদের সেই অংশের সঙ্গে তিনি নির্দ্বিধায় যোগ দিয়েছিলেন। রোয়েরিখ তৎক্ষণাৎ স্থির করলেন, যুদ্ধকেই ধিক্কার দেওয়া তাঁর কর্তব্য।

১৯১৪ সালে রোয়েরিখ আঁকেন 'মানবজাতির শত্রু' নামে পোস্টার। তাতে তিনি লুভেন, শার্নতিন, রেইমসের সাংস্কৃতিক ধ্বংসকাণ্ডে অভিশাপ দেন। পোস্টারটি পাঠানো হয় ফৌজে এবং সামরিক এক্সাকাগুলিতে। শান্তির জন্য শিল্পীর উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছিল মানবপ্রতিভার সুকৃতি সংরক্ষণের জন্য সংগ্রামে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতির স্মরণিকা সংরক্ষণের জন্য বিশেষ চুক্তির প্রয়োজনীয়তা রোয়েরিখ বোধ করেছিলেন রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়েই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় তিনি প্রশ্নটিকে ব্যাপক জনসমাজের বিবেচনার জন্য পেশ করেন, চেষ্টা

করেন তাতে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব অর্পণের জন্য। রুশ ফৌজের অধিনায়ক মণ্ডলী এবং ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে আবেদন করেন যেন বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপযুক্ত চুক্তি মারফত জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক অর্জন যুদ্ধের কালে রক্ষা করা হয়।

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদ্যোগে রোয়েরিখ তাঁর প্রকল্পের কথা জানান নানান উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে এবং ১৯১৫ সালে স্বয়ং জার নিকোলাইকেও, কিন্তু ব্যাপারটা এগুল না বিশেষ। তা সত্ত্বেও সামরিক সংঘর্ষের কালে সাংস্কৃতিক মূল্য রক্ষার সংকল্প থেকে রোয়েরিখ বিরত হন নি, তার কার্যকরণই একটা বড়ো জায়গা নেয় তাঁর পরবর্তী সামাজিক ক্রিয়াকলাপে।

যুদ্ধের শুরু থেকে রুশ রেড ক্রসের কাজেও অংশ নেন রোয়েরিখ। ১৯১৫ সালে আহত ও পঙ্গু সৈনিকদের শিল্প স্টুডিওগুলির কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। রোয়েরিখের উদ্যোগে শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়ে বিশেষ ক্লাস খোলা হয় আহতদের শিক্ষাদানের জন্য।

যুদ্ধের কালে রোয়েরিখের প্রবন্ধগুলি একটি বিশেষ রূপ নেয়। যুদ্ধ নিয়ে তাঁর স্কেচগুলিতে যুদ্ধকে তিনি ছুঁয়ে যেতেন কেবল আলগাভাবে। যুদ্ধ তার সমগ্র অমোঘতায় শিল্পীর কাছে ছিল এক বিকট ব্যাপার। তাই শিল্প ও জ্ঞানপ্রচারের মূল কাজ থেকে বিচ্যুত হত না তাঁর ভাবনা। 'যাত্রাকালের বাণী' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন: 'আমরা ভাবি গতকালের জন্য নয়, আগামী কালের জন্য, সর্বমানবিক গঠন ও সৃজনের জন্য। ভাবি এই কথা জেনে রেখেই যে বীর্য ছাড়া সৃজন অসম্ভব। সর্বাগ্রে, সৃষ্টির কথা বলার অধিকার আছে কি আমাদের? মহাসংগ্রামের দিনগুলোয়? যখন শিল্প নির্বাক হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়? যখন নির্বোধ বিলাস ও অপব্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে লোকে... কিন্তু সত্যকার শিল্প নির্বোধ বিলাস নয়। সত্য ও সুন্দর যে ঈশ্বর, তার তপস্বী অপব্যয়ে অক্ষম। শিল্প একটা চাহিদা। শিল্প জীবন। মন্দির কি বিলাস? গ্রন্থ আর জ্ঞান কি হতে পারে অপব্যয়? শিল্প যদি হয় একটা মহান প্রয়োজন ও সমৃদ্ধ জীবন, তাহলে অবশ্যই বর্তমানেও শিল্পের কথা বলা চলে। শিল্প যদি স্বদেশের সেবা করে, তাহলে অবশ্যই তার সামনে মাথা নত করা উচিত। আর সেটা অবশ্যই নেহাৎ চাকুরিতে নয়, রুচির মহিমায়নে, আত্মোপলব্ধির বিকাশে, প্রাণের উত্থানে। সমুন্নত পথের প্রবর্তনায়।'

যুদ্ধের সময় রোয়েরিখের শিল্পে রুদ্র পূর্বাভাসের স্থান নেয় লোকযান প্রসঙ্গ। মাঝে মাঝে শিল্পী তা অবারিত করেছেন লোকের পরিত্রাণে আগত তাপস বিষয়ে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় ধারণা অবলম্বনে, যেমন 'মহান উস্তিউগের কাছ থেকে শিলামেঘ সরিয়ে দিচ্ছেন ন্যায়পর প্রকোপি', 'অর্ণবযাত্রীদের জন্য ন্যায়পর প্রকোপির প্রার্থনা' (১৯১৪), 'রোগত্রাতা পান্তেলেইমন', 'তিনটি পুলক' (১৯১৬) ছবিতে। কখনো কখনো তাঁর আঁকায় নিছক রূপকথার চরিত্র দেখা দেয়, যেমন 'গণকিনী' (১৯১৬), অথবা তা আশ্রয় করে লৌকিক সর্বেশ্বরবাদ যেমন 'আকাশের আদেশ', 'আকাশের শরক্ষেপ — পৃথিবীর বল্লম', 'প্রাণের আলয়' (১৯১৫)।

যুদ্ধকালীন চিত্রগুলিতে নিরুপায়তা জাগে না। শিল্পীর মনের তার আশাবাদে বাঁধা, ভয়ংকর অগ্নিপরীক্ষাতে তিনি ভীত নন।

বিশ্বযুদ্ধের সময় জ্ঞানপ্রচারের ক্ষেত্রে বেশ বেড়ে যায় রোয়েরিখের ক্রিয়াকলাপ। গোর্কি এবং সমরবিরোধী মনোভাবের অন্যান্য রুশী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকে ঘন

ঘন। যুদ্ধ যে তাঁর পাতা সৃজনী পথ থেকে তাঁকে সরাতে পারে নি রোয়েরিখের এই শ্রমভারাক্রান্ত কাজকর্ম যেন তার পরিচায়ক।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তেমন নয়। তাঁর পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্ষেত্র প্রাচ্যচর্চার পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে যায় যুদ্ধে। আর সেইটেই একটা নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছিল তাঁর জীবনে। তাঁকে যে দেশগুলো টানছে তাদের বিষয়ে একমাত্র পুঁথিগত সংবাদে সীমিত থাকা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব, যুদ্ধের ঠিক আগেই তিনি এশিয়ায় একটি বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীয় অভিযানের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

১৯১৩ সালে রোয়েরিখ প্যারিসে সাক্ষাৎ করেন রুশী প্রাচ্যবিদ ভ. ভ. গলুবেভের সঙ্গে, ইনি স্থায়ীভাবে প্যারিসেই বাস করছিলেন, ইন্দোনেশীয়, ভারতীয় ও তিব্বতীয় শিল্পের ব্যাপারে পণ্ডিত। গলুবেভ তখন সবে ফিরেছিলেন ভারত থেকে, আবার সেখানে যাবার উদ্যোগ করছেন। রোয়েরিখ তাঁর সঙ্গে একত্রে প্রাচ্য দেশাদি সমীক্ষার একটি পরিকল্পনা আলোচনা করেন এবং পিটার্সবুর্গে ফিরে প্রবন্ধ লেখেন 'ভারতের পথ' যা শেষ হয়েছে এই কথায়: 'সর্ববিধ সাফল্য কামনা করি ভ. ভ. গলুবেভের, অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও আনন্দময়ের আশা করি তাঁর কাছ থেকে... রাত্রে কালো কালো সরোবরের কাছে সমবেত হচ্ছে ভারতীয় নারী। হাতে প্রদীপ। ঝুনঝুন বাজছে মিহি ঘণ্টি। ডাকছে পবিত্র কাছিমদের। খাওয়াচ্ছে। নারকেলের খোলায় প্রদীপ বসিয়ে তা ভাসাচ্ছে জলে। সৌভাগ্যের কামনা করছে। ভবিষ্যৎ গুনছে। সুন্দরের অধিষ্ঠান ভারতে। প্রলোভিত করে ভারতের পথ।'

সে পথ বহুকাল থেকেই হাতছানি দিচ্ছে রোয়েরিখকে, তাতে পদার্পণের জন্য কোমর বেঁধে লাগলেন শিল্পী। স্বদেশের পণ্ডিতদের গবেষণা কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য প্রাচ্যের দেশ ও জাতিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলায় তাঁদের প্রয়াসে রোয়েরিখ যোগ দিতেন। যেমন, জীবন্ত বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুশীলন এবং বৌদ্ধধর্মের বিরল প্রদর্শনী পিটার্সবুর্গে আকৃষ্ট করার জন্য রুশী প্রাচ্যবিদরা একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব দেন। তাতে সাহায্য করার কমিটিতে রোয়েরিখও ছিলেন। কমিটির বৈঠক হত সাধারণত প্রখ্যাত ভারতবিদ ই. প. মিনায়েভের ভাগ্নি শেনইদার বোনেদের বাড়িতে।

ফ. ই. শ্যেরবাৎস্কির উদ্যোগে ভারত থেকে রাশিয়ায় প্রাচীন হিন্দু মন্দির নিয়ে আসার প্রস্তাব আলোচিত হয় কমিটিতে। রোয়েরিখ তাঁর 'দিনলিপির পাতায় লিখেছেন: 'মসজিদ ও বৌদ্ধ মন্দিরের সঙ্গে এমন চমৎকার সহচর হত কালোপযোগী ও অপূর্ব। শ্যেরবাৎস্কির প্রস্তাব আমরা লুফে নিলাম।' রুশী প্রাচ্যবিদরা বিজ্ঞানের অনুরক্ত হওয়ায় পরস্পরবিরোধী ধর্মের মধ্যে গোঁড়া পার্থক্যের পরোয়া করতেন সবচেয়ে কম। অভিজ্ঞ স্থপতির তত্ত্বাবধানে হিন্দু মন্দির খুলে ফেলে বোম্বাই থেকে সমুদ্রপথে পিটার্সবুর্গ পাঠাবার কথা হয়। কম ভাড়ায় পরিবহন নিয়ে 'স্বেচ্ছাব্রতী নৌবহরের' সঙ্গে আলোচনাও শুরু হয়েছিল কিন্তু স্বভাবতই সবই চাপা পড়ে যায় যুদ্ধের ফলে।

শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়ের বৃত্তি পাওয়া কয়েকজন ছাত্রকে ভারতে পাঠাবার আয়োজন করেছিলেন রোয়েরিখ, কিন্তু এখানেও যুদ্ধ হল অন্তরায়। পিটার্সবুর্গে একটি ভারতীয় মিউজিয়ম খোলার খুবই ইচ্ছে ছিল তাঁর। ভ. ভ. গলুবেভের সংগ্রহ থেকে কিছু প্রদর্শনী সামগ্রী পাবার আশা করেছিলেন রোয়েরিখ, বিজ্ঞান অকাদেমির কাছে আবেদন করেন যেন

তাদের পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়।

একটু বিশেষ করে বলতে হয় আগাভান দরজিয়েভের সঙ্গে নিকোলাই রোয়েরিখের সম্পর্কের কথা। বৈকাল পারের এই বুরিয়াত বৌদ্ধ শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিব্বতে, বহুদিন ছিলেন লাসায়, এবং দালাই লামার বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। বিশ শতকের গোড়ায় তিব্বতে ব্রিটেনের আগ্রাসনী নীতি যখন রীতিমতো শংকাজনক হয়ে ওঠে তখন ব্রিটিশ উপনিবেশ-বাদের পথরোধ করার উদ্দেশ্যে তিব্বত সমেত মধ্য এশিয়ায় রাশিয়া যাতে সক্রিয় হয় সেজন্য রুশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য দালাই লামা দরজিয়েভকে রাশিয়ায় পাঠান তাঁর জরুরী দূত হিশেবে।

রোয়েরিখ তাঁর সাধ্যমতো আগাভান দরজিয়েভের দৌত্যের পোষকতা করেছিলেন। এর জন্য ঐ দরজিয়েভ মারফতই দালাই লামা রোয়েরিখকে ধন্যবাদ জানান ও স্মারক উপহার পাঠান।

একটু আগে বেড়ে বলা যাক যে অক্টোবর বিপ্লবের পর আগাভান দরজিয়েভ বাস করতে থাকেন সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং বুরিয়াতিয়ার লামা নবীকরণ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা হয়ে ওঠেন। বিপ্লবের সময় এ আন্দোলন সোভিয়েত রাজের পক্ষ নেয় এবং মঠকে মেহনতী গোষ্ঠীতে পরিণত করে বৌদ্ধ ধর্মাচারকে সংস্কারের প্রয়াস পায়।

অক্টোবর বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই রোয়েরিখের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রগতিশীল সামাজিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত করাই সমাজের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব। সার্থকভাবে তা পালনের জন্য প্রয়োজন প্রাচ্যের জনগণের সঙ্গে, তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও অবিনাশী ঐতিহ্যের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগ। আর আমরা দেখছি 'ভারতের মহাপথে' পদার্পণের জন্য শিল্পী কী প্রণালীবদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন আমূলভাবে। এ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অর্থ তাঁর পক্ষে ছিল নিজের কাছেই নিজেকে পতিত করা।

১৯১৫ সালের গোড়ায় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন রোয়েরিখ। রোগটা এত গুরুতর আকার নেয় যে 'বির্জেভিয়ে ভেদোমস্তি' পত্রিকায় মে মাসে তাঁর স্বাস্থ্যর হাল সম্পর্কে বুলেটিন বেরতে থাকে। ফাঁড়া কেটে গেলে ডাক্তারেরা তাঁকে ক্রিমিয়ায় বায়ুপরিবর্তনের পরামর্শ দেন। কিন্তু রোয়েরিখকে টানল তাঁর প্রিয় নভগোরদ অঞ্চল। ওদিকে যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হয়ে উঠছিল। উনি নোটে লিখলেন: 'মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আমরা শুনতে পাই। মাটি বলছে, সব কেটে যাবে, তারপর ভালো হবে। আর প্রকৃতি যেখানে দৃঢ়, ভূগর্ভ যেখানে অনাহত, মানুষের মূলাধারও সেখানে দৃঢ়, অনুচ্ছৃঙ্খল।'

রোয়েরিখের স্বাস্থ্য ফিরছিল ধীরে ধীরে। ঘন ঘন ব্রঙ্কাইটিইস আর নিউমোনিয়া থেকে চিকিৎ-সকেরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বড়ো শহরে থাকা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর। কাজকর্ম থেকে বেশি দূরে সরে না যাবার জন্য রোয়েরিখ বাড়ি ভাড়া করলেন সের্দোবল (সর্তাভালা)-তে, লাদোগা হ্রদস্থ শৈলশ্রেণীতে পাইন বনের মাঝখানে। স্থায়ী বসবাসের জন্য সপরিবারে সেখানে উঠে আসেন ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে। জায়গাটা পিটার্সবুর্গের কাছাকাছি হওয়ায় সময়ে সময়ে সেখানে গিয়ে শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত। কিন্তু রোগের প্রকোপ মাঝে মাঝে এমনই বাড়ত যে

১৯১৭ সালের মে মাসে তিনি উইল করে ফেলার মনস্থ করলেন:

'আমার যাকিছু আছে, যাকিছু প্রাপ্য তা সব আমার স্ত্রী ইয়েলেনা ইভানোভনা রোয়েরিখকে দিয়ে যাচ্ছি। যখন তিনি প্রয়োজন বোধ করবেন তখন তিনি তা সমান সমান ভাগে দিয়ে দেবেন আমাদের পুত্র ইউরি এবং স্‌ভিয়াতোস্লাভকে। ওরা থাকুক মিলেমিশে, খাটুক স্বদেশের হিতসাধনে। রুশ জনগণ এবং নিখিল রুশ শিল্প প্রণোদন সমিতির কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন আমার পরিবারকে সাহায্য করেন, সাহায্য করেন এই কথা মনে রেখে যে জীবনের সেরা বছর ও ভাবনাগুলিকে আমি দিয়েছি রুশ শিল্পালোকের সেবায়। বিদ্যালয়ে আমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রুশ শিল্পের মিউজিয়মকে অধিকার দিচ্ছি আমার মরণোত্তর উপহার হিশেবে মিউজিয়মের জন্য আমার কোনো একটা শিল্পকর্ম বেছে নিতে। বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, আমার কথা তাঁরা যেন ভাবেন ভালো মনে, কেননা আমি ছিলাম তাঁদের ভালো সুহৃদ। ১ মে, ১৯১৭ সাল, পেত্রগ্রাদ। শিল্পী নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখ।'

পীড়া এবং সের্দোবিলে বাস পাতার কারণে বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে রোয়েরিখকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে খানিকটা সরে যেতে হয়, তবু অল্প যেটুকু তিনি করতে পেরেছিলেন তাতেই বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তার ধারা।

জার সরকার উচ্ছেদের অল্প পরেই ১৯১৭ সালের ৪ মার্চ গোর্কি তাঁর ভবনে চিত্রকর, সাহিত্যিক, শিল্পীদের একটি বড়ো দলকে সমবেত করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রোয়েরিখ, আলেক্‌সান্দর বেনুয়া, বিলিবিন, দবুজিন্‌স্কি, প্রেত্রভ-ভদকিন, শ্যুকো, শালিয়াপিন, মায়াকোভ্‌স্কি। সম্মেলনে ১২ জন লোকের একটি কমিটি নির্বাচিত হয়, রোয়েরিখও থাকেন তাতে। ৬ মার্চ গোর্কি, রোয়েরিখ, বেনুয়া ও দবুজিন্‌স্কির স্বাক্ষরে এক আবেদন যায় শ্রমিক কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কাছে। তাতে বলা হয়:

'মুক্ত রাশিয়ায় শিল্পের বিকাশ সম্পর্কিত প্রশ্নে ব্যাপৃত শিল্প কমিশন দেশের স্মরণিকাগুলির সংরক্ষণ, নতুন স্মরণিকার প্রকল্পন, ললিত কলা, জাতীয় উৎসবের আয়োজন, থিয়েটার, মুক্তি স্তোত্র রচনা ইত্যাদি ব্যাপারের পরিচালনার জন্য সংস্থার মুসাবিদার প্রশ্ন স্থিরীকরণে তার শক্তি তুলে দিচ্ছে শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের হেফাজতে, এই সিদ্ধান্ত কমিশন গ্রহণ করেছে সর্ববাদী-সম্মতক্রমে...'

এ প্রস্তাবে সায় দিতে দেরি করে নি সোভিয়েত। 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকার নবম সংখ্যাতেই কার্যনির্বাহী কমিটির আহ্বান প্রকাশিত হয় যা অচিরেই পেত্রগ্রাদ ও তার আশেপাশে সেঁটে দেওয়া হয় দেয়ালে। তাতে বলা হয়েছিল:

'নাগরিকগণ, রক্ষা করুন প্রাসাদ, এগুলি হবে আমাদের নিখিল জাতীয় শিল্পের প্রাসাদ, রক্ষা করুন চিত্র, মূর্তি, ভবন, এগুলি আপনাদের এবং আপনাদের পূর্বপুরুষদের আত্মিক শক্তির রূপায়ণ, একটা পাথরও ছোঁবেন না, রক্ষা করুণ স্মরণিকা, হর্ম্য, প্রাচীন সামগ্রী, দলিলপত্র এসবই আপনাদের ইতিহাস, আপনাদের গর্ব!'

শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতে আবেদন পাঠিয়ে কমিশন একই সময়ে অনুরূপ প্রস্তাব নিয়ে দ্বারস্থ হয় সাময়িক সরকারের। তারাও গোর্কির সম্মেলনে প্রস্তাবিত লোকেদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট কমিসারিয়েত গঠনে রাজী হয়। শিল্প কমিশনে গৃহীত ও প্রচারিত একটি দলিলে (যাতে

অন্যান্যদের ভেতর রোয়েরিখেরও স্বাক্ষর ছিল) বলা হয়: 'পুরনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের শিল্পজীবন কাটছিল তাতে বহু শহরে নানা ধরনের স্মরণিকা পরিকল্পিত হয়েছে এমনকি প্রায়ই তা রূপায়িতও হচ্ছে। তাদের বেশির ভাগই যেহেতু শিল্পরুচির দাবি মেটায় না, তাই রাজদরবার ও বাদশাহী সম্পত্তির প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীর কমিসারের অধীনস্থ বিশেষ শিল্প সম্মেলন এবং শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা অনুমোদিত শিল্প কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সরকারী ও সামাজিক যেসব প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভের, বিশেষ করে রমানভ বংশের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যাপারে পরিচালনায় আছে, তাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হোক যেন এই সমস্ত স্মরণিকা গড়ার কাজ বন্ধ করা হয় এবং সূচিত কাজ ও প্রকল্পের বিবরণ বিষয়ে যেন অবহিত করা হয় শিল্পের বিশেষ কমিশনকে (শীত প্রাসাদ)।'

কমিশনের ব্যাপক গণতান্ত্রিক কর্মসূচির সঙ্গে মিল ছিল জ্ঞানালোক প্রচার বিষয়ে রোয়েরিখ দৃষ্টিভঙ্গির। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নতুন রাশিয়ায় তার জনগণের আত্মিক শক্তি বিকাশের এক অভাবিত সুযোগ আসছে, যে সাধনায় ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর, চাইতেন তাতে লেগে থাকতে। ১৯১৭ সালের ১২ নভেম্বরে তিনি পেত্রগ্রাদে লিখে পাঠান: 'আমি শিল্পের সেবা করেছি ২৫ বছর, সাধ্যমতো রক্ষা করেছি রুশী লৌকিক মর্যাদা, পথ করে দিয়েছি তরুণদের, সৌভাগ্য বোধ করব যদি আমার অভিজ্ঞতা উপকারে লাগে ভবিষ্যৎ শিল্পকর্মীদের।'

'আছি সের্দোবলে, অসুস্থ — ফের পুনঃ পুনঃ এসেছে ফুসফুস প্রদাহ। কবে যাবে ঈশ্বর জানেন। জানলায় বৃষ্টির ঝাপট। সামনে আমার নুট হামসুনের বইয়ের পাতা খোলা, তাঁর ছোটো মাপের জীবন। সেই একই জাহাজ-ঘাটা। ছোট্ট শহরের সেই একই রকমের আগ্রহ-অনাগ্রহ... হামসুনী কৃষ্টিতে বাস করা কঠিন...' ১৯১৭ সালের অক্টোবরে রোয়েরিখ লিখেছিলেন শিল্পবেত্তা আ. প. ইভানোভকে।

কারেলিয়ার প্রায় পাণ্ডববর্জিত শহরটার কূপমণ্ডূক আবহাওয়ায় হাঁপ ধরত রোয়েরিখের। একটু সুস্থ বোধ করলেই ছুটতেন পেত্রগ্রাদে। শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়ে যে গোলমাল চলছিল তাতে খুব উদ্বিগ্ন বোধ করতেন রোয়েরিখ। টাকার ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল খারাপ। তিনি নিজে খতিয়ান টেনে নানারকম প্রস্তাব দিতেন, তাতে সংকট কাটিয়ে ওঠা যেত। তবে শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদটাও আর্থিক ব্যাপারের চেয়ে কম দুশ্চিন্তার কারণ হয় নি।

শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়কে ভিত্তি করে জনগণের মুক্ত অকাদেমি গড়ার একটি প্রকল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন রোয়েরিখ। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে তিনি পেত্রগ্রাদে বিদ্যালয়ের কমিটিকে লিখে পাঠান:

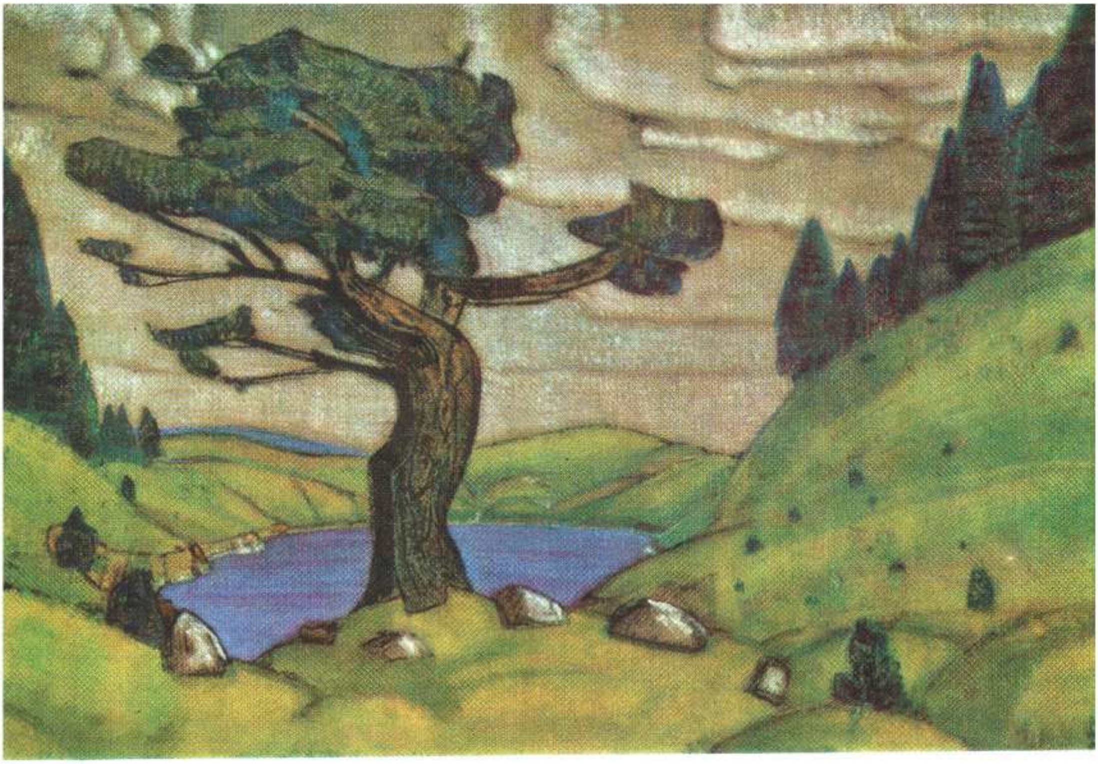
'এখনো আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নি। হিমেল বায়ুর চিকিৎসা প্রয়োজন। কমিটি আমায় বিদ্যালয়ের যে প্রকল্প রচনার ভার দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ হয়েছে। ব্যাপারটা যাতে আটকে না থাকে তার জন্য অনুরোধ করি, বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ অধ্যক্ষ, কিংবা সচিব অথবা উভয়কেই আমার কাছে পাঠানো হোক, ব্যাখ্যা করে প্রকল্পটা আমি তাঁদের দেব। আশা করি আমার প্রস্তাব থেকে সমিতির কাছে গ্রহণযোগ্য একটা শিল্পীয় ও জ্ঞান-প্রচারণী প্রতিষ্ঠান বেরিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যোদ্ধার করে যথাশীঘ্র আমার প্রিয় কাজে ফেরার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি।'

১৯১৭ সালের বসন্তে ও গ্রীষ্মে পেত্রগ্রাদ এসে রোয়েরিখ বুঝেছিলেন যে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকই যে তাঁর প্রকল্প সমর্থন করবেন, ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। তাঁদের অনেকেই 'উত্তম অতীত যুগ' প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখছিলেন, কালহরণের নীতি নিয়েছিলেন, সাময়িকভাবে স্কুল বন্ধ করে দিতেও আপত্তি ছিল না তাঁদের।

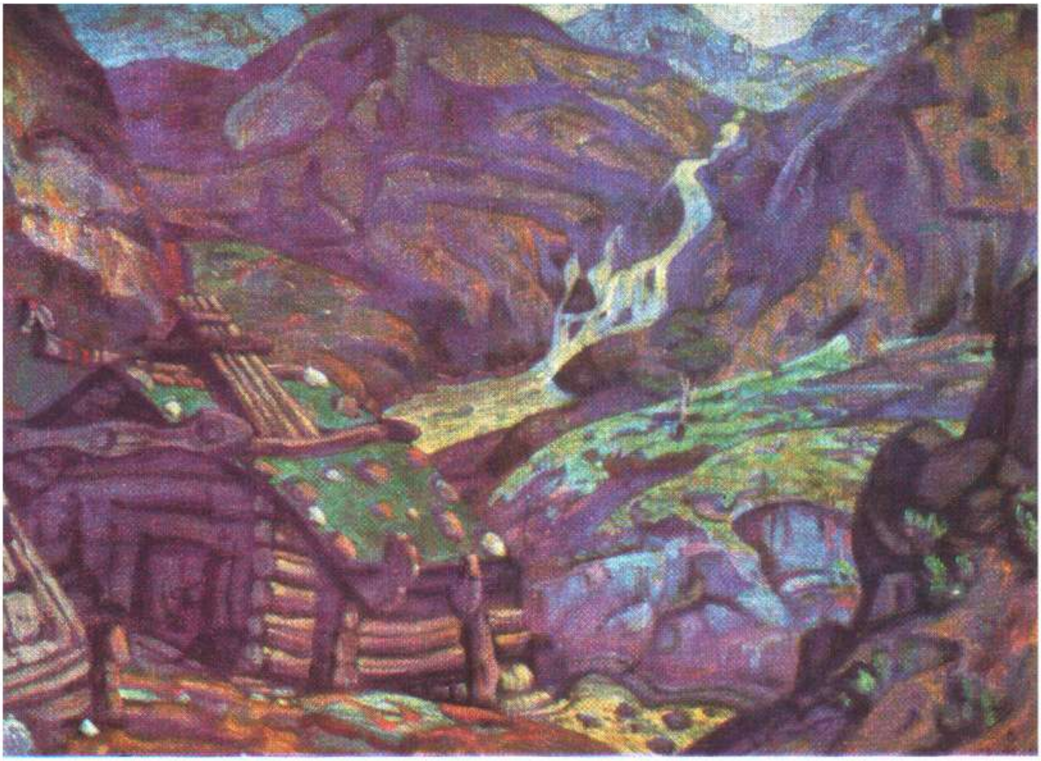
১৯১৮ সালের গোড়ায় কমিটির অধিকাংশ সদস্য যখন স্কুল বন্ধ করে দেবার দিকে ঝোঁকেন, রোয়েরিখ তখন তাঁর প্রকল্পের সমর্থনে একটি প্রতিবেদন রচনা করেন। তার যে খসড়াটা রয়ে



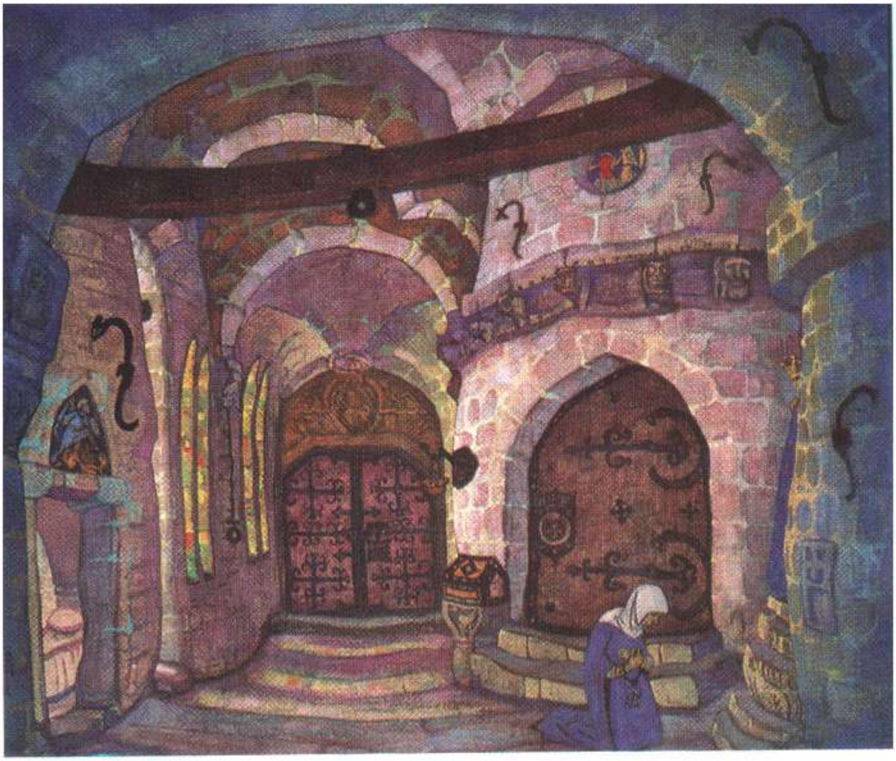
পবিত্র দ্বীপ। ১৯১৭। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম,
লেনিনগ্রাদ।



'পবিত্র বসন্ত'। মঞ্চসজ্জার স্কেচ। ১৯১২। রাষ্ট্রীয় রুশ
মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



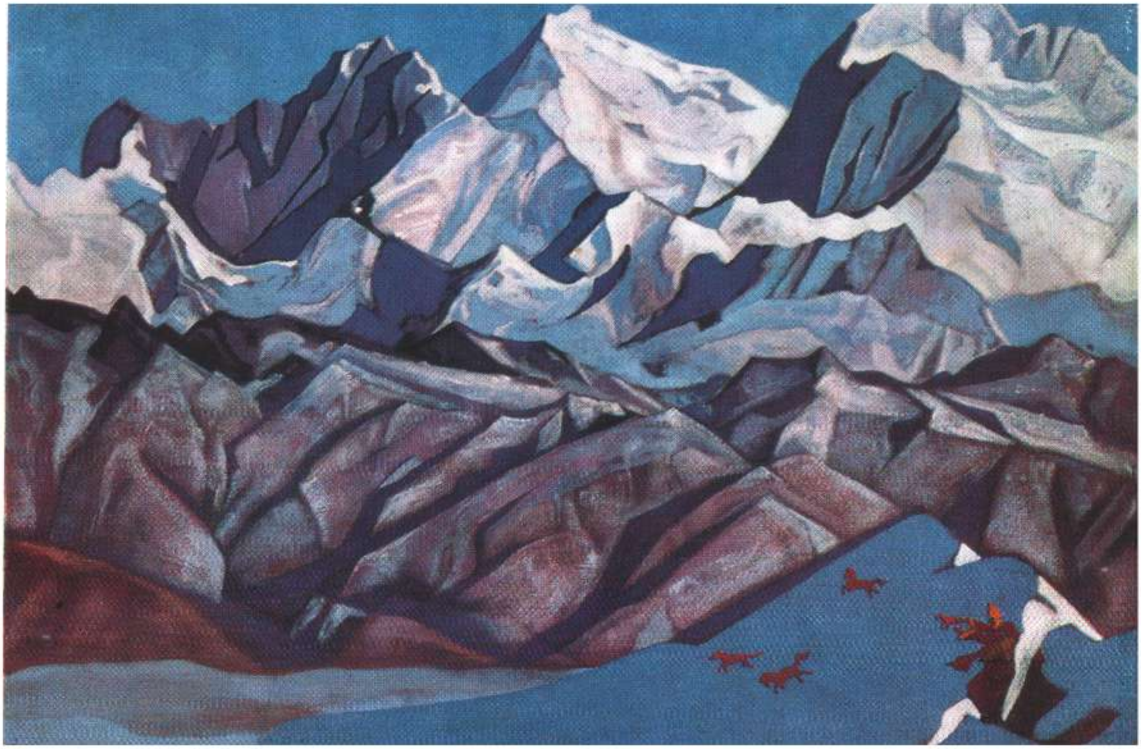
'পিয়ের গ্যুণ্ট' মঞ্চসজ্জার স্কেচ। ১৯১২। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



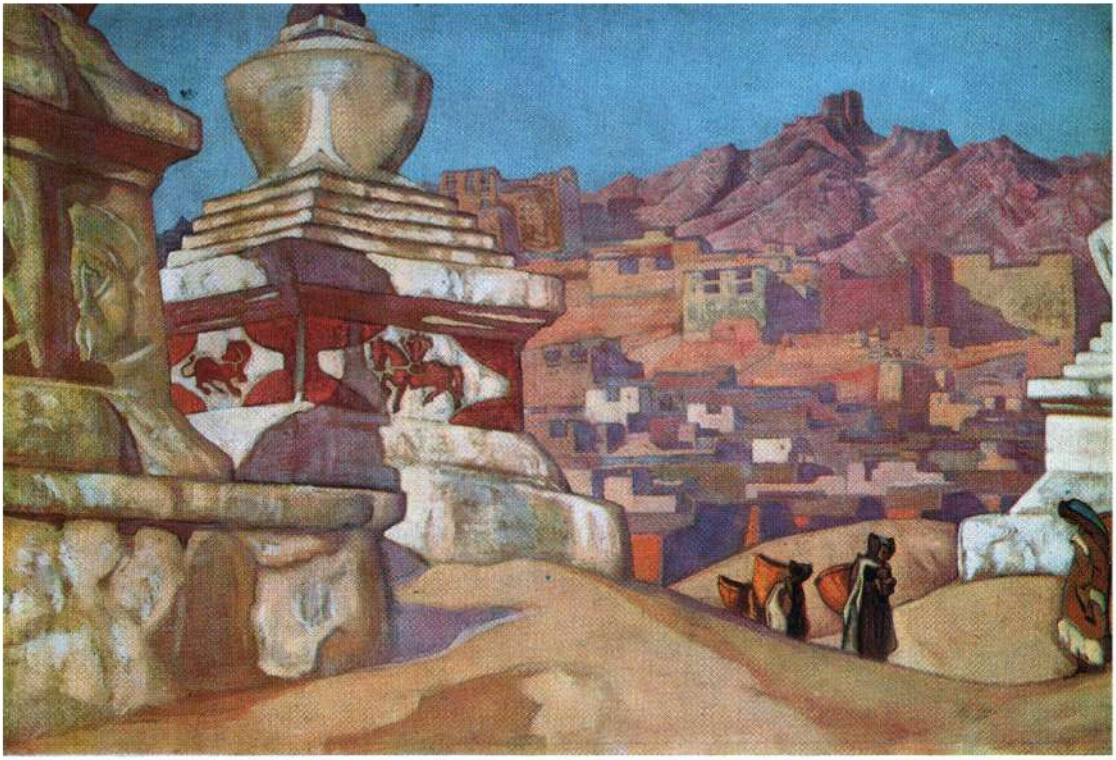
‘ভগিনী বিয়াত্রিস’। মঞ্চসজ্জার স্কেচ। ১৯১৪। রাষ্ট্রীয়
রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



আসন্নের ধ্বজা। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম,
গোর্কি।



লাল ঘোড়া। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।



সুখের ঘোড়া। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।



মৈত্রেয় ॥ বিজয়ী। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম,
গোর্কি।

গেছে সেটা রোয়েরিখের পুনর্গাঠনিক পরিকল্পনার দিক থেকেই নয়, রাশিয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও সমূহ উল্লেখযোগ্য। যখন বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই যেকোনো বৈপ্লবিক নবপ্রবর্তনা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছিলেন, রোয়েরিখ তখন একেবারেই ভিন্ন ভাবনায় আলোড়িত। প্রতিবেদনের মুসাবিদায় উনি লিখেছিলেন: 'কমরেডগণ, বিপুল গুরুত্বের প্রশ্ন আমাদের বিবেচনা করতে হবে। দেশের আর্থিক জীবন সংহত না হওয়া পর্যন্ত খুবই হিসেবীর মতো, খুবই ভেবেচিন্তে কাল কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে আমাদের এবং ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে বাঁচাতে হবে আমাদের জনগণের, আমাদের মুক্ত শিল্প বিদ্যালয়। অবশ্যই শত্রুভাবাপন্ন, অনুপযোগী লোক পাওয়া যাবে যারা ঘোরালো করে তুলবে বিদ্যালয়ের অবস্থা। আমি জানি যে গত বসন্তে স্কুলের ব্যাপারে এমন কিছু রটানো হয়েছিল যা বাস্তব অবস্থার বিপরীত। অসত্য কথনে কুণ্ঠিত না হয়ে মুখে মুখে খবর ছড়িয়েছিল। জনগণের জীবনে শিল্পের মহান তাৎপর্যে আমরা বিশ্বাস করি। কমরেডগণ, যতই দুরূহতা আমাদের সামনে থাকুক, দৃঢ়ভাবে এই কথা মনে রাখব যে জনগণের আলোকপ্রাপ্তি সর্বদাই মানবজাতির সবচেয়ে অলঙ্ঘনীয়, সবচেয়ে আদরণীয়, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বীর্য।'

এই ভাষণে খুবই বৈশিষ্ট্য-সূচক 'কমরেড' সম্বোধন, যাতে তখন কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীর পিত্তি জ্বলত। অজান্তে, হয়ত অক্টোবর বিপ্লবের সর্বাকিছু নূতনত্ব পুরো গ্রহণ না করেও রোয়েরিখ গোড়া থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের ন্যায্যতা ও অমোঘতায় নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠেন। নিজের পরিকল্পনায় তিনি পুরনো জীবনে প্রত্যাবর্তন পুরোপুরি নাকচ করেন, কখনো তার সমর্থনে দাঁড়ান নি।

১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে রোয়েরিখের দিনলিপি ও সাহিত্যিক রচনায় বারম্বার এসেছে প্রাচ্য ও ভারতবর্ষের উল্লেখ, উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে প্রাচ্য দার্শনিকদের লেখা থেকে। মানবজাতির রহস্যময় স্মৃতিকাগারে পৌঁছনোর সংকল্প তাঁর দৃঢ় হয়ে উঠল। তাঁর অপ্রকাশিত একটি রচনা — 'ঐক্য' শিল্পী শেষ করেছেন এই কথায়:

'সৈকতে অসংখ্য ধূসর শিলা, তরঙ্গের আলিঙ্গনধৌত চাঙড় মসৃণ। উন্মোচিত করুন তাদের। হাতুড়ি মেরে জীবিত করে তুলুন। তার ভেতরে আছে নীলা, পোখরাজ, হায়াসিন্থ। ঝকমকে স্ফটিক। লক্ষ লক্ষ বছরের সঞ্চয়। ভেঙে ফেললেন? গ্র্যানাইট? ফের কোআর্ৎস আর স্বচ্ছ পাথর? পরীক্ষা করুন, খুঁজুন। সব পাথরই সাধারণ... হতাশ হবেন না। বিশ্বাস রাখুন। একটা দেশান্তরে কত জীবন দেয় যাযাবর পাখিরা? প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ এই নির্দেশ দিয়েছেন...' এর পর 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' থেকে উদ্ধৃতি।

রোয়েরিখের এই সময়কার চিন্তা সম্যক প্রকাশ পেয়েছে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে সমাপ্ত এবং পরে 'আশীর্বাদের পথ' গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর রূপকধর্মী 'অগ্নিশিখা' পত্রোপন্যাসে। এর মূলে আছে আত্মজীবনের কিছু দিক। অপ্রয়োজনীয় সবকিছু বিসর্জন দিয়ে জীবনের নতুন পর্ব শুরু করার জন্য শিল্পী তাঁর অতীতকে বিদায় জানিয়েছেন এতে।

বিশাল পরিবর্তনটার মূলকথাটার সঠিক মূল্যায়ন করে রোয়েরিখ কায়ক্লেশে চলতি ঘটনাবলিতে দিশা খুঁজছিলেন। দিনলিপিতে ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর তারিখ দেওয়া একটা লেখায় আমরা পড়ি: 'মানবজাতিকে যে ঐক্য

ডাক দিচ্ছে তাতে বিশ্বাস করি। প্রবল আহ্বান আর ভবিষ্যদ্বাণীকে জানি, জানি না ঘটমানকে।'

ঐতিহাসিক হিশেবে রোয়েরিখ অতীতের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে নিজের পূর্বাভাসে উপনীত হবার প্রয়াস পান: 'ঐক্যের সোপান জীবনে দেখা দিয়েছে একদিন নয়। দেখা দিয়েছে তিক্ততার সঙ্গে... হয়ত এখনো এটা মাত্র পূর্বানুভব? মিথ্যা ও শত্রুতার বনিয়াদ এখনো শক্ত। ঐক্যের যা পরিপন্থী তা সবই এখনো জীবিত...'

অভূতপূর্ব এক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা ভাবতেন রোয়েরিখ: 'গড়ে উঠছে ঐক্যের আরো একটি সোপান। কিছু দিন আগেও মনে হত ঐক্যের সমস্ত কথাই অলীক স্বপ্ন। কিন্তু ফের ধ্বনিত হয়েছে তারই বাণী, সে বাণী এখনো রূঢ়, প্রাচীনের উচ্চ দিব্যবাণীর মতো নয়। রাষ্ট্রপাট কেঁপে উঠে জনসুজনের দ্বারস্থ হয়েছে। আর জনগণই ঐক্যের প্রথম সোপান।'

রোয়েরিখ বিশ্বাস করতেন যে রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঘটনাবলি দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্বের জন্য জায়গা সাফ করছে। তিনি লিখেছেন: 'জীবনের এই সামঞ্জস্যের জন্য ইতিমধ্যেই বাস্তব-কাজ চলেছে, মন্দিরের সোপান উঠছে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে দিয়ে।' তবে শ্রেণী সংগ্রামের উত্তাল সমুদ্র পরিহার করেই সংস্কৃতির বিশ্বমন্দিরের সোপান বেয়ে আরোহণ করা যাবে সুখশীর্ষে, বলাই বাহুল্য শিল্পীর এ স্বপ্ন ছিল ইউটোপীয়।

বিজ্ঞান ও শিল্পের অরাজনৈতিকতা বিষয়ে যে ধারণা পোষণ করতেন কেবল একা রোয়েরিখ নন, তাতে প্রায়ই ব্যাহত হয়েছে বাস্তবতার সঠিক বোধ। শিল্পীর মনে হয়েছিল, জ্ঞান ও রূপের কাছে সর্বজনীন আবেদনে শত্রুতার অবসান হবে বিশ্বে। অথচ তাঁর নিঃসঙ্গ ভবন থেকে মাত্র কয়েক ডজন কিলোমিটার দূরে কী ঘটছে, নিজেই তার যথেষ্ট খবর রাখতেন না। তাঁর চিঠিপত্র ও দিনলিপি থেকে অনুমান করা যায় যে পিটার্সবুর্গ থেকে কেবল জীবনধারণের দুর্বিষহ পরিস্থিতি আর ছারখারের সংবাদই পেঁছিত তাঁর কাছে। ঘটনার অবজেকটিভ ধারণা না থাকায় রাশিয়ায় ভাঙচুর এবং মিউজিয়ম, গ্রন্থাগার, স্মরণিকা, শিল্পসামগ্রীর ধ্বংসপ্রাপ্তি বিষয়ে গুজব আর বৈদেশিক সংবাদপত্রের মতলববাজ রিপোর্ট শিল্পীকে ব্যাকুল করে তুলত।

রোয়েরিখের জীবনকথায় সাধারণত অনুক্ত থেকে যায় তাঁর কবিতার দিকটা। অথচ তাঁর নিজের কবিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: 'জীবন থেকে পাওয়া চিত্তাবেগই 'পবিত্র চিহ্ন', 'বন্ধুদের কাছে', 'ছেলেটাকে' রূপক কবিতার উৎস।'

রোয়েরিখের কবিতামালা রচিত হয় ১৯০৭ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে। তাঁর কোনো কোনো কবিতা বেরিয়েছিল প্রাক্‌বিপ্লব প্রকাশনায়। ১৯২১ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মোরির ফুল', এর বেশির ভাগই লেখা ১৯১৬—১৯১৯ সালে, অর্থাৎ কারেলিয়ায় থাকাকালে। যেমন সমৃদ্ধ আত্মজীবনীমূলক উপাদান তেমনি সাহিত্যিক সিদ্ধির দিক দিয়েও কবিতাগুলি চিত্তাকর্ষক। রোয়েরিখের আগের 'মুক্ত ছন্দের' কবিতা ও কথিকায় ছিল স্লাভ পরিমণ্ডলের প্রাচুর্য, দ্বিতীয় দশকের শেষে কিন্তু তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। ১৯১৮ সালে লেখা রোয়েরিখের 'আশিসধন্য' কবিতায় আছে:

Как увидим Твой лик?
Всепрощающий лик,
глубже чувства и ума.
Неощутимый, неслышный,
незримый. Приказываю:
сердце, мудрость и труд.

Кто узнал то, что не знает
ни формы, ни звука, ни вкуса,
не имеет конца и начала?
В темноте, когда остановится
все, жажда пустыни и соль
океана, буду ждать сияние
Твое. Перед ликом Твоим
не сияет солнце. Не сияет
луна. Ни звезды, ни пламя,
ни молнии. Не сияет радуга,
не играет сияние севера.
Там сияет Твой лик.
Все сияет светом его.
В темноте сверкают
крупицы Твоего сияния,
и в моих закрытых глазах брезжит
чудесный Твой свет.*

ভাব, কাব্যরূপ, চিত্রপ্রতিমা এমনকি শব্দচয়নেও কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পেত্রগ্রাদে আসা রোয়েরিখের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কেবল একবার। অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাঝে শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের অধিবেশন পরিচালনা করেন তিনি নিজে। তাঁর রচিত সংস্কারের প্রকল্প গৃহীত হয় সম্মেলনে। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানো সম্ভব হচ্ছিল না বলে ১৯১৭ সালের অগস্ট মাসেই তিনি অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাময়িকভাবে সে পদে যান ন. খিমনে। রোয়েরিখ থাকেন কমিটির সদস্য ও অছি।

কিন্তু এখন সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গেই যোগাযোগ ছিন্ন হবার উপক্রম হল। ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয় ফিনল্যান্ডে, রুশ ফেডারেশনের সঙ্গে তা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে, ফলে ফিনল্যান্ডের ভাগে পড়া সের্দোবল আর পেত্রগাদের মধ্যে চলাচলে কোনো বাধা হত না। কিন্তু ওই বছরেরই মে মাসে জার্মান সৈন্যদলের সাহায্যে ফিন বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল রাজ কায়েম করে এবং অনেক দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ফিনল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার সীমান্ত।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলেন নিকোলাই রোয়েরিখ। একটা মফস্বল শহরে বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি, স্থগিত রাখা বৈজ্ঞানিক কাজে ফিরতে পেরে খুশি হয়ে উঠলেন। আগের মতোই রোয়েরিখের পরিকল্পনায় প্রথম স্থান নিল প্রাচ্যে যাত্রা, রাশিয়ার প্রতি এটা তাঁর কর্তব্য বলে জ্ঞান করতেন তিনি। তাঁর দিনলিপিতে ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর তারিখ দেওয়া এই মন্তব্য পাই (দিনলিপির কিছু কিছু উপাদান তিনি 'অগ্নিশিখা' উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন):

---

* কী করে দেখি তোমার মুখ?
ক্ষমাসুন্দর মুখ,
বোধবুদ্ধির চেয়ে সুগভীর,
স্পর্শাতীত, শ্রবণাতীত, অদৃশ্য আমি হাঁকি:
হৃদয়, সম্বোধি আর শ্রম।
রূপ ধ্বনি রুচি যা জানে না
যার শুরু নেই, শেষ নেই, তা কে জানল?
অন্ধকারে যখন থেমে যায় সবকিছু,
মরুর পিপাসা আর সাগরের লবণ,
পথ চেয়ে থাকব তোমার দ্যুতির।
তোমার মুখের সামনে
সূর্য দ্যুতিহীন। দ্যুতিহীন
চাঁদ। তারা না, শিখা না,
বিদ্যুৎ না। দ্যুতিহীন রামধনু,
মেরুজ্যোতির ছটা নেইকো সেখানে।
সেখানে তোমার মুখের দ্যুতি,
তারই আলোয় সবার প্রভা।
অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে
তোমার দ্যুতির কণিকা,
আর আমার মুদিত আঁখিতে
তোমার অপরূপ আলোর উদ্ভাস। — অনুঃ

5*

'ভারতের আচার্যদের আভূমি অভিবাদন করি। আমাদের জীবনের বিশৃঙ্খলায় তাঁরা এনে দিয়েছেন সত্যকার সৃজন, প্রাণের আনন্দ আর আসন্নপ্রসবা স্তব্ধতা। চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের। প্রসন্ন, প্রত্যয়জনক, প্রাজ্ঞ।'

রোয়েরিখের পক্ষে এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে দূরযাত্রায় নামার অর্থ জীবনের একটা নতুন পৃষ্ঠা খোলা আর যে বইখানির প্রস্তাবনায় নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবার কথা বলা হয়েছে, তার কাজ চালিয়ে যাওয়াই সে পৃষ্ঠার নির্বন্ধ। রোয়েরিখ সে কথা ভোলেন নি।

প্রাচ্যে রোয়েরিখের বহুবর্ষ বসবাস এবং ১৯১৮ সালে ফিনল্যান্ড থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'না-ফেরায়' দেখা দিয়েছিল হরেকরকম অনুমান আর পরস্পর-বিপরীত মন্তব্য। কিন্তু মহাফেজখানার মালমশলা, দিনলিপি, ১৯১৭—১৯১৯ সালে রচিত তাঁর সাহিত্যকর্ম তথা তাঁর সমস্ত পরেকার ক্রিয়াকলাপ থেকে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কোনো অভিপ্রায়ই তাঁর ছিল না, বিপ্লবের পর তিনি তাঁর পরিকল্পনা, তাঁর কাজকর্মের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন সেই অলীক 'রাস্‌সেয়ার' সঙ্গে নয়, যা ঝিলমিল করত রাজনৈতিক দেশান্তরীদের রুগ্ন কল্পনায়, বাস্তব সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে। দ্বিতীয় কোনো রাশিয়ার অস্তিত্ব ছিল না রোয়েরিখের কাছে।

তবে একথা ভোলা অনুচিত যে রোয়েরিখের সামাজিক মতামত গড়ে উঠেছিল মার্কসবাদ চর্চা থেকে নয়। নবব্যবস্থায় তাঁর বিশ্বাস পুষ্ট হয়েছিল তাঁর ন্যায়-অন্যায় বোধ থেকে, ভারতীয় মানবিক ভাবনার অনেক বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্বিত হয়েছিল তাতে। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ, রোয়েরিখ প্রায়ই যাঁদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁরা উভয়েই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাঁদের সহমর্মিতা ঘোষণা করেছেন একাধিক বার। যেমন, সম্পত্তিবানদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের জয় হবে ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এই ধরনের কথা বলেছিলেন যে বৈশ্য শ্রেণী যেমন রাজমুকুট ও রাজদণ্ডের অবসান ঘটায়, তেমনি নিচুতলার নিপীড়িত শ্রেণীরা সামাজিক অন্যায় ও সম্পত্তিগত অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে শূদ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।

তবে প্রাচ্যের ভাববাদী মনীষীরা সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করলেও মনে করতেন মার্কসবাদ একপেশে রকমের 'অর্থনীতিসর্বস্ব', 'সমুন্নত আধ্যাত্মিকতার' ঘাটতি আছে তাতে। নিকোলাই রোয়েরিখও এই ভ্রান্তিটার পুনরাবৃত্তি করেছেন। 'মৃত পুঁজির তন্ত্র' উচ্ছেদ করে মানবজাতির ইতিহাসে নতুন যুগ সূচনার যে নির্বন্ধ রাশিয়ার ওপর বর্তেছে, তাতে বিশ্বাস করেও রোয়েরিখ মনে করতেন যে সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজন 'অধ্যাত্মীকরণ'। 'ঐক্য' প্রবন্ধের খসড়ায় আমরা পড়ি: 'ভাইয়েরা, জানি না ওখানে, পাহাড়ে আপনারা কী ভাবছেন। হয়ত আমার কথা অবান্তর। কিন্তু লোকে বলেছে তার দরকার আছে... প্রাণের কাছে আসতে হবে। প্রাণের আলো নেভানো অসম্ভব। অন্য পথ নেই। এভাবে দীর্ঘকাল চালিয়ে যাওয়া চলে না। শহর থেকে শহরে ছুটছি। শুনছি বাঁধানো তোরণে ঘর্ঘর। পাথুরে জমিতে ত্রস্তগতি পদপাত... সর্বদা মনে রাখব যে আমরা জানি অল্প। দিনে পদার্পণ করে, রাত শুরু করে আমরা মনে রাখব যে জানলাম নতুন কিছু...'

এই লিখনটাও শেষ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে। এইভাবে রাশিয়ায় যা ঘটছে তা নিয়ে রোয়েরিখের ভাবনা জড়িয়ে থেকেছে প্রাচ্য বিষয়ে

তাঁর চিন্তার সঙ্গে। এমনকি তাঁর 'অগ্নিশিখা'ও শেষ হয়েছে 'ভগবদ্‌গীতা'র উদ্ধৃতিতে: 'যাঁর দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত তাঁকে অবিনাশী জেনো। কেউ এই অব্যয়ের বিনাশ করতে পারে না... ইনি নিত্য, অক্ষয়, অনাদি... মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নব শরীর পান। অতএব যুদ্ধ করো।'*

'যুদ্ধের' এই ডাক ধ্বনিত হয়েছে শিল্পীর চিত্রকলাতেও। 'পবিত্র দ্বীপ', 'উত্তরী দ্বীপপুঞ্জ', 'এখনো যায় নি', 'পাহাড় আর শিলাতট', 'লাদোগা', 'উত্তর' প্রভৃতি ১৯১৭—১৯১৮ সালে আঁকা কারেলিয়ার নিসর্গ দৃশ্যে শ্বসিত ছবিগুলি ছাড়াও রোয়েরিখ 'বীর্য' প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবেন, সাতটি স্কেচ করেন তা নিয়ে: 'প্রোথিত ভাণ্ডার', 'ডাইনীর ঔষধি', 'আদেশ', 'পবিত্র আগুন', 'প্রতীক্ষায়', 'দৈত্যদের অবসান', 'ধনভাণ্ডার বিজয়ী'।

চিত্রাবলি রচিত হয়েছে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় অতিকথা অবলম্বনে, কিন্তু অতিকথা সেখানে শুধু অবলম্বন, তাদের মারফত শিল্পী ফুটিয়েছেন চলতি ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব।

প্রোথিত ভাণ্ডার হল জীবনের সুগুপ্ত সত্য। পিশাচিনী ডাকিনী তার সমস্ত পথ বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু বেজে ওঠে সংগ্রামের ডঙ্কা। পবিত্র আগুন (এই সময়কার কবিতায় 'পবিত্র চিহ্ন') দেখায় ভাণ্ডারের সন্ধানে যেতে হবে কোন দিকে। চিহ্নের অপেক্ষায় আছে লোকে। তার হদিশ পেয়ে লোকে এগিয়ে যায়, মুখোমুখি হয় দৈত্যদের। পরাস্ত হয়েছে দৈত্যরা, বিজয়োৎসব করছে ধনভাণ্ডারের বিজয়ীরা।

* রাজশেখর বসু কৃত 'মহাভারত'-এর সারানুবাদ অবলম্বনে। — অনুঃ

'প্রতীক্ষায়' স্কেচের ভিত্তিতে ১৯১৮ সালে রোয়েরিখ আঁকেন 'কারেলিয়া॥ চিরন্তন প্রতীক্ষা'। আত্মজীবনের সুর লেগেছে ছবিটিতে। নির্জন উপকূলে শিলা-নুড়ির মধ্যে চারটি মূর্তি — একজন নারী, তিনজন পুরুষ। দৃষ্টি তাদের দিগন্তে নিবদ্ধ। দীর্ঘ যাত্রার সময় এসে গেছে এই খবরের জন্য সবাই উৎকর্ণ।

তখনই লেখা 'সময়' কবিতাটির প্রসঙ্গও ক্যানভাসেরই অনুরূপ:

পবিত্র সংকেতের
খবর যদি রটে,
আমরাও রব উৎকর্ণ।
যদি তা বয়ে আনে কেউ
দাঁড়িয়ে উঠে আমরা প্রণাম জানাব।
তীক্ষ্ন চোখে আমরা চেয়ে থাকব,
পেতে থাকব সতর্ক কান।
শক্তি চাইব, আর যেই সময় হবে —
বেরিয়ে পড়ব।

১৯১৮ সালে দূর যাত্রায় বেরতে হলে শুধু ইচ্ছাটাই যথেষ্ট ছিল না। নতুন রাষ্ট্রীয় সীমান্তের দ্বারা স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাময়িকভাবে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক তখনো ছিল না। অক্টোবর বিপ্লবে ভীত পুঁজিবাদী দুনিয়া সামরিক হস্তক্ষেপ সমেত সর্বোপায়ে সাহায্য করছিল শ্বেতরক্ষীদের। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ছিল রণক্ষেত্রের ঘন বেষ্টনে আবদ্ধ, একটা ফ্রন্ট গিয়েছিল শিল্পীর গৃহের কয়েক ডজন কিলোমিটার দূর দিয়ে। ফিনল্যাণ্ডে হঠাৎ আটকা পড়ে গিয়েছিলেন রোয়েরিখ আর সেখানকার বুর্জোয়া সরকার সোভিয়েত-বিরোধী ক্রিয়াকাণ্ডে যোগ দিচ্ছিল সক্রিয়ভাবে।

পেত্রগ্রাদে ফিরতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অপেক্ষা করতে হয় ধৈর্য ধরে। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া থেকে ব্রিটেনের উপনিবেশে যাত্রার সম্ভাবনাটাই হয়ে দাঁড়াল সমস্যাসঙ্কুল। ব্রিটিশ রাজ ভারতের সঙ্গে পরিচয়ে রুশ বিজ্ঞানী ও পরিব্রাজকদের সর্বদাই অনুমতি দিত নেহাৎ অনিচ্ছাসহকারে; সুতরাং ভাবতে হয় যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে সেখানে যাওয়া বহুকাল সম্ভব হবে না।

কিন্তু প্রাচ্যের দেশভ্রমণে ক্ষান্ত দেওয়া রোয়েরিখের পক্ষে ছিল অসম্ভব। এতদিন ধরে তিনি যেসব পরিকল্পনা ছকেছেন তা পূরণ না করে তিনি পারেন না। বিজ্ঞান ও শিল্পের ইতিহাসে তাঁর নাম যে অতুলন স্থানের অধিকারী সেটা এই পরিকল্পনা রূপায়ণের সঙ্গেই জড়িত।

১৯১৮ সালে রোয়েরিখ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে দেশে ফেরার আগেই ভারতবর্ষে যাবেন। এমন উদ্যোগের প্রাথমিক অসুবিধাগুলি ছিল নিছক আনুষ্ঠানিক। বৈদেশিক নাগরিকত্ব নেবার কোনো বাসনাই রোয়েরিখের ছিল না। রাশিয়া থেকে দেশান্তরী হিশেবে প্রাপ্য তথাকথিত 'নানসেন পাসপোর্ট' তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ দেশের বাইরে সাময়িক বসবাস তদুপরি রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রান্তরে গমনাগমনে প্রয়োজন বাইরে যাবার পাসপোর্ট এবং ভিসা। এই দলিলপত্রের ব্যাপারটাই তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়ায় সর্বাধিক দুষ্কর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে যতরকমের প্রত্যয়পত্র আর অভিযানী পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে হয়েছে যাতে তাঁর গতিবিধি সংকুচিত থাকত একটা সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে।

১৯১৮ সালে টাকার ব্যাপারটাও বিশেষ ভালো ছিল না। চিঠি এল সুইডেন থেকে। ১৯১৪ সালের বলটিক প্রদর্শনীর পর রুশ শিল্পীদের ছবি তখনো ছিল সেখানে, রুশী শিল্প বিভাগের অবস্থাটা সম্পর্কে পরিষ্কার হয়ে নেবার জন্য প্রফেসর অসকার বিউর্ক রোয়েরিখকে নিমন্ত্রণ করলেন স্টকহোল্মে।

রোয়েরিখ সঙ্গে সঙ্গেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে স্টকহোল্মে প্রদর্শনীর জন্য কথা কয়ে নিলেন। ১৯১৪ সাল থেকে সুইডেনে তাঁর যে তিরিশখানা ক্যানভাস ছিল তার সঙ্গে তিনি যোগ দিলেন হালে কারেলিয়ায় আঁকা ছবি: 'প্রভাতের বার্তাবহ', 'সূর্যের ডাক', 'পরমানন্দ', 'রাতের নাইট', 'উত্তরী দ্বীপপুঞ্জ', 'এখনো যায় নি' প্রভৃতি। স্টকহোল্মে রোয়েরিখের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ১৯১৮ সালের ৮ নভেম্বর এবং বিপুল সাফল্য লাভ করে। তাঁর অনেক ছবি কিনে নেয় মিউজিয়ম ও ব্যক্তিগত সংগ্রাহকেরা। রোয়েরিখের নাম উঠল ইউরোপীয় সংবাদপত্রের পাতায়।

যুদ্ধের আগেই বিদেশে রোয়েরিখের জনপ্রিয়তা ছিল প্রচুর। এই জনপ্রিয়তা এবং তাঁর নতুন সাফল্যকে এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার নির্দিষ্ট মহলের অভাব ছিল না। যেমন, প্রদর্শনীতে এক ভদ্রলোক রোয়েরিখের কাছে এসে অস্পষ্টভাবে নিজের নাম বলে কয়েক মিনিট সময় চান নিভৃত আলাপের জন্য। কথা শুরু হল প্রশ্ন দিয়ে:

'আপনি ইংলণ্ডে যাচ্ছেন?'

'কোত্থেকে জানলেন?'

'অনেক কিছুই আমরা জানি, ইংলণ্ডে যাবার পরামর্শ আমরা আপনাকে দেব না। শিল্পের সেখানে কদর নেই, আর আপনার শিল্পকর্ম তো একেবারেই বুঝবে না।'

'কিন্তু কোথায় বুঝবে?'

'জার্মানিতে। কেবল জার্মানিতেই আপনার কাজ যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। সারা জার্মানিতে

আপনার প্রদর্শনী করার প্রস্তাব দিচ্ছি, গ্যারাণ্টি দিচ্ছি প্রচুর বিক্রির।'

'কী গ্যারাণ্টি?'

'এক্ষুনি চুক্তি করতে এবং অগ্রিম দিতে আমরা রাজী।'

স্মরণীয় যে এই আলাপ যখন হয় তখন অনেকখানি রুশী ভূমি অধিকার করে ছিল জার্মানি।

'দিনলিপির পাতা'য় এর সঙ্গে রোয়েরিখ একটি অর্থবহ টিপ্পনি যোগ করেছেন: 'অগ্রিমদাতা অপচ্ছায়া'। পেট-মোটা থলে, অস্পষ্ট নাম, হোমরাচোমরা খেতাব আর সন্দেহজনক ভাবনা নিয়ে এইসব অপচ্ছায়া রোয়েরিখের পিছু নিয়েছে একাধিকবার, চেষ্টা করেছে তাঁকে নিজেদের পক্ষে টানতে আর এইসব বিফল পীড়াপীড়ির পরিপ্রেক্ষিতে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে রোয়েরিখের সত্যকার অভিপ্রায়।

স্টকহোল্মে রোয়েরিখ সত্যিই ইংলণ্ডে যাবার আর্জি পেশ করেন, কেননা ভারতের জন্য ভিসা দিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দপ্তর। তাঁর কপাল ভালো। লণ্ডনে 'রাজা ইগর' অপেরা প্রযোজনায় তাঁকে যোগ দিতে বলেন স. দিয়াগিলেভ। প্রযোজনা নিয়ে আগেই কথা হয়েছিল ব্রিটিশ থিয়েটারের কর্মকর্তা বিচামের সঙ্গে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য রুশী নাট্যানুষ্ঠানেরও মঞ্চসজ্জার ভার রোয়েরিখকে দিতে রাজী হয়ে গেলেন। ইংলণ্ডের পথ খুলে গেল, পরিবার নিয়ে আসার জন্য রোয়েরিখ ছুটলেন সের্দোবলে।

মার্চের শেষে সপরিবারে ফিনল্যাণ্ড ছাড়লেন রোয়েরিখ। যাবার পথে তিনি থামেন কোপেনহেগেনে, এখানেও খুবই সাফল্যের সঙ্গে চলে তাঁর প্রদর্শনী। ১৯১৯ সালের শরতে তিনি যান লণ্ডনে, কিন্তু মন তাঁর পড়ে ছিল ভারতে।

১৯২০ সালে লণ্ডনে রোয়েরিখের সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয়, তখন তিনি 'প্রাচ্যের স্বপ্ন' প্যানেল-মালা নিয়ে খাটছেন। প্রখ্যাত ভারতীয় সাহিত্যিক ও মনীষীর সঙ্গে দেখা করার স্বপ্ন রোয়েরিখের বহু দিনের। 'গীতাঞ্জলি' তাঁর মনে অবিস্মরণীয় ছাপ ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি লিখেছেন:

'গীতাঞ্জলি একটা বিরাট আবিষ্কার... রূপের এক অনির্বচনীয় বনিয়াদ, অপরূপ আলোর ফুলকিতে থরোথরো করে ওঠে মালিন্যহীন প্রতিটি মানবিক হৃদয়, উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই রূপ, জনগণের প্রাণ নিয়ে এই বিশ্বজনীন সাড়া নিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। কে উনি? ভাবনার আর অপূর্ব চিত্রকল্পের এই বিরাট পুরুষ কোথায় এবং কীভাবে থাকেন? প্রাচ্যের বিজ্ঞতার প্রতি অনাদি কালের আসক্তি রূপ আর অন্তরস্পর্শী ঝঙ্কার পেয়েছে কবির বিস্ময়কর বাণীতে... স্বপ্ন ছিল রবীন্দ্রনাথকে দেখব আর কবি নিজেই এসে হাজির হলেন ১৯২০ সালে লণ্ডনে কুইন্‌স্‌গেট টেরাসে আমার স্টুডিওতে। রুশ ছবির কথা উনি শুনেছিলেন, দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল। আর ঠিক সেই সময়েই আমি আঁকছিলাম 'প্রাচ্যের স্বপ্ন' প্যানেলের ভারতীয় সিরিজ। এই মিল দেখে কবির বিস্ময়ের কথা মনে আছে। মনে আছে কী সুন্দরভাবে তিনি ভেতরে ঢুকলেন, তাঁর প্রাণের মূর্তি দুরু দুরু করে তুলল আমাদের বুক।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপে ভারত সফর বিষয়ে তাঁর বহু জিজ্ঞাসা রোয়েরিখ পরিষ্কার করে নেন। রোয়েরিখের সংকল্পে সায় দেন রবীন্দ্রনাথ এবং মনে হয় তাঁরই সহায়তায় ১৯২১ সাল থেকে রোয়েরিখকে নিয়ে লেখা বেরতে থাকে ভারতীয় সংবাদপত্রে, নিজেও তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

গিয়ে সংবাদপত্রে রোয়েরিখের শিল্পের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

প্রাচ্যের প্রতি রোয়েরিখের আগ্রহ যে ছিল অনির্বাণ, রোয়েরিখ তাঁর গবেষণা কাজের পরিকল্পনাকে যে রুশ প্রাচ্যবিদ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন নি, মহাফেজখানার বহু দলিল তার সাক্ষ্য। যেমন, নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে কী করা হয়েছে তার বিশদ ফর্দ করেছেন রোয়েরিখ:

'স. অলদেনবুর্গের সম্পাদনায় 'বৌদ্ধ শাস্ত্র' এই সাধারণ নামে যে বৌদ্ধ রচনামালা প্রকাশের কথা ছিল, এই সময়ের মধ্যে তার দুটি খণ্ড বেরিয়েছে। এই রচনামালা ছাড়াও অকাদেমি 'ভারতীয় দর্শনের স্মরণীয় রচনা' এই সাধারণ নামে ভারতীয় দার্শনিক রচনার একটি অনুবাদমালা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। ধর্মকীর্তির রচনার অনুবাদ নিয়ে ১৯২০ সালে বেরিয়েছে এই সিরিজের প্রথম খণ্ড। অনুবাদ ও ভূমিকা অকাদে. ফ. শ্যেরবাৎস্কির। প্রাচ্য নিয়ে গ্রন্থাদি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত ১৯২০ সালে প্রকাশিত 'তিব্বতের পুণ্য স্থানে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী' নামে প্রফেসর গ. সিবিকভের বহুপ্রতীক্ষিত তিব্বত বর্ণনা। খ্যাতনামা পরিব্রাজক প. কজলোভও তাঁর তিব্বতে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা নিয়ে একটি জনবোধ্য রচনা প্রকাশ করেছেন এবং বর্তমানে তাঁর সিচুয়ান অভিযাত্রার বিবরণ ছাপাবার কাজে নেমেছেন। বৌদ্ধ প্রদর্শনীতে যেসব বক্তৃতা পঠিত হয়েছে, যাতে এই বিশ্ব ধর্মকে দেখানো হয়েছে একেবারেই অন্য আলোয়, তা প্রথমে আলাদা আলাদা পুস্তিকাকারে এবং পরে একত্র সংকলনে একটি বিশেষ খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আছে: ১) বুদ্ধের জীবন, অকাদে. অলদেনবুর্গের বক্তৃতা; ২) বুদ্ধের দার্শনিক মতবাদ, অকাদে. শ্যেরবাৎস্কির বক্তৃতা; ৩) দূর প্রাচ্যে বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্ববীক্ষা, প্রফে. রোজেনবের্গের বক্তৃতা; ৪) তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধধর্ম, প্রফে. ভ্লাদিমিৎসভের বক্তৃতা...'

রোয়েরিখ পরিবার লণ্ডনে আসার পরই পুত্র ইউরি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিদ্যালয়ে ইন্দো-ইরানী বিভাগে ভর্তি হন। এখানে প্রফেসর রসের পরিচালনায় তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখতে শুরু করেন। পরে তিনি সংস্কৃত চর্চা চালিয়ে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রফেসর লানমানের কাছে। সেই সঙ্গে পালি ও চীনা ভাষাও শিখেতে শুরু করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে তিনি পাঠ নেন ইউরোপের বৃহত্তম প্রাচ্য বিদ্যা কেন্দ্রে, সরবনিতে প্রাচ্য ভাষা বিদ্যালয়ে। এখানে তিনি সংস্কৃত, তিব্বতী, মঙ্গোল, চীনা ও ইরানী ভাষার জ্ঞান সম্পূর্ণ করতে থাকেন। ১৯২৩ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পান ভারতীয় ভাষাবিদ্যার মাস্টার ডিগ্রি। প্রাচ্যবিদ্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভালোরকম প্রস্তুতির জন্য পিতা রোয়েরিখের আগ্রহ ছিল তাঁর অভিযাত্রা পরিকল্পনার একটা বড়ো দিক।

ভারত যাত্রার আয়োজন করলেও নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা থেকে বিরত হন নি। লণ্ডন থেকে তিনি লেওনিদ আন্দ্রেয়েভের বিধবা পত্নীকে লেখেন: 'খাটছি। প্রদর্শনীর তোড়জোড় করছি। এখানকার কাঠগুঁড়ির মধ্যে আবির্ভাশ্য থাকাও চলে, নিজের দর্শক আর টাকাও মেলে, কিন্তু রাশিয়া ছাড়া চলে কী করে? আমি যে রুশী শিল্পী, পথিক হয়ে পাড়ি দিতে পারি দুনিয়া; কিন্তু ঘরের বাতি তো জ্বলা চাই রাশিয়াতেই।'

প্রদর্শনী এবং মঞ্চে দিয়াগিলেভের সঙ্গে একত্র কাজে নিকোলাই রোয়েরিখের খ্যাতি ছড়ায় ইংলণ্ডে। তাঁর পরিচিত মহল ছিল বেশ ব্যাপক। ব্রিটিশ লেখক হার্বার্ট ওয়েলস আর জন

গল্‌সওয়ার্দি, সংস্কৃতি ও শিল্পের কর্মী এইচ. রাইট, পি. ব্রিয়াঙ্গ্‌ইন, এ. স্কট্‌স্‌, বি. বটমলেই প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই তাঁর ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই লণ্ডনেই রোয়েরিখের আলাপ হয় ভ্ল্যাদিমির আনাতোলিয়েভিচ শিবায়েভের সঙ্গে। শিগগিরই তিনি চলে যান রিগায় এবং তিরিশের দশকে ভারতে গিয়ে কয়েক বছর ছিলেন রোয়েরিখের সেক্রেটারি।

ব্রিটিশ অধ্যাত্মবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন ভ. শিবায়েভ, তাঁর মারফত আদিয়ারে চিরস্থায়ী অ্যানি বেসাণ্টের সঙ্গে পত্রালাপের ব্যবস্থা করেন রোয়েরিখ। ই. প. ব্লাভাত্‌স্কায়া এবং গ. স. অলকোট ১৮৭৫ সালে আধ্যাত্মিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন নিউ-ইয়র্কে। ১৮৭৯ সালে তার কেন্দ্র সরিয়ে আনা হয় ভারতে, মাদ্রাজের কাছে আদিয়ারে। আধ্যাত্মিক মতবাদ গড়ে ওঠে ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে তার কয়েকটি নিগূঢ়বাদী ধারার প্রভাবে, এবং কর্মযোগ মানবাত্মার জন্মান্তর এবং পরমাত্মার অভিব্যক্তি হিশেবে বিবর্তনকে তা মানত। সমিতির কার্যকলাপ বেশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমের অনেক দেশে এবং প্রাচ্যের দর্শনচিন্তা সম্পর্কে আগ্রহ জাগাতে তা সাহায্য করে। খোদ ভারতে ব্লাভাত্‌স্কায়া, অলকোট এবং ১৯০৭ সাল থেকে সমিতির সভাপতি, প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের পক্ষপাতী অ্যানি বেসাণ্টের প্রতি লোকে অনুরাগ পোষণ করত। সমিতির নেতৃবৃন্দ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সেই অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন যাতে ছিলেন বিবেকানন্দ, পরে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, আরো পরে জওহরলাল নেহরু ও রাধাকৃষ্ণণ। ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরোধী ই. প. ব্লাভাত্‌স্কায়া যখন ভারতে থাকতেন তখনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা জওহরলালের পিতা মতিলাল নেহরু আধ্যাত্মিক সমিতিতে যোগ দেন। অ্যানি বেসাণ্টও ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে ভারতের মুক্তি পরিকল্পনা সমর্থন করতেন, জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল বিপুল, ফলে তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল ব্রিটিশ রাজ।

অবিশ্যি ভারতের রাজনৈতিক জীবনে আধ্যাত্মিক সমিতির গুরুত্ব বাড়িয়ে দেখলে ভুল হবে। যেমন, জওহরলাল নেহরু তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ফ. ট. ব্রুক্স প্রসঙ্গে লিখেছেন: '...তাঁর এবং অধ্যাত্মবাদের কাছে আমি নিজেকে ঋণী বোধ করি। তবে তার পর থেকে অধ্যাত্মবাদ আমার চোখে খাটো হয়ে গেছে বলে আমার আশঙ্কা, দেখা গেল এঁরা মোটেই বরপুত্র নন, একেবারেই সাধারণ লোক, যাঁরা বিপদের চেয়ে নিরাপত্তা, শহীদের ভাগ্য বরণের চেয়ে মোটা টাকার চাকুরি পছন্দ করেন বেশি। কিন্তু শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট সম্পর্কে আমি সর্বদাই গভীর উচ্ছ্বাস বোধ করেছি।'

বোঝাই যায় যে বিশ শতকের গোড়ায় ভারতের প্রগতিশীলেরা আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের রীতিমতো পোষকতা লাভ করেছিলেন এবং সেখানকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মহলে জনপ্রিয় অ্যানি বেসাণ্টের সঙ্গে ভালোরকম পরিচিত হওয়া উচিত বলে যে নিকোলাই রোয়েরিখ গণ্য করবেন তা খুবই স্বাভাবিক।

ভারত এবং সেখানকার শাসকবিরোধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে রোয়েরিখের আগ্রহে যাঁরা ব্রিটিশ উপনিবেশের দেখাশোনার জন্য ভারপ্রাপ্ত, তেনারা তাঁর সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ওঠেন। পিটার্সবুর্গে থাকাকালে আগাভান দরজিয়েভ, যাঁর ব্রিটিশবিরোধী দৌত্য কারো কাছে অজানা নয় তাঁর সঙ্গে রোয়েরিখের দেখাসাক্ষাতের খবরও এনাদের জানা বলেই মনে হয়। অন্তত অচিরেই

রোয়েরিখের এই বিশ্বাস জন্মাল যে তাঁর শিল্প নিয়ে ইংরেজদের উচ্ছ্বাস মোটেই ব্রিটিশ উপনিবেশে একটা বৈজ্ঞানিক শিল্পীয় অভিযাত্রায় যাবার জন্য তাঁর অভিপ্রায়কে আমল দেয় না। তাড়াতাড়ি ভারতে পৌঁছবার জন্য ১৯২০ সালের শেষেই জাহাজে বোম্বাই যাবার টিকিট পর্যন্ত কিনেছিলেন রোয়েরিখ, কিন্তু সে টিকিট কাজে লাগল না, অভিযাত্রা চালাবার অনুমতি পেলেন না তিনি, যাত্রা ভঙ্গ হল।

রোয়েরিখের রেখে যাওয়া দলিলপত্রে এমন কোনো হদিস নেই যে ফিনল্যান্ড ছাড়ার সময় তিনি আমেরিকা যাবার কথা ভেবেছিলেন। তবে লন্ডনে এভাবে আটকে থাকতে হবে তাও তাঁর কল্পনায় ছিল না, তাই শিকাগো শিল্প ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ আর. হার্শে যখন আমেরিকায় তাঁর প্রদর্শনী করার জন্য প্রস্তাব দিলেন, তখন সেটা তাঁর কাছে ঠেকেছিল গ্রহণযোগ্য। ভারত যাত্রার ছাড়পত্র তখনো জয় করা যায় নি, আর মনে হয় এই খিটকেলী ব্যাপারে আমেরিকায় সহযোগী পাবার আশা করেছিলেন শিল্পী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোয়েরিখের ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে, নিউ-ইয়র্কের কিঙ্গর গ্যালারিতে। প্রদর্শনীর আগেই একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল শিল্পী সম্পর্কে। প্রদর্শনীর সাফল্য হয় চমকপ্রদ।

নিউ-ইয়র্কে দেখানো ১৭৫টি কাজের মধ্যে ছিল 'সন্ধ্যা' (১৯০৭), 'দেবদূতদের ধনভাণ্ডার' (১৯০৭), 'ভ্যারাঙ্গিয়ান সাগর' (১৯০৯), 'শেষ দেবদূত' (১৯১২), 'পরমানন্দ' (১৯১৭), 'ভাইকিঙ কন্যা' (১৯১৭), 'সূর্যের ডাক' (১৯১৮), 'এখনো যায় নি' (১৯১৮), 'মাটির মেয়ে' (১৯১৯), 'বীর্য' এবং 'প্রাচ্যের স্বপ্ন' সিরিজ থেকে স্কেচ, 'রাজকন্যা মালেন' এবং 'তুষারিকা'র মঞ্চসজ্জার ডিজাইন ইত্যাদি। প্রসঙ্গের দিক থেকে এসব ছবি আমেরিকানদের কাছে ছিল একদিকে অপরিচিত অন্যদিকে মানবিক আদর্শ ও অঙ্কনের সিদ্ধতায় একান্ত প্রত্যয়জনক। নিউ-ইয়র্কের পরে শিকাগো, বস্টোন, বুফালো, ফিলাডেলফিয়া, সান-ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি আরো ২৮টি মার্কিন শহরে যায় প্রদর্শনী।

এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রদর্শনী চলার তিন বছরে তাতে যুক্ত হয় আমেরিকায় আঁকা ছবি। গ্রীষ্মের সময়টা রোয়েরিখ ঘুরতেন আরিজোনায়, নিউ মেক্সিকোয়, কালিফোর্নিয়ায়, গিয়েছিলেন মনহেগান দ্বীপে, আঁকেন 'নিউ মেক্সিকো' আর 'মহাসাগরের পালা' সিরিজ। এসব ছবিতে রুশী শিল্পীর অন্যতর চোখে দেখা স্বদেশের নিসর্গদৃশ্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল মার্কিন দর্শকেরা।

একই সময়ে রোয়েরিখ আঁকেন পশ্চিমের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত 'সান্ক্তা' (আক্ষরিক অর্থে সাধু, রোয়েরিখের নিজের পছন্দ ছিল 'পরিত্রাতা মুনি' কথাটা) সিরিজ। তাতে ছিল 'আমরাও ফটক খুলব', 'আমরাও শিকার চালিয়ে যাব', 'আমরাও খাটব', 'আমরাও ভয় পাই না,' 'আমরাও দেখছি', 'নিজেই বেরিয়ে এসেছি', 'সন্ত সির্গেয়' ।

এইসব ক্যানভাসে রোয়েরিখ তুলে ধরেছেন তাঁর অন্তরতম স্বদেশীয় নিসর্গ আর তার প্রাচীন রুশ স্থাপত্য। এর প্রেক্ষাপটে রুশী সন্ন্যাসীদের কীর্তিকাহিনী। তাদের সহজিয়া কর্মকাণ্ড আর আত্মিক শুচিতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এমন আকর্ষণীয় করে, এমন আন্তরিকতায় যে এত বছর পরেও তা আলোড়িত করে দর্শককে। তখন কিন্তু মার্কিনীদের কাছে এটা ছিল এক মহা আবিষ্কার। স্বদেশের জন্য তাঁর মন-কেমন-করাটাকে রোয়েরিখ রূপ দিয়েছেন অনবন্দনায়, অস্তিত্বের সুষমায়, যা

অর্জিত হয় প্রকৃতির সঙ্গে অন্বয়ে, শান্তিপূর্ণ শ্রম ও মানবিকতায়।

যেসব শহরে প্রদর্শনী হত সেখানে নিকোলাই রোয়েরিখ সাধারণত শিল্প এবং নৈতিক ও নান্দনিক লালন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। ছাত্রমহলে এগুলির খুবই কদর হয়েছিল। শ্রোতাদের তিনি রুশী সংস্কৃতির কথা বলতেন, পারস্পরিক উপলব্ধি এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ডাক দিতেন তিনি।

ভবিষ্যতে নিউ-ইয়র্কে ন. ক. রোয়েরিখ মিউজিয়মের সহসভাপতি, এবং রোয়েরিখের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জ. গ. ফস্‌দিক তাঁর প্রদর্শনীর উদ্বোধনে রোয়েরিখের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই বিবরণ দিয়েছেন: '...ভেবেছিলাম, এইসব হাজার হাজার লোকের দিকে চেয়ে, তক্ষুনি যাদের ভুলে যাবেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিল্পী কী ক্লান্ত আর উদাসীনই না হবেন, কিন্তু আমি দেখলাম তাঁর ঝলকিত নীল চোখ, তা থেকে কেমন একটা বিশেষ রকমের কল্যাণ আর মহিমা বিচ্ছুরিত। লোকের অন্তরের গভীরে দৃষ্টি মেলে তিনি যেন তার সত্যকার মর্ম নির্ধারণে সচেষ্ট।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রোয়েরিখ তাঁর সামাজিক-জ্ঞানপ্রচারণী ক্রিয়াকলাপে চালিয়ে যান। মার্কিন শ্রোতাদের সামনে প্রথম দিককার একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন:

'সেরা লোকেরা জানেন যে রূপ ও প্রজ্ঞার পথ নিয়ে বারম্বার পুনরুক্তি না করে সত্যসত্যই তা নিজেদের সামাজিক জীবনে সঞ্চারিত করা উচিত। তাঁরা জানেন যে একটা সাহেবী পোশাকেই সংস্কৃতিমান মানুষের পরিচয় মেলে না। তাঁরা জানেন যে আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতা আর প্রাণের আসন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মরণপণ সংগ্রামের এই কালে সুন্দর ও জ্ঞানের পথ সবিশেষ সুকঠিন, তামস গতানুগতিকতার হামলা সবিশেষ দুর্বিষহ... সপ্তাহান্তে অনেক লোকই ভাববে হিসেব মতো কত টাকা তাদের দিতে হবে। কিন্তু কিছু লোকে অন্তত একবার স্মরণ করুক সাতদিনের মধ্যে সুন্দর ও জ্ঞানের জন্য কী তারা দিয়েছে।'

বিভিন্ন জাতিকে যা নিকট করবে তেমন শিল্পের জন্য তিনি ছিলেন সংগ্রামী। সম্মিলিত শিল্পের ইনস্টিটিউট গঠনে তিনি চালিত হয়েছিলেন এই ভাবনায়। ইনস্টিটিউটের কাজ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন: 'মানবজাতিকে মিলিত করে শিল্প। শিল্প এক এবং অখণ্ড। শিল্পের শাখাপল্লব থাকবে অনেক, কিন্তু মূলটা একই। সুন্দরের সত্য অনুভব করে সবাই। পবিত্র উৎসের তোরণ উন্মুক্ত থাকা চাই সবার জন্যই। শিল্পের আলো নতুন অনুরাগে উদ্ভাসিত করে অসংখ্য অন্তর। প্রথমটা এ অনুভূতি হয় অচেতন কিন্তু পরে তা সমগ্র মানবিক চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে তোলে। কত-না নবীন হৃদয় অপরূপ ও সত্যের সন্ধানী। সেটা ওদের দিন। শিল্প দিন জনগণকে, সেখানেই তার স্থান।'

সম্মিলিত শিল্পের ইনস্টিটিউটে গড়া হয় ললিত কলা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, স্থাপত্য, মঞ্চাভিনয়, সাহিত্য বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের শাখা নিয়ে বক্তৃতা কেন্দ্র। আমেরিকার সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের প্রায় একশ জন প্রমুখ কর্মী রোয়েরিখের ডাকে সাড়া দেন এবং পরিকল্পিত কর্মসূচি অনুসারে যুবকদের নিয়ে কাজ করতে রাজী হন।

এর জন্য কী সম্বল ছিল নিকোলাই রোয়েরিখের? প্রায় কিছুই না। প্রথমে ঠিক হয়েছিল বিভাগীয় অনুশীলনের জন্য নিউ-ইয়র্কের 'শিল্পী হোটেলে' ঘর ভাড়া নেওয়া হবে। নবীন সঙ্গীতবেত্তা ম. লিখ্‌টমানের সঙ্গে রোয়েরিখ একদিন রওনা দিলেন এই ব্যাপারে

একটা চুক্তি করে নিতে। আর মেট্রোপলিটনের প্রবেশমুখেই পরিচিত এক শিল্পীর সঙ্গে দেখা। তিনি প্রস্তাব দিলেন গ্রীক চার্চের ভবনে অবস্থিত তাঁর প্রাক্তন স্টুডিওটি ভাড়া নিতে। সঙ্গে সঙ্গেই যাওয়া হল সেখানকার ডীনের কাছে, আগেকার ভাড়াটের পক্ষে জায়গাটার টাকা জোটানো সম্ভব হচ্ছিল না, সেটি ভাড়া নেওয়া হল। এই করেই শুরু হয় সম্মিলিত শিল্পের ইনস্টিটিউটের কাজ। রোয়েরিখকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় গোটা ইনস্টিটিউটকে তিনি একটা কামরায় ঠাঁই দেবেন বলে ভাবছেন নাকি, তিনি জবাব দেন:

'প্রত্যেকটা গাছকেই বাড়া উচিত। প্রতিটি কর্মের ব্যাপারেও তাই। যদি সেটা প্রাণবান হয় তাহলে বেড়ে উঠবে। যদি মরাই তার নির্বন্ধ তাহলে একটা কামরাই যথেষ্টেরও বেশি।'

আর গাছটা বেড়েই উঠল। পাঠসূচির চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য, গুণী শিক্ষক, অল্পবিত্তদের জন্য ভর্তির সুবিধা — এসবের ফলে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ইনস্টিটিউট।

নিউ-ইয়র্কে অবস্থিত এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই একই কালে শিকাগোতে প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পী সঙ্ঘ 'Cor Ardens' ('দীপ্ত হৃদয়') এবং ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে দেখা দিল আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্র 'Corona Mundi' ('বিশ্বের মুকুট'), যার কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন। তিরিশের দশকের গোড়ায় স্থাপিত হল সংস্কৃতির বিশ্ব লীগ।

লীগের কর্মসূচিতে ছিল শান্তির প্রচার এবং মূল্যবস্তুর সংরক্ষণ নিয়ে কাজ, সেই সঙ্গে অগ্রণী গবেষণার সমর্থন, মাতৃমঙ্গল ও শিশু পালন সমস্যার অধ্যয়ন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের বিনিময়। বলা প্রয়োজন যে এইসব সংগঠনে রোয়েরিখ যে অংশ নিয়েছিলেন সেটা সংস্কৃতির কল্যাণ প্রচারে তাঁর আন্তরিক ও অদম্য প্রয়াসের তাগিদেই। হাত গুটিয়ে থাকা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। সাফল্যের সামান্য একটু সুযোগ পেলেই রোয়েরিখ তা কাজে লাগাতে ভুলতেন না। সংস্কৃতি লীগ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন:

'লীগের কথায় ব্যক্ত হয়েছে সমাজবোধ, ঐক্য। বিশ্বজনীনতা কথাটার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, কেননা সত্য এক, সুন্দর এক, জ্ঞান এক, এ ব্যাপারে কোনো কথা-কাটাকাটি হতেই পারে না। তেমনি সংস্কৃতির কথাতেও কোনো সুশিক্ষিত মস্তিষ্ক তর্ক তুলবে না, কেননা আলোকের সেবা, সূক্ষ্ম সমুন্নত অন্তর — এটা সর্বমানবিক।'

রোয়েরিখ যেসব আমেরিকান সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন তার অধিকাংশই বেশ সাফল্যের সঙ্গে বিকাশ পেতে থাকে। স্বয়ং রোয়েরিখের পক্ষে কার্যত তা সব পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। অসংখ্য প্রতিষ্ঠান চালান স্থানীয় কর্মীরাই, আর রোয়েরিখ ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর সদস্য বা সম্মানীয় সভাপতি হিশেবে শুধু চেষ্টা করতেন তাঁর উদ্যোগে যারা সাড়া দিয়েছে তাদের উৎসাহ জীইয়ে রাখতে।

আমেরিকার সাংস্কৃতিক জীবন, তার শিল্প, বিশেষ করে আমাদের দেশে সুবিদিত রকওয়েল কেন্টের সৃষ্টিকর্মে বিপুল ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিলেন রোয়েরিখ। আমেরিকানরা নিজেরাই তা বলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোয়েরিখের নাম বিস্মরণে লীন হয় নি, যে সাংস্কৃতিক কাজের সূত্রপাত তিনি করেছিলেন তা আজো চলেছে অর্ধশতক ধরে।

আমেরিকায় সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ভারাক্রান্ত জীবনেও রোয়েরিখ শুধু ছবি আঁকার নয়, থিয়েটারের কাজ, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, প্রবন্ধ রচনার সময়ও করে নিতে পেরেছিলেন। ১৯২২

সালে শিকাগোয় 'তুষারিকা' অপেরা চলে তাঁর মঞ্চসজ্জায়। অনুষ্ঠানটি এতই সাফল্য লাভ করে যে রোয়েরিখের স্কেচ অবলম্বনে পোশাকের যেসব কাট ও অলংকরণ করা হয়েছিল, ডিজাইনাররা তা চলতি মরশুমের ফ্যাশনে কাজে লাগান।

১৯৩০ সালে নিউ-ইয়র্কে রোয়েরিখের মঞ্চসজ্জায় অনুষ্ঠিত হয় স্ত্রাভিন্স্কির 'পবিত্র বসন্ত' ব্যালের নতুন উপস্থাপনা। এ বারে নৃত্যের পরিকল্পনায় ছিলেন ব্যালেমাস্টার ল. মিয়াসিন, সঙ্গীত পরিচালনায় ল. স্তকোভ্স্কি।

প্রত্নবিদ হিশেবে আমেরিকায় রোয়েরিখের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল সেখানকার আদিবাসীদের প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন অনুধাবনে। ১৯২১ সালের গ্রীষ্মে তিনি আরিজোনায় আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার পরিচয় নেন এবং সান্তা-ফে'তে গুহাগৃহ নিয়ে অনুসন্ধান করেন। এসব বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ বেরয় বিশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকাশনে।

প্রকাশ্য ভাষণ ও মুদ্রিত রচনাদির ফলে প্রগতিশীল মনস্বী ও মানববাদী হিশেবে খ্যাতি লাভ করেন রোয়েরিখ। আমেরিকায় নতুন পুরুষদের ওপর মানববিরোধী পুঁজিবাদী সমাজের কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নটা তীব্র হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। মার্কিন যুবজনের উদ্দেশে তিনি লেখেন:

'অগোচর বন্ধুজন, জানি তোমাদের। জানি, জীবনের সমস্ত পরিস্থিতি জয় করে বাতিটি নিবতে না দেওয়া কী অমানুষিক কঠিন। জানি, মুদ্রার তামস বিবেচনায় যারা নিজেদের জীবন গড়ে তুলেছে তাদের ঘৃণা গায়ে মেখে এগুনো তোমাদের পক্ষে কী পীড়াদায়ক... রে মাণবক, তোকে আমি চিনি। পথে এত অবান্তর জিনিস তুই গছিয়েছিস আমাদের। সমস্ত তরুণ আর 'অনভিজ্ঞদের' বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিয়েছিস তুই। প্রাণ আর মর্মার্থের বদলে তুই এনেছিস বাহ্যিক রূপ। ছবির ফ্রেমকে তুই বেঁধেছিস সোনায়। তুই ঢুকেছিস পর্ষদে আর লীগে, পূর্ণতার প্রয়াসকে তুই চাপা দিয়েছিস সমাধিখনকের বৃত্তিতে।'

প্রাচ্যের নৈতিক শিক্ষামালা আর রাশিয়ার সাম্প্রতিক সামাজিক পুনর্গঠনের সংশ্লেষ যে আবশ্যক, এই চিন্তাটা রোয়েরিখকে পেয়ে বসেছিল।

তাঁর এমন কোনো বক্তৃতা বা প্রবন্ধ নেই যাতে রাশিয়ার উল্লেখ কিংবা প্রাচ্য মনীষীদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি না আছে। তিনি যেন প্রতীচ্যে তাঁদের বাণী বহনের ব্রত নিয়েছিলেন। এদিক থেকে ১৯২১ সালের এপ্রিলে লেখা 'অরণ্যগামী ব্যাধ' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। তার আগে ছিল: 'দিল কি রাশিয়ার রোয়েরিখ — নিন। দিল কি তিব্বতের আল্লাল মিঙ্গ শ্রী ঈশ্বর — নিন।' (শ্রী ঈশ্বর তিব্বতের সাধু)। পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি অনুসরণে তিনি সম্বোধন করেছেন নিজেকে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পথচিহ্ন এঁকেছেন:

...পশ্চাদ্ধাবিত থেকে
তুমি হয়ে ওঠো আক্রমক।
দৃপ্ত, যারা আক্রমণে নামে,
দীন, যারা কৈফিয়ত দেয়।
আত্মরক্ষা করুক অন্যেরা। তুমি
দাও হানা,
কেননা জানো তো তুমি
কেন বেরিয়েছ। কেন
এ অরণ্যে নও তুমি ভীত...
খাদ তুমি পেরবে কেবল
টিলার ওপরে উঠবে বলে।
খাদের যে ফুল, সে তো
নয়কো তোমার। নাবালের ক্ষীণস্রোত
সেও নয়। পাবে তুমি ঝলকিত
জলপ্রপাত, তাজা ঝর্ণার উচ্ছ্বাস।

ফুটে উঠবে সৌভাগ্যের পারিজাত ফুল।
কিন্তু সে যে ফোটে
শুধু উচ্চে।
পাহাড়ের পাদদেশে হবে না খোঁয়াড়।
তোমার মৃগয়া
শুধু উচ্চে। তুমি ও **শিকার**
চেয়ো নাকো ঢালুতে নামতে...

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকলেও নিকোলাই রোয়েরিখ মুহূর্তের জন্যও ভারত যাত্রার প্রস্তুতি থামান নি। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনাদি মারফত আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশের যেসব বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল, ব্রিটিশ উপনিবেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভিযাত্রা চালাবার অনুমতি লাভের জন্য তাদের সমর্থন সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন তিনি।

খোদ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগও বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমটা তা চলে ভ. শিবায়েভের মাধ্যমে। ১৯২১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের পত্রে রোয়েরিখ জানান যে এক বছর পরে আদিয়ারে যাবার জন্য ভাদির (আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের একজন পরিচালক) আমন্ত্রণের সুযোগ নিতে তিনি প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, আদিয়ারে অভ্যাগতদের জীবনযাত্রার পরিস্থিতি কেমন সেটা জানার জন্যও তিনি অনুরোধ করেন শিবায়েভকে।

তবে কিছু কাল পরে রোয়েরিখের চিঠিপত্রে আশাভঙ্গের ছায়া দেখা যায়। আধ্যাত্মিক সমিতির ক্রিয়াকলাপে তিনি তুষ্ট হতে পারেন নি। তার পরিচালকদের মধ্যে দলাদলি এবং 'মন্ত্রগুপ্তির' অশিক্ষিত সাহিত্য যাতে প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তা হেয় হত তাতে বিরক্ত বোধ করতেন শিল্পী।

১৯২২ সালের এপ্রিলে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের একজন বিরোধী মনোভাবাপন্ন নেতা ভারতীয় দার্শনিক ও লেখক ডি. কৃষ্ণমূর্তি (পরে তিনি এ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন) রোয়েরিখকে আমন্ত্রণ করেন ভারতবর্ষে। কিন্তু ততদিনে এশিয়ায় তাঁর ভবিষ্যত ক্রিয়াকলাপকে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে আর জড়াবেন না বলে শিল্পী স্থির করে ফেলেছিলেন। খুবই মনে হয় যে কিছু কিছু অধ্যাত্মবাদীকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল রোয়েরিখের সোভিয়েত প্রীতি। সর্বাগ্রে এটা প্রযোজ্য রুশী আধ্যাত্মিক সমিতির নেত্রী আ. কামেন্‌স্কায়ার ক্ষেত্রে, অক্টোবর বিপ্লবের পর ইনি দেশ ত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডে চলে যান, আদিয়ারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন তিনি।

অন্তত ১৯২২ সালের অগস্টে রোয়েরিখ শিবায়েভকে লিখেছেন:... 'কামেন্‌স্কায়া সম্পর্কে আপনার যদি মোহভঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে আমারও তাই ঘটেছে বেসান্ট সম্পর্কে। দুঃখের কথা, কিন্তু ব্যাপারটা তাই।' এই চিঠিতেই শিল্পী জানান যে এগারো মাস পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার জন্য চূড়ান্তরূপে তৈরি হয়ে যাবেন।

যা অনুমান করেছিলেন তার একমাস আগেই রোয়েরিখ নিউ-ইয়র্ক ছাড়েন। ও দেশটায় তিনি ছিলেন ১৯২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২৩ সালের ৮ মে।

এর পরে তিন বার ১৯২৪, ১৯২৯, ১৯৩৪ সালে তিনি কর্মব্যপদেশে আমেরিকায় আসেন তবে খুবই অল্প সময়ের জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের পরই ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর তাঁর সুহৃদ ও অনুরাগীরা নিউ-ইয়র্কে রোয়েরিখ মিউজিয়ম খোলেন, শিল্পী তাতে দেন তাঁর তিন শতাধিক ছবি।

রোয়েরিখের নামের সঙ্গে জড়িত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত চলত সমবায়ের ভিত্তিতে। নিউ-ইয়র্কের মিউজিয়মটিও

শেয়ারভিত্তিক সমিতির মধ্যে পড়ে। বাড়তি টাকাকড়ি রোয়েরিখের ছিল না, তাঁর চাঁদা ছিল ছবি, নিয়মিতভাবে তার সংগ্রহ তিনি বাড়িয়ে তুলতেন। এর জন্য শিল্পী ও তাঁর স্ত্রী একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ারের অধিকারী হন। প্রতিষ্ঠাতা রূপে নিকোলাই রোয়েরিখ ও ইয়েলেনা ইভানোভনা পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকায় সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই পরিচালকমণ্ডলীর অন্য কোনো সদস্যকে তাঁরা অধিকার দিয়ে যান। মিউজিয়ম বা অন্যান্য মার্কিন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে রোয়েরিখ কোনো অর্থ পেতেন না, প্রতিষ্ঠানগুলিও সাধারণ সদস্য চাঁদা ও দান করা ছবি ছাড়া তাঁর কাছ থেকে আর কিছু পায় নি। মিউজিয়মের শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন কিছু কারবারীও ছিল। তাদের ধূর্ততা ও অসাধুতার কথা রোয়েরিখ জানতে পান পরে।

আমেরিকায় রোয়েরিখের জীবনকাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে যদি না বলা হয় মার্কিন ক্রোড়পতিদের কথা, যাঁরা নাকি শিল্পী চাইলেই মোটা টাকার চেক কেটে দিতেন। ব্যর্থকাম ঈর্ষাতুর দেশান্তরীদের মধ্যে এই ধরনের যে গুজব ছড়ায়, পশ্চিমের রটনালোলুপ সংবাদপত্র তা লুফে নিয়ে খবর দেয় যে কাউকে মনে ধরলে রোয়েরিখ তাকে মহামূল্য পাথর দান করে থাকেন। স্রেফ পকেট হাতড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে বড়োসড়ো একটি রত্ন দিয়ে দেন তাকে।

রোয়েরিখকে নিয়ে যতরকম আষাঢ়ে গল্প গজিয়েছে তার ভেতর তাঁর অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্যের কাহিনীটাই শিল্পীকে বিব্রত করেছে বেশি। তাঁর কাছে প্রার্থীর আর সীমাসংখ্যা ছিল না। কিছু দিন ওই স্কুলটার জন্য, প্রকাশ ভবনের জন্য, শিশু রঙ্গালয়ের জন্য, কেউ শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারছে না, কারো চাই কিছু স্থাবর সম্পত্তি, কেউ-বা স্রেফ নিঃসম্বল। রোয়েরিখ তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন: 'মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের অন্তহীন তালিকা। দরিদ্রদের ফেরাতে হলে মনে ব্যথা লাগত, কিন্তু অন্তহীন এই অশ্রুস্রোতে আর অতি মহনীয় সব উদ্দেশ্যে আমাদের কোপেকগুলো আর কতটুকু। যখন পেরেছি দিয়েছি, কিন্তু সে তো প্রয়োজনের সিন্ধুতে বারিবিন্দু। অথচ কেউ যেন আমাদের ঐশ্বর্যের এক কিংবদন্তি বানিয়ে দিয়েছে। যদি বলি: 'ধনসম্পদ নেই, তার জন্য লালায়িতও ছিলাম না কখনো', কেউ বিশ্বাস করবে না, কেননা অতিকথায় যে বিশ্বাস সেটা সবচেয়ে দুর্মর বিশ্বাস। লোকে বিশ্বাস করে বাস্তবে নয়, যেটা বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছে হচ্ছে তাতে। ঐশ্বর্যের গালগল্প সবচেয়ে কট্টর।'

ছবির বিক্রি এবং থিয়েটারের জন্য কাজ আর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশের দক্ষিণায় রোয়েরিখ এবং তাঁর পরিবারকে দারিদ্র্যে থাকতে হয় নি। কিন্তু ঘন ঘন আসা-যাওয়া, অভিযাত্রা, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক কাজের জন্য যে খরচ হত তাতে প্রায়ই দেখা দিত গুরুতর অর্থসংকট, আর আমেরিকার পুঁজিপতিদের ওপর রোয়েরিখের ভরসা ছিল সবচেয়ে কম। তাদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

'বিপুল পরিশ্রমে কেউ গড়েছে রূপের দেবমেলা, বিচারের ল্যাবরেটরিতে টেস্ট টিউবে টিউবে আবিষ্কার রাখার জন্য খেটেছে কেউ। তারপর এল আপনার মোটরগাড়ি, অভিজ্ঞ পাচক আপনার জন্য নিয়ে এল রূপের সুচারু ভোজ্য।

'কিন্তু আপনার পাকস্থলী কি এ খাদ্য পরিপাক করতে পারবে? তাছাড়া ভোজনালয়ে প্রবেশের অধিকার আছে কি আপনার? শিল্প ও জ্ঞানের সান্নিধ্যে যাবার মতো কখনো কিছু করেছেন

কি? আদৌ কি পারেন সেটা? যে দেয় কেবল সেই পায় একথা শোনেন নি? মন্দিরে প্রবেশের অধিকার যদি আপনার না থাকে, নিজের পরিশ্রমে যদি সে অধিকার আপনি অর্জন না করে থাকেন, যদি শুধু পেতেই চান, তাহলে পরগাছা কথাটা কি আপনার জন্যই নয়? কেননা মন্দিরে আপনি আসছেন কোনো নৈবেদ্য না নিয়ে। পৃথিবীর মুখাবয়বকে আপনি বলিচিহ্নিত করছেন, নির্লজ্জের মতো আপনি ভিড় করছেন অপরের অর্জনের সোপানে, বেমালুম ধরে নিয়েছেন যে সমস্ত শ্রম ও সৃষ্টি আপনার জন্য। কখনো সখনো সঙ্গীত শুনেছেন আপনি; চোখ বুলিয়েছেন ছবিতে; হাততালি দিয়েছেন ভাস্কর্য দেখে আর হাই তুলতে তুলতে একঘণ্টা সময় ব্যয় করেছেন প্রখ্যাত বক্তার ভাষণ শোনার জন্য। তারপর মোটরগাড়ি যখন আপনার মহামূল্য বপুটিকে গৃহে পৌঁছে দিল, তখন কী দাঁড়াল এত সব অভিজ্ঞতার পরিণাম? বিতৃষ্ণা, জৃম্ভণ, ভোজন আর পরনিন্দা।

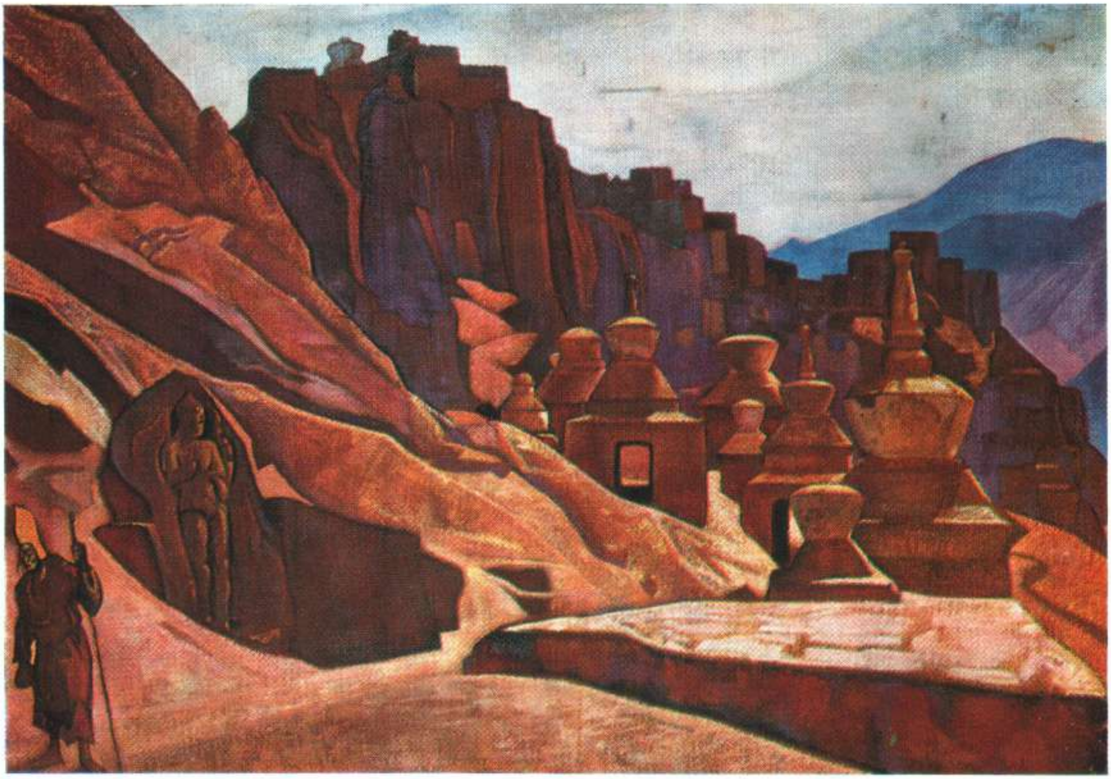
'তাই সুযোগ-ও সম্পত্তিবান কেউ যখন শিল্প ও জ্ঞানের কথা তুলবে, সর্বদাই তাকে জিজ্ঞেস করবেন: 'সুন্দরের জন্য আপনি নিজে কী করেছেন যে একথা বলার অধিকার নিচ্ছেন?"

পুঁজিপতিদের ঠিক এইভাবে চিত্রিত করার যথেষ্ট কারণ ছিল নিকোলাই রোয়েরিখের। কাগুজে কিছু কলম-পিষিয়ের মতে যে ক্রোড়পতিরা নাকি শিল্পীর পথকে ব্যাঙ্কনোটে কুসুমাস্তীর্ণ করে দিচ্ছেন, তাদের চেয়ে দৈবে ভরসা শ্রেয় বলে তিনি জানতেন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতায়। তাঁর দিনলিপিতে আছে: 'সান-ফ্রান্সিস্কোতে একবার টাকার দরকার হয়। খুবই দরকার, কিন্তু কোথাও থেকে পাওয়ার জো নেই। প্রয়োজনটার কথা কাউকে বলাও যায় না। নিরুপায় অবস্থা... কিন্তু পরের দিন সাত সকালে ফোন... 'এক্ষুনি প্রদর্শনীতে চলে আসুন।' ছুটলাম তাড়াতাড়ি। প্রদর্শনী কক্ষে দেখি মিষ্টি একটি মেয়ে চেক হাতে দাঁড়িয়ে। হাসল: 'বিশ মিনিটের মধ্যে আমার জাহাজ ছাড়ছে হনুলুলুতে। এই চারটে ছবির মধ্যে কোনটা নেবার পরামর্শ দেন আপনি?' চেক গুঁজে দিয়ে দেয়াল থেকে ছবি নিয়ে ছুটল দরজার দিকে। কর্মচারী ওকে আটকাতে চেয়েছিল কিন্তু আমি হাত নেড়ে বললাম: 'বাধা দিও না।' এইভাবেই সে ঝলক দিয়ে গেল যেন এদেশবাসিনী নয়, তবে হাতে আমার দিব্যি একটা চেক, দেয়ালের একটা জায়গা শূন্য।'

রোয়েরিখের ছবির রীতিমতো চাহিদা থাকায় এশিয়ায় সফরের জন্যও সঙ্গতি জোটাতে পেরেছিলেন তিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠান তাঁকে টাকা জোগায় নি।



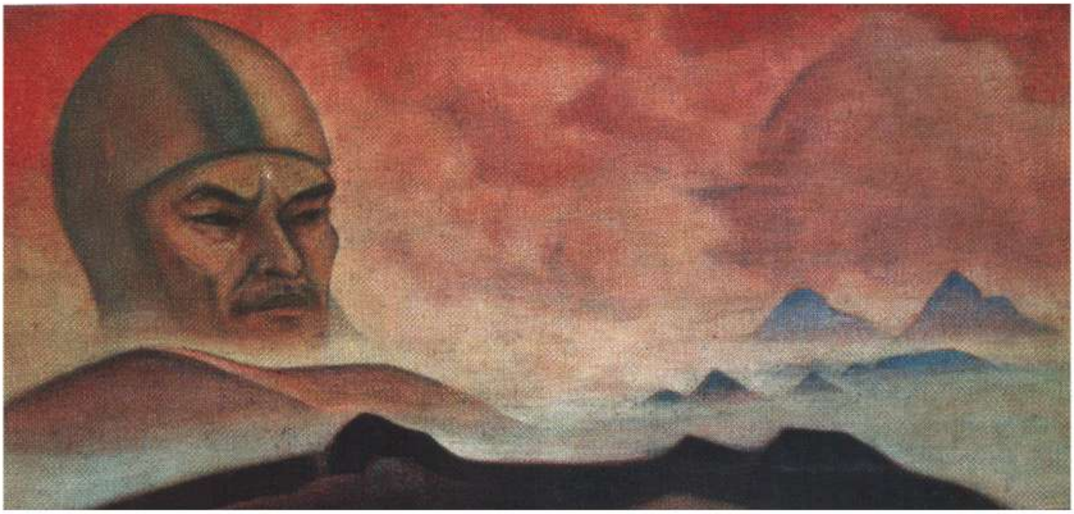
গুহামাহিমা। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।



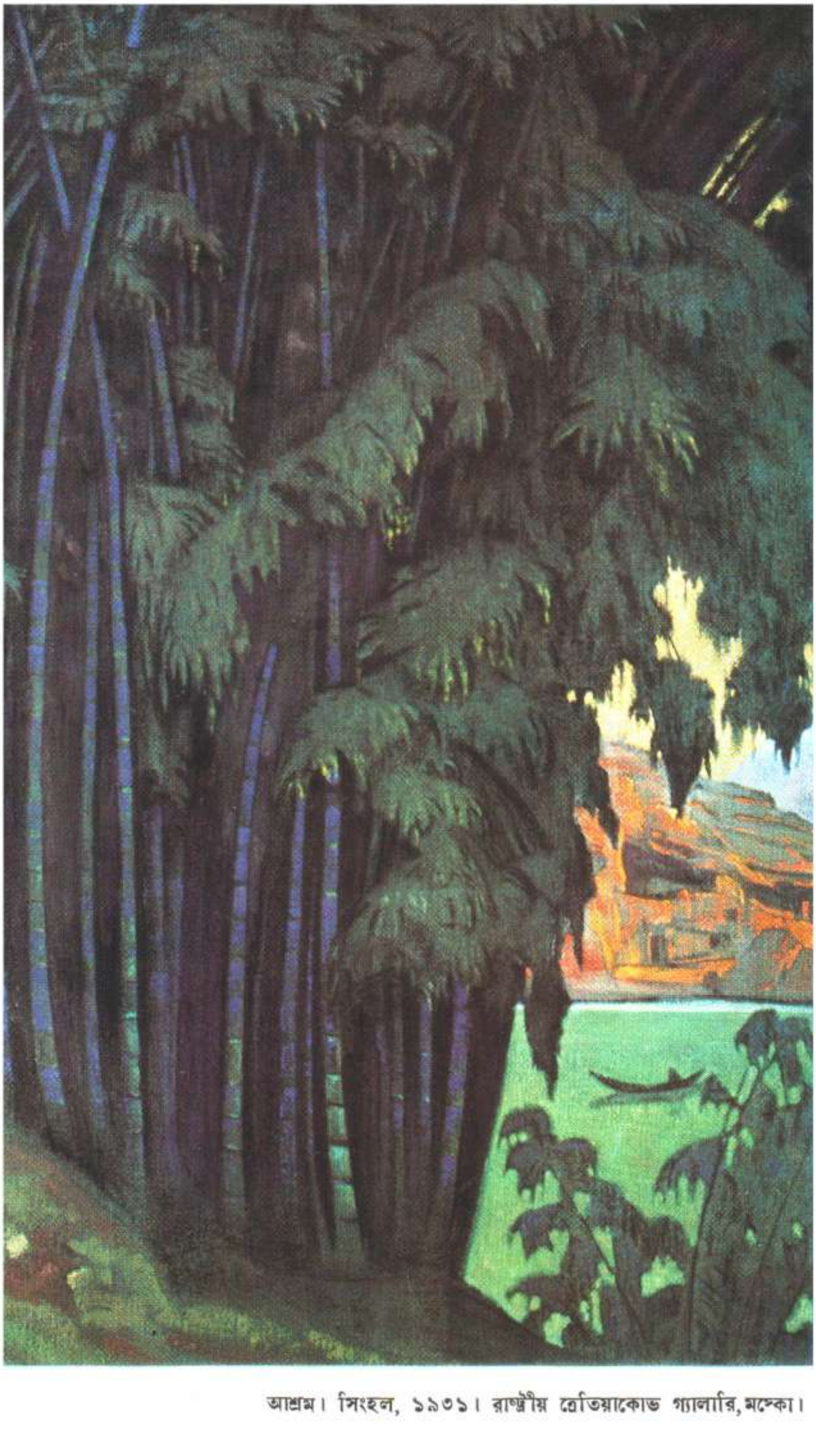
প্রাচীরের দুর্গ। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।



নির্জনের কানাকানি। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম,
গোর্কি



কাল পুরণ। ১৯২৭। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।



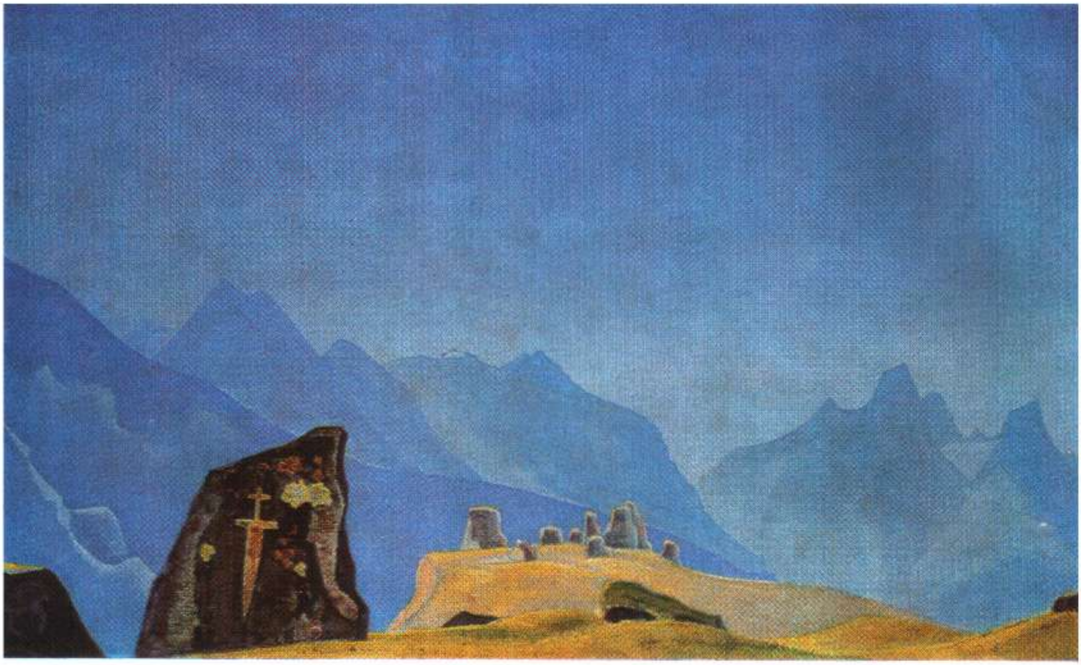
আশ্রম। সিংহল, ১৯৩১। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো।



চেনরেজি। ১৯৩১। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি,
মস্কো।



গ্রুপ্ত-চৌহান। ১৯৩১। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি,
মস্কো।



গেসেরের খড়্গ। ১৯৩২। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি,
মস্কো।

৭। এশিয়ার বক্ষস্থল

১৯২৩ সালের ১৬ মে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখ, ইয়েলেনা ইভানোভনা এবং পুত্র স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ প্যারিসে এলেন। স্ভিয়াতোস্লাভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থাপত্য ও চিত্রকলা শিক্ষা করছিলেন। অপর পুত্র ইউরি নিকোলায়েভিচও তাঁদের অপেক্ষা করছিলেন প্যারিসে। জমা হল গোটা পরিবার, শুরু হল ভারত যাত্রার শেষ প্রস্তুতি পর্ব।

প্রয়োজন ছিল কিছু ইউরোপীয় বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজের সম্পর্ক পাকা করে নেওয়া। ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনাদির ভরসাতেই রোয়েরিখ ভারতে অভিযাত্রার অনুমতি পাবেন বলে আশা করেছিলেন। ভিশি, লিয়োঁ, রোম, ফ্লোরেন্স, বলোনা, জেনেভায় গেলেন তিনি। শিগগিরই পিছু হটতে হল ব্রিটেনকে।

অবশেষে ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর মার্সেল থেকে 'ম্যাসিডোনিয়া' জাহাজে সপরিবারে রওনা দিলেন রোয়েরিখ। এই সময়টা সাধারণত যে গরম পড়ে তা পথে বিশেষ জ্বালায় নি। এডেনে জাহাজ কিছুটা থেমে থাকার সুযোগে ২৪ নভেম্বর রোয়েরিখ যে চিঠি পাঠান তাতে হর্ষবোধের সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তাও অনুভূত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলত ভ. শিবায়েভ মারফত। এই চিঠিতে তাঁকে তিনি সতর্ক করে দেন যে ভারতে পাঠানো তাঁর চিঠিপত্রের ব্যাপারে উনি যেন সাবধানতা অবলম্বন করেন, 'র‍্যাশিয়া' কথাটা আদৌ ব্যবহার না করে '*A*' অক্ষর দিয়ে যেন তা বোঝান। আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাদির বিবরণ তিনি যেন দেন প্রকাশিতব্য নীতিগল্পের আকারে। বোঝা যায় ইংরেজরা রোয়েরিখের ওপর নজর রাখছিল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার দিনটা এল অবশেষে। ১৯২৩ সালের ২ ডিসেম্বর ভারত থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে রোয়েরিখ জানালেন যে নিরাপদে পেশছেছেন। বোম্বাইয়ে অবতরণ করে তাঁরা বিখ্যাত ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যগুলি পরিদর্শন করেন। শুরু করেন এলিফেন্টা দ্বীপে গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যগুলি দিয়ে। তারপর যান জয়পুর, আগ্রা, প্রাচীনতম বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে সমৃদ্ধ সারনাথ, বারাণসী, কলকাতা এবং সেখান থেকে ফেরেন উত্তরে। এক মাসেরও কম সময়ে পাড়ি দেন তিন হাজারের বেশি কিলোমিটার। পথে বন্ধুর মতো সাক্ষাৎ হয় ভারতীয় বিজ্ঞানী শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রথিতযশা শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিক্‌পাল বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, বিবেকানন্দের উত্তরসাধক বি. সেন তাঁদের অন্যতম। রোয়েরিখ লিখেছেন: 'নানারকম

বিবেচনা থেকে, যা বোধগম্য কেবল তাদের কাছে যারা প্রাচ্যে থেকেছেন, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ নাকচ করতে হল।' অনন্যসাধারণ রাজনীতিক কবি ও দার্শনিক অরবিন্দের মতামত ছিল খুবই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্তবিরোধী, তাঁর সাক্ষাৎকারে ক্ষতি হতে পারত রোয়েরিখের।

ডিসেম্বরের শেষে রোয়েরিখরা এলেন দার্জিলিঙের অনতিদূরে হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালুতে অবস্থিত সিকিম রাজ্যে। যে তাড়াহুড়ো করে তিনি চলেছিলেন উত্তরের দিকে, তাতে বোঝা যায় যে তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল হিমালয়ে। পথে যেতে যেতেই তিনি টুকে রাখেন:

'বুদ্ধের ব্যক্তিগত কর্মকান্ডের স্থান সারনাথ আর গয়া ধ্বংসস্তূপে পতিত। তা কেবল তীর্থযাত্রার জায়গা। ঠিক যেমন জেরুসালেমও কেবল খ্রিস্টের নামে তীর্থ... বুদ্ধের কীর্তি কাহিনীর সুবিখ্যাত স্থানগুলি গঙ্গাতীরে। আচার্যের জন্ম ও মৃত্যুর সুবিখ্যাত স্থানগুলি নেপালে। কতকগুলি নজির অনুসারে দীক্ষালাভ হয়েছিল আরো উত্তরে হিমালয়ের ওপারে... মহাভারতে কথিত পৌরাণিক মেরু এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রের সমান পৌরাণিক শম্বল পর্বত — দুই-ই ছিল উত্তরে...'

একদা রাশিয়ায় যা করেছিলেন তেমনি এখন ভারতে রোয়েরিখ কাজ শুরু করলেন প্রাচীন সংস্কৃতির উদ্ভবের উৎসগুলি অনুধাবন করে। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল বৌদ্ধ ধর্মে, যার একটা ধারা মহাযান খুবই প্রসার লাভ করে চীন, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত এবং বৈকাল হ্রদের ওপারে।

গোটা মধ্য এশিয়ায় লৌকিক রীতিনীতি ও শিল্পের ওপর লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছে বৌদ্ধ ধর্ম। একাধিক বার তার উল্লেখ করেছেন রুশী প্রাচ্যবেত্তা ও পরিব্রাজকেরা, বিশেষ করে প্রজেভাল্‌স্কি ও কজলোভ। মধ্য এশিয়াকে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত চুঁড়ে দেখবেন এই ছিল তাঁদের স্বপ্ন যা ফলে নি। প্রাচীন সংস্কৃতির এলাকা তিব্বত ও হিমালয় অঞ্চল পশ্চিমের বিজ্ঞান জগতের কাছে তখনো ছিল অজ্ঞাত অঞ্চল। এই রহস্যময় অঞ্চলটাই রোয়েরিখকে টানছিল, এখন তিনি পুরোপুরি এসে দাঁড়িয়েছেন তার দক্ষিণ সীমান্তে।

অনতিবৃহৎ সিকিম রাজ্য নেপাল ও ভুটানের মাঝখানে অবস্থিত। সিকিমে বহু পর্বত শৃঙ্গ ৬-৮ হাজার মিটার উঁচু, ইজভারায় ছেলেবেলায় ছবিতে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘাও তার অন্যতম। পরিব্রাজকের পক্ষে বিপদ এখানে প্রতি পদে: গভীর গহ্বর, খাড়াই হাঁটাপথ, দুর্গম শিলা। ঝোপঝাড়ে বাঘ, চিতা, ভালুক, বানর। আকাশের অনেক উঁচুতে ভাসমান পক্ষিরাজ ঈগল। হিমালয়ের পরিচয় নিতে গিয়ে রোয়েরিখের প্রায়ই মনে পড়ত রাশিয়ার কথা: 'পুরনো মঠ আর রুস-এর নগরের প্রবেশ পথ যার জানা আছে তিনিই বুঝবেন কেমন লাগে সিকিমের মঠগুলির প্রবেশমুখ। সর্বদাই বার বার বলব: যদি কোনো একটা অপূর্ব জায়গা দেখতে চান, তাহলে লোককে জিজ্ঞেস করে নিন কোন জায়গাটা সবচেয়ে প্রাচীন। সবচেয়ে সেরা জায়গা পছন্দ করতে পারত এই স্মরণাতীত কালের লোকেরা।' এমন অনেক জায়গা স্থান পেয়েছে রোয়েরিখের ক্যানভাসে। ভারতে আসার একমাস পরেই তিনি লেখেন: 'এর মধ্যেই কয়েকটা সিরিজ মনে মনে রূপ নিচ্ছে: ১) 'সন্ধানের মণি', ২) 'তিমির দাহ', ৩) 'মন্দিরের দীপাবলি'।'

ভারত নিয়ে ছবি আঁকায় নিকোলাই রোয়েরিখ দৃঢ়ভাবে পরদেশী চাল পরিহার করেন। 'সিকিমের পথ', 'তার দেশ', 'রহস্যের জন্ম', 'হিমালয়', 'মৈত্রেয়', 'প্রাচ্যের গুরুগণ', প্রভৃতি যেসব ছবি

তিনি আঁকতে শুরু করেছিলেন ১৯২৪—১৯২৫ সালে তা অনেক দিক থেকে তাঁর আগেকার 'রুসের শুরু॥ স্লাভ', 'বীর্য', 'সাঙ্ক্তা' থেকে পৃথক।

রোয়েরিখের ছবিতে বিশুদ্ধ নান্দনিকের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞা, পরিপার্শ্ব বিষয়ে দার্শনিক মনন, নৈতিকতার যে সম্পর্ক সর্বদাই বর্তমান প্রাচ্য জনগণের বিশ্ববীক্ষার বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তা হয়ে উঠতে থাকে আরো অনুভবযোগ্য। রূপকলার দিক থেকেও শিল্পীর সন্ধান চিত্তাকর্ষক। ছবির বিন্যাসে দেখা দিতে থাকল মৌলিকতা, বদলে গেল অঙ্কনরীতি এবং অবশ্যই বর্ণ হয়ে উঠল ক্রমেই নিখুঁত। এসবই তাঁর 'সন্ধানের মণি', 'প্রভাতের গান', 'জলপ্রপাতের গান' প্রভৃতি বহু হিমালয় দৃশ্যের (১৯২৪) বৈশিষ্ট্য।

'সন্ধানের মণি' যে তাঁর সৃজনে একটা নতুন পাতা খুলে ধরেছে সেটা অকারণে নয়। আসা গেছে ভারতে আর সেখানে আঁকা তাঁর এই প্রথম ছবিটা দিয়ে রোয়েরিখ যেন প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে যে-ডাক তিনি শুনেছিলেন সেটা সংসার ত্যাগ করে ধ্যানমগ্ন আত্মপ্রশান্তির ডাক নয়। ছবিটা এক গুরু আর তার শিষ্যকে নিয়ে। মণিহারের ওপর ঝুঁকে তারা খুঁজছে সেই একমাত্র রত্নটি যা ছাড়া আজকের দিনটা কাটানো নিরর্থক। পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতীকে মণিহার চিরন্তনতার রূপক। সন্ধান কদাচ শেষ হবার নয়। কেননা যে সম্বোধি লাভ করেছে শুধু সেই গুরু হবার যোগ্য, আর যে খুঁজছে শুধু নিজের জন্য নয় সেই সত্য উদ্ধারে সক্ষম। গুরু শিষ্যকে আঁকা হয়েছে অনন্ত তুষারে সমাচ্ছন্ন চোখ-ধাঁধানো হিমালয়ের পটে।

এই ছবিতেই রোয়েরিখ অপ্রতিদ্বন্দ্বী গিরিশিল্পী হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করেন নিজেকে। তিনি লেখেন: 'কেউ বলবে না যে হিমালয় একটা খাদ, কারো মনেই হবে না যে হিমালয় একটা বিষণ্ন তোরণ, হিমালয়ের কথা স্মরণ করে কেউ একঘেয়ে কথাটা উচ্চারণ করবে না। হিমালয়ের তুষার রাজ্যে যখন আসবেন তখন মানুষের শব্দভাণ্ডারের সত্যি সত্যিই পুরো একটা অংশ পরিত্যক্ত হবে। লোকে বিস্মৃত হবে ঠিক তার বিষণ্ন বিরক্তিকর অংশটাই।'

সুকঠোর পর্বত পৌরুষ অর্জনে, মনোবল প্রকাশে সাহায্য করে মানুষকে।

রোয়েরিখ মন্তব্য করেছেন: 'লোকে যখন সমস্ত দুরূহতা অতিক্রম করে এইসব শৃঙ্গে যায় তখন তার প্রাণ ভরে ওঠে কী একটা আহ্বানে, অদম্য আকর্ষণে। ওই দুরূহতাটাই যা মাঝে মাঝে খুবই বিপজ্জনক তাই হয়ে ওঠে অতি প্রয়োজনীয় ও কাম্য সোপান, সমস্ত পার্থিব অলীকতার ওপর বিজয়। গর্জিত পাহাড়ে ঝোরার ওপর দিয়ে যতকিছু বিপজ্জনক বাঁশের সাঁকো, সর্বনাশা গহ্বরের ওপরে যুগ-যুগের হিমবাহের যতকিছু পিচ্ছিল পৈঠা, পরবর্তী চড়াইয়ে ওঠার আগে অপরিহার্য যত উৎরাই, ঝড়, ক্ষুধা, শীত আর উত্তাপ — সবই জয় করা যায় যেখানে আবিষ্কারে পেয়ালা ভরপুর।'

রোয়েরিখ নিজেই গেছেন এইসব বিপদের মধ্যে দিয়ে। ক্ষুধা আর শীত আর দুরন্ত ঝড় পরীক্ষা করেছে তাঁর সংকল্পশক্তি। যে আবিষ্কারে উন্মুক্ত হয় অদৃষ্টপূর্ব সুদূর, জন্ম নেয় স্বীয় স্পর্ধায় অকুতোভয় মানুষ, তার মূল্য এতে বেড়ে যায় দ্বিগুণ। হয়ত সেইজন্যেই রোয়েরিখের পার্বত্য দৃশ্যের মৌলিক সত্য 'অজানার' অদম্য পথিকদের কাছে বেশি নিকট ও বোধগম্য। অন্তত রোয়েরিখকে যাঁরা 'ইচ্ছাকৃত চমকের' পাপে পাতক বলে গণ্য করেন এমন কিছু শিল্পী ও শিল্পবেত্তার চেয়ে পর্বতারোহীরাই তার অভাবনীয় বর্ণের সত্যতার কথা বলেন সোৎসাহে

উচ্ছ্বাসে। বর্ণপ্রয়োগে রোয়েরিখের দুঃসাহসিক অভিনবত্ব যা তিনি প্রাচ্যে প্রবলভাবে অনুসরণ করেছেন তা আসলে এসেছে রঙের প্রকৃতি ও পরীক্ষামূলক বোধ থেকে।

১৯২১ সালে আমেরিকা থাকতেই শিল্পী লেখেন: '...প্রতিটি বর্ণসমাহারই কেমন একটা প্রবল চিত্তাবেগ জাগিয়ে তোলে। বর্ণের বিক্রম! দিব্য অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর সমস্ত বর্ণের বিক্রম সামনে থাকায় যে আনন্দ তাদের বহু দিনের নির্বন্ধ তা ত্যাগ করার জন্য লোকে অন্ধ হয়ে যেতেও রাজী। কিন্তু সবকিছুকে ধূসর, হলুদ, কালো কাচে ঢেকে মানুষের যুক্তি প্রবেশের চেষ্টা করছে, দেখাতে চাইছে বর্ণের শক্তি। যার উচিত সদর্পে আত্মঘোষণা করা, জীবনে সে ঠাঁই নিচ্ছে সসঙ্কোচে।'

উজ্জ্বল বর্ণশ্রেণীর প্রতাপ, চিত্রকলায় অভূতপূর্ব বর্ণসঙ্গম, অথবা উৎক্রমণের সঙ্গে পাল্লা করে বর্ণসংঘাত — এতে রোয়েরিখের চিত্রকর্মে দেখা দিয়েছে একটা অনুপম অভিব্যক্তি। সিকিমে তাঁর দুটি অভিযাত্রায় তিনি যেসব ছবি আঁকেন তাতে খোদ ভারতেই নতুন সাফল্য জোটে তাঁর।

এই অভিযাত্রাগুলিতেই তিব্বতী চিত্রকলার চিত্তাকর্ষক সব নমুনা সংগ্রহ করেন তিনি। মন্তব্য করেন: 'প্রশস্ত ব্যঞ্জনায় এ শিল্প মানবজাতির স্মৃতিকাগারের রহস্যোচিত। একটা আলাদা মন্দির গড়ে তোলে তা, সর্বদা যেখানে জিজ্ঞাসা আর অন্বীষা নিবেদিত'।

অভিযাত্রীরা প্রাচীন বৌদ্ধ লিখিত-পুঁথির সংগ্রহ ও অনুধাবন এবং এশিয়ার জনগণের বর্তমান জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব নিয়ে গবেষণাতেও খুবই আগ্রহী ছিলেন। রোয়েরিখের 'সিকিম ডায়েরি' (১৯২৪—১৯২৫) থেকে কিছু কিছু অংশ রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয় 'আশীর্বাদের পথ' সংকলনে। প্যারিসে প্রকাশিত তাঁর 'তিব্বতীয় চিত্রকলা' গ্রন্থে পুত্র ইউরি রোয়েরিখ অভিযাত্রার প্রাপ্তিগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করেন।

রোয়েরিখ যখন সিকিমে আসেন, তখন অসাধারণ আলোড়ন চলছিল বৌদ্ধ জগতে। তাশি লামা আর দালাই লামার মধ্যে মতভেদ ও সংঘাতের ফলে প্রথমোক্ত তিব্বত ছেড়ে হয় চীন নতুবা মঙ্গোলিয়ায় আত্মগোপন করেন। শোনা গিয়েছিল তাশি লামা সিকিমেও এসেছিলেন। তাশি লামাকে ধরা হত তিব্বতের আত্মিক নেতা, লাসার বৌদ্ধ কর্মকর্তারা যে সাধারণ লোকেদের ওপর নিষ্ঠুর শোষণ চালাত তাদের মধ্যে তাঁর ছিল বিশেষ প্রতিষ্ঠা।

তাশি লামার পশ্চাদ্ধাবনে পাঠানো হয় সশস্ত্র বাহিনী, বৌদ্ধ মহলে তাঁর পলায়ন নিয়ে মন্তব্য হয় প্রচুর। পরে রোয়েরিখ তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যসূচক পত্রবিনিময় করতেন, 'সিকিম ডায়েরি'তে তিনি লাসা প্রসঙ্গে বলেছেন, এই কেন্দ্রটা থেকে তিব্বতের সাধারণ লোকেদের প্রতারণাকে তোলা হয়েছে সরকারী পলিসির স্তরে।

সিকিমে রোয়েরিখের অভিযাত্রার স্থায়ী ঘাঁটি ছিল দার্জিলিঙের কাছে তালাই পৃখো ব্রাঙ্গ ভবন। লোকশ্রুতি অনুসারে এখানে একসময় নাকি দালাই লামা ছিলেন। সেই থেকে জায়গাটা পুণ্যস্থান বলে পরিগণিত, লোকে এখানে আসত তীর্থযাত্রায়। সুপ্রাচীন দীর্ঘ দেবদারু গাছে ঘেরা ভবনটি ছিল পর্বতমধ্যস্থ টিলায়। জানলা দিয়ে দেখা যেত হিমালয়ের গিরিশিরা আর গিরিসঙ্কটের অপরূপ দৃশ্য। এখানে রোয়েরিখের কাছে আসেন তাশি লামার একজন অনুরাগী গেশে রিনপোচে। ইনিও তিব্বত ছেড়ে নেপাল আর সিকিম হয়ে তখন যাচ্ছিলেন ভারতবর্ষে।

গেশে রিনপোচের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপগুলোয় প্রাচীন কালচক্র তন্ত্রের কথা ওঠে। পৌরাণিক

শম্বল কিংবদন্তির সঙ্গে এটি বিজড়িত হয়ে পড়ে এবং বারো শতক থেকে বহু বৌদ্ধ টীকার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমের প্রাচ্যবেত্তারাও কালচক্রে খুব আগ্রহী ছিলেন। কালচক্র বিষয়ক সাহিত্যের বিশদ বিশ্লেষণ ইউরি রোয়েরিখ দেন 'কালচক্র অধ্যয়ন প্রসঙ্গে' নামক একটি বিশেষ প্রবন্ধে। নিকোলাই রোয়েরিখও বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। 'এশিয়ার বক্ষস্থল' বইটার অনেক পাতাই এই নিয়ে।

তিব্বতী ধর্মগুরুদের আসা-যাওয়া, স্থানীয় আচার-আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা, ভাষায় দখল যাতে দোভাষীর প্রয়োজন আর রইল না, তাতে দুর্গম ও গোপন পার্বত্য মঠের দরজা খুলে যায় রোয়েরিখদের কাছে। এই প্রসঙ্গে রোয়েরিখ নিশ্চিত হয়ে ওঠেন যে তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়ার যেমন ধর্মীয় তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্ত ঘটনার কথাই চমৎকার জানে সিকিমের লোকে। তবে সে সময় এগুলি আলাদা করে দেখা সম্ভব ছিল না, কেননা মধ্য এশিয়ায় খুবই সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা নিচ্ছিল বৌদ্ধ যাজক সম্প্রদায়।

প্রাচ্যের পণ্ডিত ও সমাজকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা এবং সিকিমে প্রথম দিককার বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রার ফলাফল থেকে রোয়েরিখের এই সংকল্প দৃঢ় হয় যে মধ্য এশিয়ায় একটা বড়ো রকমের পরিব্রাজনের ব্যবস্থা করতে হবে। অভিযাত্রার যে পরিকল্পনা তিনি করেন তাতে দু'বার তিব্বতের মালভূমি পাড়ি দেবার কথা ছিল, তার পশ্চিমাংশ দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে এবং পূর্বাংশ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক ও শিল্পীয় কর্মসূচি ছিল তাতে। সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবারও খুবই ইচ্ছা ছিল রোয়েরিখের।

তবে যে অভিযাত্রা নিজেদের উপনিবেশ থেকে শুরু হয়ে আবার সেখানেই শেষ হচ্ছে সেটা সোভিয়েত ভূমির ওপর দিয়েও যাবে এতে বিশের দশকের গোড়ায় কোনো রাষ্ট্রই সম্মত হত না, ব্রিটেন তো দূরস্থান। বলাই বাহুল্য, সেজন্য সোভিয়েত সরকারেরও অনুমতি পাওয়া চাই। কিন্তু ভারতবর্ষে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েত কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিল না সেসময়। ফলে দুটি জটিল সমস্যা দাঁড়াল রোয়েরিখের সামনে: প্রথম — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এমন একটা অভিযাত্রা পাসপোর্ট সংগ্রহ করা যাতে ঔপনিবেশিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এশীয় রাষ্ট্রের এলাকা দিয়ে অভিযাত্রা যেতে দেবে; দ্বিতীয়ত, তিনি যে সোভিয়েত ইউনিয়নেও যেতে চান সেটা সোভিয়েত সরকারকে জানানো এবং তার অনুমতি পাওয়া। এই শেষ সমস্যাটার সমাধান হলে প্রথমটা একেবারে কেঁচে যাবার ভয় থাকায় এগুতে হল খুব সাবধানে।

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে রোয়েরিখ সাময়িকভাবে সিকিম ছেড়ে যাত্রা করলেন ইউরোপ ও আমেরিকায়। তাঁর মার্কিন বন্ধুদের যোগসম্পর্ক ও উদ্যোগের কল্যাণে মার্কিন পতাকায় অভিযাত্রা চালাবার অনুমতি পাওয়া গেল বেশ সহজেই, সেটা আরো এই কারণে যে এবারেও তার জন্য রাষ্ট্রের কাছে কোনো টাকা চাওয়া হয় নি, মিলল প্রয়োজনীয় দলিলপত্র।

বাকি রইল দ্বিতীয় কাজটা — বিদেশস্থ সোভিয়েত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা। রোয়েরিখ ঠিক করলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পথে কোনোরকম জানানি না দিয়েই দেখা করবেন বার্লিনে সোভিয়েত প্রতিনিধির সঙ্গে।

সোভিয়েত প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপে রোয়েরিখ জানালেন যে তিনি প্রাচ্যের দার্শনিক বিশ্ববীক্ষার অনুরাগী, যেসব ভারতীয় নেতা ও মহাত্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তাঁদের সঙ্গে তাঁর নিকট পরিচয় আছে। রোয়েরিখের মতে

এঁরা সোভিয়েত রাশিয়ার ভবিষ্যতে, তার মুক্তি সাধক ব্রতে বিশ্বাসী, রাশিয়ার ওপর তাঁদের ভরসা অনেক। তাঁর পীড়াপীড়িতে রোয়েরিখের বক্তব্য হুবহু অনুলিপি করে পাঠানো হয় মস্কোয়। সেটা পান পররাষ্ট্রের তদানীন্তন জনকমিসার গ. চিচেরিন। রোয়েরিখ সোভিয়েত রাজের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ভরসা করতে পারেন, চিচেরিন তাঁকে এই কথা জানাবার নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু সে নির্দেশ যখন এল রোয়েরিখ তখন আর ইউরোপে নেই, সাময়িকভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হারালেন আমাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা।

বার্লিনে সোভিয়েত প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপের পরই তিনি রওনা দিয়েছিলেন এশিয়ায়। ১৯২৫ সালের গোড়ায় অল্প সময়ের জন্য তিনি যান বৌদ্ধ ধর্মের আরেকটা শাখা হীনযানের কেন্দ্র সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ায়। বড়ো দরের পণ্ডিত, সোভিয়েত ইউনিয়নে সিংহলের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রদূত গ. প. মালালাসেকরের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ে খুবই লাভ হয়েছিল শিল্পীর। বহু বছর পরে এই খ্যাতনামা পণ্ডিত ও রাজনৈতিক কর্মী লিখেছেন:

‘আমার দেশ সিংহলে উনি যখন আসেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সম্মান লাভ করেছিলাম আমি। রোয়েরিখের জীবন এমন অনেক অসাধারণ উপাদানে গড়া যা বুঝিয়ে বলা কঠিন। কেউ কেউ তাঁকে বলেন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ, কেউ-বা অতীন্দ্রিয়বাদী। সম্ভবত নিজে উনি পছন্দ করবেন প্রতীচ্য থেকে প্রাচ্যে শুভেচ্ছার দূত কথাটা... এশিয়ার যেখানেই উনি গেছেন, তিব্বত, লাদাক, সিকিম, ভুটান, মধ্য এশিয়া, মঙ্গোলিয়া — সর্বত্রই প্রাচ্যের সেরা লোকেরা তাঁকে বরণ করেছেন একটা বিশেষ শ্রদ্ধা, আস্থা, অনুরাগের সঙ্গে, যা এসব দেশে বিদেশীর পক্ষে পাওয়া বিরল।’

সিংহল থেকে রোয়েরিখ যান মাদ্রাজে, যেখানে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের কেন্দ্র আদিয়ারে পরিচিত হন তার নেতাদের সঙ্গে। মিডিঅম বিদ্যা আর প্ল্যানশেট ভক্তদের কঠোর সমালোচনা ছাড়া রোয়েরিখ কখনো অধ্যাত্মবাদীদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন নি। আদিয়ারের ‘থিয়োসফিস্ট’ পত্রিকায় শিল্প বিষয়ে রোয়েরিখের প্রবন্ধ প্রকাশিত হত কদাচিৎ, অথচ বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত ভারতীয় পত্রিকাই তা ছাপাত। রোয়েরিখ বা তাঁর পরিবারের কেউ অধ্যাত্মবাদীদের কোনো আনুষ্ঠানিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। রোয়েরিখ অনেকবার এই কথাটায় জোর দিয়েছেন, কেননা কী জানি কার স্বার্থে এমন একটা মিথ্যা গুজব ছড়ায় যে বিশ্বের আধ্যাত্মিক আন্দোলনে একটা ‘প্রধান ভূমিকা’ নাকি নিয়েছেন হয়ত বা শিল্পী নিজে নতুবা তাঁর স্ত্রী।

আদিয়ার ভ্রমণের পর রোয়েরিখ তাঁর চিঠিপত্রে উল্লেখ করেছেন যে অধ্যাত্মবাদীদের ওপরতলার কাণ্ডাদিতে তিনি আশাহত। ঠিক এই সময়েই অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে সংঘাত পেকে উঠেছিল, কৃষ্ণমূর্তি বেরিয়ে যান তাদের দল থেকে। এই মতভেদে কোনো পক্ষকেই সমর্থন করতে চান নি রোয়েরিখ। আদিয়ারের নেতারাও যে শিল্পীর ক্রিয়াকর্মে একেবারে নিরাগ্রহ সেটা তাঁকে শুনিয়ে দেওয়া উচিত জ্ঞান করলেন তাঁরা।

আর বিদেশে রুশী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের যে কেন্দ্রটা ছিল জেনেভায়, তার নেতারা সবাই ভুগছিলেন ‘সোভিয়েত ভীতিতে’, তাই রোয়েরিখের প্রতি তাদের মনোভাবে দেখা দেয় অবিশ্বাস। তবে রুশী শিল্পীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং ভারতীয় দার্শনিক বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে তাঁর মতের মিল থাকায় বিভিন্ন দেশের বহু সাধারণ অধ্যাত্মবাদী আকৃষ্ট হয় তাঁর প্রতি, সাগ্রহেই তারা রোয়েরিখের নামের সঙ্গে জড়িত

সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী প্রতিষ্ঠানাদিতে যোগ দেয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবেতেই গঠিত হয় প্রাচ্য চর্চার চক্র। কিন্তু আধ্যাত্মিক সমাজের কিছু কিছু মুখ্য কর্মকর্তা রোয়েরিখের প্রতি এ-হেন আকর্ষণে নিজেদের প্রতিষ্ঠা হানির ভূত দেখেন এবং শিল্পী যাদের 'প্রেতাত্মিক আবিষ্কারের' ঘোষক বলে ক্ষুব্ধ করেছিলেন, তাদের বিরোধী কণ্ঠের সঙ্গে গলা মেলাবার সুযোগ তাঁরা ছাড়তেন না।

আদিয়ারে দিন কতক থেকে রোয়েরিখ কলকাতা হয়ে যান সিকিমে, তারপর ১৯২৫ সালের মার্চে দার্জিলিং থেকে তাঁর অভিযাত্রা স্থানান্তরিত করলেন কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে।

কাশ্মীরের অবস্থান নানা পথের চৌমাথায়। ভারত আর পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ পথটাও তার অন্যতম। চিরতুষারে আবৃত গিরিশিরা কাশ্মীরকে ঘিরে রেখেছে চারিদিক থেকে। গড়ে তুলেছে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। গিরিশিরাগুলোর মধ্যে গভীর এই উপত্যকা কৃষির পক্ষে অতি অনুকূল। তাই তা অনেক অতীত থেকে অন্য এলাকার লোকেদের টেনে এনেছে, বহু সংস্কৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে এখানে। আলেকজান্ডার ম্যাসিডোনিয়ার অভিযান প্রসঙ্গে কাশ্মীরের উল্লেখ করেছেন টলেমি আর প্লিনি। খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে কাশ্মীরে। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ অনুশাসন রচনায় এবং অন্যান্য দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয় কাশ্মীরীরা। সুদূর খোরেজম পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগে সেটা সহজ হয়।

মোটামুটি ছয় শতকে বৌদ্ধ ধর্মকে কোনঠাসা করতে থাকে হিন্দু ধর্ম, আর এগারো শতকে কাশ্মীরে প্রবেশ করে ইসলাম। বছরের পর বছর হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু বিশ্বাস ও আচার আত্মস্থ করে তা পরিণত হয় রাষ্ট্রীয় ধর্মে। বাইজান্টিয়ামে নিগৃহীত অনেকেও পালিয়ে আসে পূর্বে, কাশ্মীরের আত্মিক জীবনে তারা রেখে গেছে নিজেদের ছাপ। এসবের ফলে প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মের গবেষণায় একটা বিশেষ গুরুত্ব ধরে কাশ্মীর।

এখানে আসার আগেই এশিয়ায় খ্রিস্টের আগমন বিষয়ে একটা জনশ্রুতি রোয়েরিখের কানে গিয়েছিল। এখন শ্রীনগরের মুসলমানরা নিজেরাই শিল্পীকে বলল যে ইস্‌সা (খ্রিস্ট) ক্রুসে প্রাণ দেন নি, শিষ্যরা তাঁকে পাচার করে নিয়ে আসে তাদের শহরে, সেখানে তিনি লোকেদের শিক্ষা দিতেন, পরে এমনি মারা যান। ব্যক্তিগত একটা গৃহের ভূগর্ভ কক্ষে এমনকি কবরও দেখানো হয় একটা, সেখানে নাকি সমাধিস্থ আছেন তিনি। আসলে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এই কিংবদন্তিটির কথা রোয়েরিখ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, অমনি পশ্চিমের সংবাদপত্র সেটা কাজে লাগায় এই ধরনের একটা শস্তা চমক দেবার জন্য যে কাশ্মীরে খ্রিস্টের অবস্থানের জলজ্যান্ত প্রমাণ নাকি পেয়েছেন রোয়েরিখ। 'এশিয়ার কিংবদন্তি' প্রবন্ধে সেটা রোয়েরিখকে খণ্ডন করতে হল। তিনি লিখলেন: 'থেকে থেকেই একটা বিদঘুটে গুজব আমার কানে আসে যে এশিয়ায় আমাদের অভিযাত্রার মধ্যে আমি নাকি একটা প্রামাণিক দলিল পেয়েছি যা প্রায় খ্রিস্টের সমকালীন। জানি না এ ভাষ্য বানানো হয়েছে কার প্রয়োজনে, কী উদ্দেশ্যে...'

ধর্মীয় আন্দোলন এবং প্রাচ্যের আধুনিক জীবনে তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে রোয়েরিখ লিখেছেন:

'একদিকে আপনি পাবেন অপূর্ব কীর্তি ও প্রাচীন প্রজ্ঞা ও মিত্রকল্প মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে অভিব্যক্ত সূক্ষ্ম মনন পদ্ধতি। কিন্তু ঠিক সেইসব স্থানেই আপনি আঁতকে উঠবেন ধর্মের বিকৃত রূপ আর অজ্ঞতা আর অধঃপতন দেখে।'

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি রোয়েরিখ যে সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতেন সেটা তাঁর প্রগাঢ় মাত্রাবোধের পরিচায়ক। এমনিতেই আচারগুলিতে শিল্পীর আগ্রহ ছিল বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক দিক থেকে। তাঁর সাহিত্যকর্ম ও চিঠিপত্র থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে ভারতীয় দর্শনতন্ত্রে প্রচলিত কর্ম, নির্বাণ, জন্মান্তরের কিছু কিছু দিক তিনি মানতেন, কিন্তু তাদের একটা স্বকীয় ব্যাখ্যা দিতেন যার সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ নেই কোনো।

কাশ্মীরে বেশি দিন আটকে থাকা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সামনে দীর্ঘ দুরূহ পথ অথচ অভিযাত্রার সামনে বাধা আসছে একের পর এক।

১৯২৫ সালের ১ এপ্রিল তিনি ভ. শিবায়েভকে লিখলেন: 'কাশ্মীরের হ্রদ থেকে অভিনন্দন। ঠাণ্ডা তুষারকণা পড়ে আছে। কাল আমাদের নৌকাখানা ঝড়ে প্রায় চুরমার হতে বসেছিল, কিন্তু হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল, পরের ধাক্কাটা আসার আগেই একটা ছোটো নদীতে আশ্রয় নিতে পারি। আমাদের সামনে গিলগিটের রাস্তা... লাদাকে যাবার অনুমতির জন্য লড়ছি। একরাশ বাধা। লড়ে যাচ্ছি...' দু'সপ্তাহ পরে ফের একই কথা: 'লেহ্-তে যাচ্ছি, কিন্তু কোনো ফল মেলে নি এখনো...'

বার্লিনে রোয়েরিখ যে সোভিয়েত প্রতিনিধির কাছে গিয়েছিলেন সেটা ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের কাছে অজ্ঞাত থাকে নি। এখন কাশ্মীরের ভূখণ্ডে অভিযাত্রাকে এগুতে হচ্ছিল শম্বুক গতিতে, কেননা দেখা দিচ্ছিল অপ্রত্যাশিত সব বিঘ্ন, এমনকি সশস্ত্র হামলা পর্যন্ত, একবার হানাদারদের মধ্যে সনাক্ত করা গিয়েছিল ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ডি. উডের ড্রাইভারকে।

তাহলেও শ্রীনগর থেকে লেহ্ অবধি প্রাচীন পথটা পাড়ি দিয়ে সেই অবকাশে মাউলবেক, লামায়ুর, বাজগু, সাসপুলে শিল্প স্মরণিকা অনুধাবন করা অসম্ভব হয় নি।

লাদাকে অভিযাত্রা কাজ করে দুই মাসের ওপর। ব্রিটিশ তাঁবেদার আর গুপ্তচরদের বিপরীতে স্থানীয় অধিবাসীরা রোয়েরিখ ও তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করে। কাশ্মীর কর্তৃক বিজিত লাদাক তার অনেক বৈশিষ্ট্য তখনো বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। বৌদ্ধ ধর্মই এখানে প্রধান আর এই পার্বত্য অঞ্চলটার অর্থনীতিতে বেশ একটা ভূমিকা নিয়েছিল বাণিজ্য পথ বরাবর অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ। কার্যত লাদাকের শাসন ছিল এক ব্রিটিশ রাজপুরুষের হাতে, যদিও কাশ্মীর মহারাজের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিশেবে এখানকার প্রধান শহর লেহ্-তে থাকতেন লাদাকের উজির।

রোয়েরিখের সঙ্গে উজিরের ব্যবহার ছিল অতি সৌজন্যপূর্ণ। শহরের ওপর মাথা তুলে দাঁড়ানো টিলার ওপর তাঁর নিজের এককালকার চমৎকার আট তলা প্রাসাদের ওপর তলায় থাকবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ পর্যন্ত করেন। কিন্তু প্রাসাদের তখন এমন অবস্থা যে বাতাসের ঝাপটেই নড়বড় করে ওঠে ওপর তলা, রোয়েরিখদের সেখানে থাকাকালেই ভেঙে পড়ে এই 'বিলাসভবনের' একটি দেয়াল। তবে এসব 'ছোটোখাটো' অসুবিধা পুষিয়ে যেত পাহাড় আর শহরের মন্দির আর সারি সারি স্তূপের আশ্চর্য দৃশ্যে। রোয়েরিখ তা এঁকেছেন তাঁর অনেক স্কেচে।

১৯২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর লাদাক ছেড়ে যাবার সময় রোয়েরিখ তাঁর দিনলিপিতে লেখেন:

'অবশেষে ফেলে যাওয়া যাবে সমস্ত কাশ্মীরী অসত্য আর নোংরামি... ভুলে যাওয়া যেতে পারে যে বিজয়ীরা পোলো আর গল্‌ফ্‌ খেলছে, যখন লোকে মরছে সংক্রামক রোগে আর বুদ জড়ছে। কাশ্মীরের ঘুষখোর আমলাদের কাছ থেকে মুখ ফেরানো যেতে পারে। ভুলে যাওয়া যেতে পারে আমাদের আটকাবার জন্য আমাদের কারাভানের ওপর সশস্ত্র প্ররোচকদের হামলা। ছয় ঘণ্টা রিভলবার উ'চিয়ে থাকতে হয়েছে। তার চেয়েও মজার ব্যাপার যে পুলিশ আমাদের নামে টেলিগ্রাম পাঠায় যে ওটা আমাদেরই দৃষ্টিভ্রম, কোনো হামলা হয় নি। তাহলে কে জখম করল আমাদের সাত জন কুলিকে? ভারত আর কাশ্মীরকে কী করে তুলেছেন ওঁরা? নিজেকে নিরাপদ বোধ হয় শুধু পাহাড়ে। কেবল মরুময় উৎক্রমণগুলোতেই মূঢ়তা পৌঁছয় না।'

কিন্তু ভবিষ্যতে যা দেখা গেল, ব্রিটিশ 'অভিভাবকত্ব' থেকে অব্যাহতি পাবার আশা রোয়েরিখের সফল হয় নি।

লাদাকের পর অভিযাত্রা যায় খোটানের দিকে। শরতের নিদারুণ পরিস্থিতিতে পেরতে হবে পাঁচ সহস্রাধিক মিটার উ'চু সাতটি গিরিসঙ্কট: খারডঙ্গ, কারাউল-দাবান, সাসের, দাপসাঙ্গ, কারাকোরাম সুগেত-দাবান আর সাঞ্জু-দাবান। সুকঠিন পথ, অপ্রত্যাশিত ব্যাপার তাতে অনেক, তবে তার প্রথমটা ঘটিয়েছিল প্রকৃতি নয়, লোকে। দু'দিন না যেতেই আবিষ্কৃত হল যে লেহ্-তে বহাল করা লামা গাইডদের একজন রুশ ভাষা বোঝে চমৎকার, রোয়েরিখ এবং তাঁর নিকট সহযোগীদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তার অবহিতি মন্দ নয়। সন্দেহ রইল না যে খাশা সার্টিফিকেট পাওয়া গাইডটিকে অভিযাত্রায় গুঁজে দেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যেই।

কয়েকটা পাড়ির পর কারাভান পৌঁছল তুষারের রাজ্যে। ভ্রমণের ডায়েরিতে শিল্পী লিখেছেন: 'কী বৈচিত্র্য, রূপরেখার কী ব্যঞ্জনাশক্তি, কী কল্পলোকের নগর, কী বহুবর্ণ নদী আর কী স্মরণীয় বেগনী-লাল ও রুপোলী পাহাড়।' অত ঠান্ডায় হাতে তুলি বা পেনসিল বেশিক্ষণ ধরে রাখা যেত না, কিন্তু রোয়েরিখের চাক্ষুষ স্মৃতি ছিল ঈর্ষণীয়, পরে এই রূপকথার প্রকৃতিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছবিতে।

রোয়েরিখ যে পথ নিয়েছিলেন তা দিয়ে তাঁর আগেও রুশী ও ইউরোপীয় পর্যটকেরা গেছেন। যেমন দাপসাঙ্গ মালভূমিতে পাওয়া গেল লাতিন লিপি খোদাই করা পাথর, ১৯১৪ সালে দ্যে-ফিলিপির অভিযাত্রার লোকেরা তা কুঁদেছিল। উলটো দিক থেকে আসা কারাভানেরও দেখা মিলছিল। অপেক্ষাকৃত সজীব যদিও বিপজ্জনক এই পথে দুর্ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছিল সমাধি প্রস্তর, জমে যাওয়া ঘোড়ার কঙ্কাল, ফেলে যাওয়া মালের পোঁটলা।

সবচেয়ে উ'চু কারাকোরাম গিরিসংকট পেরনো গেল সবচেয়ে সহজে। খুবই বিপজ্জনক ছিল সাসের হিমবাহ, তার গোলাকার মসৃণ উপরিভাগে ইউরি রোয়েরিখের ঘোড়া পিছলে আরোহী সমেত প্রায় গহ্বরে পড়তে বসেছিল।

সুগেত গিরিসঙ্কটের খাড়া উৎরাইয়ে শুরু হল তুষার ঝড়। নিচে নামবার আঁকাবাঁকা সরু পথটা ঢেকে গিয়েছিল বরফে। এখানে গিরিচূড়ার কাছে জমল চারটি কারাভান — প্রায় ৪০০ ঘোড়া আর খচ্চর। নেওয়া হল পুরনো পদ্ধতির আশ্রয়, সামনে এগিয়ে দেওয়া হল সহিস ছাড়া অভিজ্ঞ পশুদের। সঙ্কীর্ণ হাঁটা পথের গভীর তুষারে নেমে পড়ল খচ্চরেরা, তাদের পেছু পেছু সন্তর্পণে

চলল কারাভান। শেষ গিরিসঙ্কট সাঞ্জুও বিশেষ আনন্দের কারণ হয় নি, একটা চওড়া ফাটল লাফিয়ে ডিঙতে হয়েছিল সেখানে।

এই পাহাড়ী রাজ্যের অসপত্ন অধিশ্বরী হলেন ভীষণা প্রকৃতি। এমনকি লাদাক আর চীনা ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সীমান্তও চিহ্নিত ছিল না। অবশেষে সুগেত গিরিশিরার উত্তর দিকে, কোরামে পাওয়া গেল মাটির দেয়াল ঘেরা প্রথম চীনা পোস্ট। তার পেছনে ক্ষুদে একটা পাহাড়ে কুঠিতে থাকত চীনা অফিসার। তার এক্তিয়ারে ছিল একজন দোভাষী, জনাদশেক কিরগিজ, আর একনলা একটি বন্দুক, যার নমুনা মেলে শুধু মিউজিয়মে। প্যারিসে চীনা রাষ্ট্রদূত রোয়েরিখকে যে পাসপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না অফিসারটির। বোঝা যায়, দলিলপত্রের বিশেষ গুরুত্ব নেই এখানে, তার পরিণাম যে সর্বদা শুভ নয় সেটা দেখা গিয়েছিল পরে।

সাঞ্জু গিরিসঙ্কটের আগে অভিযাত্রা আবিষ্কার করে বৌদ্ধ শৈল গুহা, যার কথা আগে লেখে নি কেউ। কিন্তু তার প্রবেশ পথ ধ্বসে পড়েছিল, ফলে পেঁছিনো গেল না সেখানে। এই শেষ গিরিসঙ্কট এড়িয়ে অভিযাত্রা পিয়ালম আর জাভাকুরগান হয়ে যায় খোটান মরূদ্যানে। এখানে খনন কার্য চালাবার ইচ্ছা ছিল শিল্পীর। পুরানো খোটান দিয়ে একদা গিয়েছিল 'মহান চীনা বাদশাহী সড়ক' — পশ্চিমের সঙ্গে প্রাচীন চীনের প্রধান যোগপথ। খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকের যেসব দলিল আছে তাতে এ অঞ্চলটার ধনসম্পত্তি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রোয়েরিখের অভিযাত্রীরা এখানে দেখল পরিপূর্ণ দৈন্য। এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে বিস্তীর্ণ মরূদ্যানের দুই লক্ষ অধিবাসীর জন্য ডাক্তার ছিল না একটিও, ডাক্তার পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল ইয়ারকেন্দে, খোটান থেকে তা এক হপ্তার পথ।

খোটানে প্রবেশের মুখেই রোয়েরিখ এই হুঁশিয়ারি পেয়েছিলেন যে সিনজিয়ানের লাট ইয়ান দুতুর অধীনস্থ যারা এখানকার কর্মকর্তা তারা তাঁর নির্দেশে অথবা আত্মস্বার্থে কোনো পন্থাতেই পরাঙ্মুখ নয়, মনুষ্যজীবনের কোনো মূল্য নেই তাদের কাছে।

তবে খোটানের প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কর্মকর্তা আম্বান আর দায়োতায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কোনো আশংকা দেখা দেয় নি। উভয়েই খুবই সৌজন্য দেখান এবং অভিযাত্রায় তাঁদের পরিপূর্ণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু... রোয়েরিখের পাসপোর্ট দেখে খোটানের শাসকেরা ঘোষণা করলেন যে তা অচল। তৎক্ষণাৎ অভিযাত্রীদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেবার হুকুম দিলেন তাঁরা, নিষিদ্ধ হল গবেষণার কাজ। শিল্পী যখন স্কেচ করতে শুরু করেন, তখন অঞ্চলের কোনো মানচিত্র নেওয়া চলবে না এই অজুহাতে সেটাও বারণ। পরে বোঝা গিয়েছিল যে চীনা রাজপুরুষেরা ভূসংস্থানের মানচিত্র আর নিসর্গের স্কেচের মধ্যে তফাতটা বুঝত কম।

খোটানে আটকে থাকার সময় রোয়েরিখ আঁকেন 'মৈত্রেয়' সিরিজ। মৈত্রেয় অথবা ভাবী বুদ্ধ, অথবা পুরাণের কল্কি অবতার কিংবা মঙ্গোলিয়ার রিগদেন জাপো, বা আলতাইয়ের শাদা বুরখান অথবা মুসলিম এশিয়ার মুন্তাজার — সবই মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত এই কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িত যে শম্বলের অবতারের আগমনে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথিবীতে।

শম্বল বিষয়ে তথ্যাদি রোয়েরিখ সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন সিকিমে থাকতেই। তিনি লিখেছেন যে লাদাকে তিনি প্রথম বৃহৎ শিলাগাত্রে

মৈত্রেয় মূর্তি দেখেন, সামপুলে পাওয়া যায় মোটামুটি ছয় শতকের মৈত্রেয়, লেহ্‌-তে মৈত্রেয় মন্দিরে যান শিল্পী, আর খোটানে মঙ্গোলিয়া থেকে আগতদের কাছ থেকে তিনি জানতে পান যে উলান-বাতোরেও শম্বলের মন্দির নির্মিত হবে। এ খবর শুনে তিনি দিনলিপিতে লেখেন: ''রিগদেন জাপো'র আদেশ' নামে একটা ছবির কথা ভেবেছি।'

'মৈত্রেয়' সিরিজে আছে সাতটি ছবি: 'শম্বল আসছে', 'সুখের ঘোড়া', 'প্রাচীরের দুর্গ', 'আসন্নের ধ্বজা', 'গুহামহিমা', 'নির্জনের কানাকানি', 'মৈত্রেয় ॥ বিজয়ী'। এগুলি আঁকা হয় লাদাকে সংগৃহীত 'লাল অশ্বারোহী' নামে একটি প্রাচীন তিব্বতী ছবির প্রভাবে। সম্ভবত সেইজন্যই রোয়েরিখ সিরিজটার ওই নাম দিয়েছেন। 'লাল অশ্বারোহী' ছবির বর্ণনায় তিনি লিখেছেন: 'লাল ঘোড়ায় লাল ধ্বজা নিয়ে ছুটছে বর্মাবৃত লাল অশ্বারোহী, পবিত্র শঙ্খধ্বনি করছে সে, রক্তিম শিখা স্ফুরিত হচ্ছে তার কাছ থেকে, সামনে উড়ছে লাল লাল পাখি। তার পেছনে শাদা পাহাড়, তুষার, শ্বেতা তারা আশীর্বাদ করছেন তাকে। ওপরে মহা লামাদের সমাবেশে উল্লাস, নিচে রক্ষকেরা এবং স্থানের প্রতীক স্বরূপ গৃহপালিত পশুপাল।'

স্পষ্টতই তিব্বতী চিত্ররীতিতে আঁকা সিরিজের প্রথম ছবিতে রোয়েরিখ হুবহু এই প্রসঙ্গটাই তুলে ধরেছেন। পরের ছবিগুলিতে আছে তিব্বতের বাস্তব ভূদৃশ্য এবং অভিযাত্রার জীবন, শুধু ধাবমান অশ্বারোহীদের সিলুয়েটেই সূচিত হয়েছে মৈত্রেয়ের আসন্ন আগমন।

এদিক থেকে বিশেষ আকর্ষণীয় সিরিজের শেষ ছবি 'মৈত্রেয় ॥ বিজয়ী'। শিলাগাত্রে ক্ষোদিত মৈত্রেয় মূর্তির সামনে নতজানু পথিক, কিন্তু দৃষ্টি তার নিবদ্ধ মূর্তির দিকে নয়, আকাশে, সেখানে গোলাপী মেঘে ফুটে উঠেছে অশ্বারোহী রুশী মহাবীরের সিলুয়েট।

সুখী ভবিষ্যৎ নিয়ে এশীয় জনগণের স্বপ্ন ফুটিয়ে তোলার সময় শিল্পী একই ছবিতে এঁকেছেন রুশী ও এশীয় নায়কদের মূর্তি। ভবিষ্যতেও তিনি এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন একাধিক বার। এশীয় জনগণের মুক্তি প্রসঙ্গে রোয়েরিখ তার গ্রন্থাদিতে প্রায়ই বলেছেন যে তা আসবে উত্তর থেকে ('উত্তর শম্বল')। এই সিরিজ নিয়ে কাজ করার সময় রোয়েরিখ তাঁর পরিব্রাজক ডায়েরিতে লিখেছেন: 'এইসব উন্মাদ স্বপ্নে আমাদের হাসি পেতে পারে, কিন্তু যে বিশাল অঞ্চলে লোকে তা মানে অটল বিশ্বাসে ও প্রগাঢ় ভক্তিতে, সেখানে তার প্রভাব হতে পারে পরাক্রান্ত, একেবারেই আশাতীত এমন সব ঘটনাকে তা উদ্বুদ্ধ করতে পারে যা অতি নিপুণ রাজনীতিকও আগে থেকে অনুমান করতে অক্ষম... শম্বলের কাল নিয়ে লামার উক্তি পড়ে দেখুন। স্থানীয় একজন কথক থেকে লামা পরিণত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ঘটনার কর্মকর্তায়।'

খুবই পরিষ্কার যে শম্বল ও মৈত্রেয় নিয়ে প্রাচীন কথাগুলোয় রোয়েরিখ নিজেই বর্তমান ঘটনাবলির ওপর তার সামাজিক ও ভাবাদর্শীয় প্রভাবপাতের একটা বাস্তব শক্তি দেখেছিলেন। নতুন ও পুরনো দুনিয়ার মধ্যে আপোসহীন সংগ্রাম তাঁকে অনুভব করতে হয়েছে নিজেকে দিয়েই। খোটানে অভিযাত্রার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকল। বোঝা যাচ্ছিল যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চলেছে ইংরেজদের প্ররোচনায়, কেননা সরকারী ইংরেজ প্রতিনিধিদের কাছে সমস্ত আবেদনই হল নিষ্ফল। তারপর ১৯২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর খোটানে দেড় মাস থাকার পর রোয়েরিখ সোভিয়েত কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন,

নিম্নোক্ত চিঠি পাঠালেন কাশগড়স্থ সোভিয়েত কনসালের কাছে:

'মান্যবর কনসাল, সংশ্লিষ্ট টেলিগ্রাম থেকে আপনি দেখবেন যে আমাদের অভিযাত্রায়, যার কথা আপনি শুনে থাকতে পারেন, তাতে বাধা দিচ্ছে খোটানের চীনা কর্তৃপক্ষ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে অভিযাত্রার সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের কারণে আপনি আপনার মুক্তচিত্ত সহযোগিতায় আপত্তি করবেন না। উরুমচির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো এই টেলিগ্রামটি মস্কো মারফত পাঠানো আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না কি?..'

বার্লিনের প্রতিনিধি দপ্তরে রোয়েরিখের আগমন এবং চিচেরিনের নির্দেশ বিষয়ে সোভিয়েত কনসাল ম. ফ. দুম্পিস আদৌ অবহিত না থাকলেও তিনি সমস্ত ব্যাপারটা মস্কোয় জানান এবং রোয়েরিখের সোভিয়েত পাসপোর্ট না থাকলেও তিনি অভিযাত্রার সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য হস্তক্ষেপ করেন।

কনসাল ও শিল্পীর মধ্যে শুরু হয় পত্রবিনিময়। রোয়েরিখ পেতেন সোভিয়েত পত্রিকা ও দেশের খবরাখবর, নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠানো হত তাঁর চিঠি ও টেলিগ্রাম। তবে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগও ঘুমিয়ে থাকে নি, অন্তত দুটি গুজব তারা বেশ ছড়ায়: 'রোয়েরিখ লাল গোয়েন্দা', স্থানীয় বৌদ্ধদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির ব্যবস্থা করছে, এবং 'রোয়েরিখ সন্দেহজনক শ্বেত দেশান্তরী', আমেরিকানদের টাকা খেয়ে সে তার ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।

খোটানে নিজে সরাসরি কিছু করার সুযোগ না থাকায় রোয়েরিখ পর্যটনে একান্ত প্রয়োজনীয় যে অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা ফেলে রেখেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি বিনা খোটান পরিত্যাগের চেষ্টা করেন। স্থির হয়, অভিযাত্রা চলে যাবে ১৯২৬ সালের ২ জানুয়ারি, কিন্তু ঠিক তার আগেই চীনা কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করে অভিযাত্রার সমস্ত সদস্যকে। একজন বিশ্বাসী লোক মারফত খবরটা কাশগড়ে পাঠাতে পারেন রোয়েরিখ। সোভিয়েত কনসাল অবিলম্বে তা পররাষ্ট্র জনকমিসারিয়েতকে জানান এবং সিনজিয়ানের লাট মারফত অভিযাত্রার মুক্তির আদেশ করিয়ে নেন।

এই তৎপর ব্যবস্থায় রোয়েরিখের কারাভান খোটান থেকে বেরতে পারে এবং কাশগড় পৌঁছয় ১৩ ফেব্রুয়ারি। সেখানে রোয়েরিখ সর্বাগ্রে সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দেন কনসালকে। অভিযাত্রার উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মতামত, ভারত ও তিব্বতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের প্রসারের কথা তাঁকে জানান সবিস্তারে এবং তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনার রূপায়ণে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। সোভিয়েত সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে কিছুকালের জন্য 'উধাও' হওয়া অর্থাৎ সোভিয়েত ভূখণ্ডে প্রবেশ করার ইচ্ছে ছিল তাঁর, কিন্তু স্থানীয় ব্রিটিশ কনসাল শিল্পীর অভিসন্ধি আঁচ করে তাঁর সম্পর্কে একটা উদ্ধত আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন, সেটাকে একটা 'মার্জিত' পুলিসী খবরদারি বলেই ধরেন রোয়েরিখ।

কাশগড়ে রোয়েরিখরা ছিলেন প্রায় দুই সপ্তাহ, স্বদেশে বন্ধুবান্ধব আত্মপরিজনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সাক্ষাতের আনন্দ অনুভব করছিলেন মনে মনে। ইয়েলেনা ইভানোভনা একটা চিঠিতে লিখেছিলেন: 'উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তাম 'ইজ্‌ভেস্তিয়া', চমৎকার নির্মাণ কাজ চলেছে সেখানে, গুরু লেনিনকে যে শ্রদ্ধায় ঘিরে রাখা হয়েছে সেটা বিশেষ অভিভূত করেছিল আমাদের... পশ্চিমের উন্মত্ততা আর তুচ্ছতার পর অতি শিক্ষাপ্রদ। সত্যসত্যই এ এক নতুন দেশ, তার ওপরে জ্বলজ্বল করছে গুরুর নক্ষত্র।'

কাশগড় থেকে আক্সু, কুচা, কারাশার আর তকসুন হয়ে অভিযাত্রা নিরাপদে উরুম্চি পেঁাছল ১৯২৬ সালের ১১ এপ্রিল। উরুম্চি সিনজিয়ান প্রদেশের রাজধানী, লাট ইয়ান দুতু থাকেন এখানে, ঘন ঘন রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও ইনি এই বিরাট অঞ্চলটা শাসন করে আসছেন সতের বছর।

ইয়ান দুতু কী পদ্ধতিতে তাঁর প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতেন তর একটা উজ্জ্বল বর্ণনা রেখে গেছেন রোয়েরিখ। এলাকাটার বিজেতা চীনাদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসী কিরগিজ, কালমিক, উজবেক, মঙ্গোলদের স্বার্থসংঘাতের মধ্যে কেবলি পড়তে হত তাঁকে। নানান জাতির লোকেদের স্বপক্ষে টানার উদ্দেশ্যে লাট সাহেব পালা করে নিজেকে কখনো কিরগিজ কখনো উজবেক, কখনো মঙ্গোল, কখনো উইগুরদের ভাই বলে ঘোষণা করতেন, নৈবেদ্য নিয়ে যেতেন তাদের দেবতাদের জন্য আর খুব করে ঢাক পিটাতেন যে তাদের রীতি অনুযায়ী তাঁর শেষকৃত্য হবে তাদেরই সমাধিক্ষেত্রে। এ সম্মানের জন্য মোল্লা আর লামারা যখন নিজেদের মধ্যে লড়ত, ইয়ান দুতু তখন নির্মমভাবে তাঁর কাছে অসুবিধাজনক লোকদের খতম করে আত্মসাৎ করতেন তাদের সম্পত্তি।

কোনো একটা গ্রুপের ক্ষতি করে অন্য গ্রুপের সমর্থনে যখন জটিলতা দেখা দিত লাট সাহেব তখন সমাধান হিশেবে মোরগ লড়াইয়ের আশ্রয় নিতেন। এর জন্য পালা হত নানা রঙের মোরগ, এক একটা জাতি বা ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক হত তারা। মোরগদের লড়াকু যোগ্যতা আগেই ভালো জানা থাকায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ফলাফলটা হত সর্বদাই 'নিরপেক্ষ' শাসকের গোপন ইচ্ছানুযায়ী, সেটাকে তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে চালাতেন।

নিজেকে ইয়ান দুতু ভাবতেন উচ্চশিক্ষিত লোক, বড়াই করতেন দর্শনের এম. এ. ডিগ্রি নিয়ে, যদিও কেউ জানত না সেটি তিনি পেয়েছেন কোথা থেকে। এর পর অবাক হবার আছে কি যে খোলাখুলি মানুষ কেনা-বেচা রোয়েরিখ দেখবেন এই সিনজিয়ানেই। অভিযাত্রায় খাটাখাটনির কাজে মাইনে দিয়ে লোক বহাল করতে গেলে রোয়েরিখকে সোজাসুজি বলে দেওয়া হয় যে ওটা কোনো 'কাজের' কথা নয়, দীর্ঘ কালের জন্য হলে চাকর কেনাই ভালো। আর ক্রীতদাসের যা দাম তা একেবারে 'দৈবদুর্লভ'। সহিসের জন্য ৩০ ডলার দিলেই চলে, মুটেদেরও তাই, মেয়েদের ২০, শিশুদের জন্য ২-৪ ডলার।

উরুম্চিতে দর্শনের মান্যবর এম. এ-টির কাছে আনুষ্ঠানিক দর্শন দিতে হয় রোয়েরিখকে। উনি বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক বলে জাহির করেন নিজেকে, আশ্বাস দেন যে তাঁর পক্ষ থেকে খুবই মনোযোগ দেওয়া হবে পর্যটকদের প্রতি। তবে এ মনোযোগ প্রকাশ পেল খুবই মৌলিক ধরনে — রোয়েরিখ যখন তাঁর সৌজন্যবাণী শুনছিলেন, পুলিসে তখন ওদিকে গোটা অভিযাত্রার মালপত্র তছনছ করে তল্লাশি চালাচ্ছিল।

সোভিয়েত ভিসা পাবার জন্য উরুম্চিতে থাকতে হয়েছিল রোয়েরিখকে, প্রতিদিন যেতেন সোভিয়েত কনসাল আ. ইয়ে. বিস্ত্রভের কাছে। কনসুলেটেই নিকোলাই রোয়েরিখ ও ইয়েলেনা ইভানোভনা তাঁদের বইয়ের অংশবিশেষ পড়েন যাতে লেখা ছিল লেনিনের কথা: 'লেনিন হলেন ক্রিয়া। নবব্যবস্থার অপ্রতিরোধ্যতা লেনিন অনুভব করেছিলেন। মননের অখণ্ডতা লেনিনকে করে তুলেছে অকুতোভয়, সাধারণ কল্যাণের জন্য প্রচণ্ড চাপ সইবার মতো আর কেউ ছিল না।'

শিল্পীর উরুম্চি থাকাকালেই কনসুলেট ভবনের সামনে স্থাপনের জন্য মস্কো থেকে আসে

লেনিনের আবক্ষ প্রতিমূর্তি। বেদী না থাকায় রোয়েরিখ তার একটা স্কেচ করে দেন এবং সেই অনুসারে তা নির্মিতও হয়। কিন্তু কনস্যুলেট থেকে একবার ফিরে রোয়েরিখ তাঁর দিনলিপিতে লিখলেন: '...অনাথের মতো দাঁড়িয়ে আছে কার্তিতচূড় পিরামিড — নিষিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভের পাদপীঠ। বোঝা যায় না কেন লেনিনের সমস্ত পোস্টার অনুমোদনীয়, লেনিনের সাধনার সিদ্ধির জন্য কেন স্বাস্থ্যপান করে চীনারা অথচ তৈরি বেদীর ওপর লেনিনের আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হওয়া চলবে না।' প্রসঙ্গত এটা নিষিদ্ধ হয়েছিল ইয়ান দুতুর ব্যক্তিগত নির্দেশে।

শিগগিরই অভিযাত্রার সদস্যদের সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে টেলিগ্রাম এল চিচেরিনের। ১৯২৬ সালের ১৬ মে রোয়েরিখরা উরুম্চি ছাড়লেন। আ. ইয়ে. বিস্ত্রভ এবং কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মী বিদায় জানান অভিযাত্রাকে, দিনলিপিতে রোয়েরিখ সে কথা স্মরণ করেছেন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে: 'হৃদয়বান সব লোক। যেন এক মাস নয় এক বছর কাটল ও'দের সঙ্গে। শহরের বাইরে সবুজ মাঠে বসে থাকতাম আমরা। কী আমাদের চঞ্চল করছে, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে আলাপ হত আরো একবার। মনে হত ওঁদের সঙ্গে আরো দেখা হবে, কিন্তু বিদায় নিতে হল...'

খেদজনক অভিজ্ঞতার কথা ভেবে রোয়েরিখ অভিযাত্রার দিনলিপি কনসালের কাছে গচ্ছিত রেখে যান সংরক্ষণের জন্য আর ঠিক যাবার আগে উইল করেন যে অভিযাত্রা ধ্বংস পেলে ছবি সমেত তাঁর সমস্ত সম্পত্তি যাবে সোভিয়েত সরকারের অধিকারে।

সুখের বিষয় উরুম্চি থেকে জাইসান পর্যন্ত অভিযাত্রা গেল নিরাপদেই। ১৯২৬ সালের ২৯ মে রোয়েরিখরা তিব্বত থেকে দু'জন সহযাত্রী সমভিব্যাহারে জাইসান হ্রদের সোভিয়েত সীমান্ত পার হন এবং ১৩ জুন পৌঁছন মস্কোয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আটকে থাকা রোয়েরিখের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে পথ ঠিক করা হয়েছিল তার আধখানা মাত্র পাড়ি দেওয়া গেছে, শিল্পীর নেতৃত্বাধীন অভিযাত্রা আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদিত পথের একটা পর্যায়ে রয়েছে মাত্র, অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার উত্তরাংশে। রোয়েরিখের মস্কো যাত্রার খবর জানত কেবল অল্পসংখ্যক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। সেখানে প্রদর্শনী করার প্রস্তাব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হল। ডাকযোগে অভিযাত্রার পথের বিশদ বিবরণ দিতেও শংকা ছিল তাঁর। তাই শিল্পীর সঙ্গে দেখা করার জন্য নিউ-ইয়র্ক থেকে মস্কো এলেন তাঁর দু'জন ঘনিষ্ঠ সহযোগী জ. লিখ্টমান (ফস্দিক) এবং ম. লিখ্টমান।

মস্কোয় জনকমিসার গ. ভ. চিচেরিন এবং আ. ভ. লুনাচার্স্কির সঙ্গে আলাপ হয় রোয়েরিখের। দু'জনেই তাঁরা ভারত ও তিব্বত সম্পর্কে রোয়েরিখের বিবরণ এবং এশিয়ায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে তাঁর পরিকল্পনায় খুবই আগ্রহ দেখান। চিচেরিনকে রোয়েরিখ দেন দেবতাত্মা হিমালয়ের মৃত্তিকা সমেত একটি পেটিকা এবং সোভিয়েত জনগণের উদ্দেশে মহাত্মাদের বাণী। তাতে বলা হয়:

'আপনারা কী করছেন তা আমরা হিমালয়ের লোকেরা জানি। আপনারা উচ্ছেদ করেছেন গির্জাকে, যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মিথ্যা ও অন্ধ বিশ্বাসের ঘাঁটি। আপনারা বিলুপ্ত করেছেন কূপমণ্ডূকদের যারা হয়ে উঠেছিল কুসংস্কারের বাহক। শিক্ষার কারাগারকে আপনারা চূর্ণ করেছেন। ভণ্ডামির ঝাড়বংশকে আপনারা নির্মূল করেছেন। আপনারা দগ্ধ করেছেন আজ্ঞাবহ ফৌজকে। মুনাফার মাকড়শাকে

আপনারা পিষে মেরেছেন। রাতের ডেরাগুলোর ফটক বন্ধ করে দিয়েছেন আপনারা। টাকাওয়ালা বেইমানদের হাত থেকে আপনারা জমিকে মুক্ত করেছেন। আপনারা স্বীকার করেছেন যে ধর্ম হল সর্বব্যাপী সত্তার মতবাদ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির তুচ্ছতা আপনারা মেনেছেন। গ্রামসমাজের বিবর্তন আপনারা অনুমান করেছেন। অভিজ্ঞতার গুরুত্ব দেখিয়েছেন আপনারা। সৌন্দর্যের কাছে আপনারা মাথা নত করেছেন। শিশুদের কাছে আপনারা ধরে দিয়েছেন মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তি। প্রাসাদ-পুরীর বাতায়ন খুলে দিয়েছেন আপনারা। সাধারণ কল্যাণের নতুন ভবন নির্মাণ যে আর মুলতবী রাখা যায় না তা আপনারা দেখেছেন! ভারতের অকালবিদ্রোহ আমরা থামিয়ে দিয়েছি, আমরাও তেমনি আপনাদের আন্দোলনের কালোপযোগিতা মানি, এশিয়ায় ঐক্য ঘোষণা করে আমাদের সমস্ত সাহায্য পাঠাচ্ছি আপনাদের।'

নিকোলাই রোয়েরিখের অভিযাত্রা পরিকল্পনায় মঙ্গোলিয়ায় যাবার কথা ছিল, সেখান থেকে তিব্বতীয় মালভূমির পূর্বাংশ দিয়ে সিকিমে ফেরা। তবে কাশ্মীরে থাকতেই বুদ্ধ নাকি পার্বত্য আলতাইয়ে এসেছিলেন এমন একটা কিংবদন্তির নানান ভাষ্য তাঁর কানে এসেছিল। আলতাই একটা স্বল্পপরিচিত অঞ্চল, এখন মস্কো আসার পর রোয়েরিখ স্থির করলেন সেখানেই যাবেন। আলতাই যাত্রার অনুমতি পেলেন রোয়েরিখ, ভারতে ফেরার জন্য অভিযাত্রাকে সুসজ্জিত করার ব্যাপারে সাহায্যেরও আশ্বাস মিলল।

'মৈত্রেয়' সিরিজের ছবিগুলি মস্কোয় রেখে রোয়েরিখ ও তাঁর সহযাত্রীরা ফিরতি পথ ধরলেন। সোভিয়েত সীমান্ত পেরিয়ে শিল্পী প্রথম যেসব সোভিয়েত মানুষের সাক্ষাৎ পান তারপর খুব একটা সময় কাটে নি, এই সাক্ষাৎগুলো গভীর একটা রেখাপাত করে শিল্পীর মনে। ইর্তিশ হয়ে ওমস্ক্ যাত্রার কথা স্মরণ করে শিল্পী লিখেছেন:

'মাঝে মাঝে যুবক, জাহাজী, স্কুল মাস্টাররা আমাদের কেবিনে বসে আলোচনায় প্রায় রাত ভোর করত, দুনিয়ায় কী ঘটছে জানতে চাইত তার সবকিছু। জ্ঞানের এমন তৃষ্ণা সর্বদাই জনগণের জীবন্ত ভ্রূণের সেরা লক্ষণ। ভাববেন না যে প্রশ্নগুলো আদিম ধরনের। লোকে জানতে চাইছিল, বলত তাদের অতি জরুরী সব সাংসারিক কাজে তাদের চিন্তাশক্তি কতটা আচ্ছন্ন... জাহাজের ক্যাপ্টিনে ঢুকল বছর দশেকের একটি ছেলে: 'ভেতরে ঢুকলে কেউ বকবে না?' 'বকবে কেন, বস, চা খাওয়া যাক।' জানা গেল যাচ্ছে নতুন একটা জায়গায়, নতুন জীবন, সেরা ভবিষ্যতের আকুলতায় বুকে তার আগুন...'

১৯২৬ সালে অগস্টে রোয়েরিখরা পৌঁছলেন আলতাইয়ে, সেখানে পার্বত্য আলতাই আর উস্ত-কক্‌সু হয়ে এলেন উইমন উপত্যকায়, ডেরা পাতলেন উচ্চ উইমনে।

'অমায়িক কাতুন্, নীল নীল ঝঙ্কৃত পাহাড়। শাদা বেলুখা। জ্বলজ্বলে ফুল আর শান্তিবর্ষী সবুজ ঘাস আর দেবদারু। কে বললে যে আলতাই ভীষণ আর দুর্গম? কার প্রাণ আঁতকে উঠল নিস্করুণ শক্তি আর সৌন্দর্যে? ১৭ অগস্ট দেখলাম বেলুখা, কী সুনির্মল আর সঝঙ্কার। ঠিক যেন জ্ভেনিগোরদ্,' — লিখে রাখেন শিল্পী।

উচ্চ উইমনে লোকে এখনো মনে রেখেছে রোয়েরিখদের, যেখানে তাঁরা ছিলেন লোকে দেখিয়ে দেবে সেই বাসাটা।

এসব জায়গা তখন ছিল পাণ্ডববর্জিত। উচ্চ উইমনের পুরনো বাসিন্দারা আপনাকে বলবে:

'ওঁর ছেলে ইউরি লম্বা ফিলমে কেবলি ছবি

তুলত অথচ সিনেমার কথা আমাদের এখানে কেউ শোনে নি। আমরা জিজ্ঞেস করলাম: 'ওইসব ফিতে ও'র কেন দরকার?' 'সিনেমার জন্যে,' বললেন ইউরি, ওদিকে আমাদের কোনো ধারণাই নেই সেটা কী বস্তু। তখন ইউরি বললেন: 'বাড়ি ফিরে যাব যখন তখন আমাদের দেয়ালে আপনারা ছোটাছুটি করবেন!' অনেক কিছুতেই তখন অবাক হয়ে যেতাম আমরা। ভারি ভালো লোক। আমাদের এখানে ছিলেন অল্প দিন, কিন্তু ভালো কাজ করেছেন অনেক।'

অভিযাত্রী দলের মধ্যে এবার জ. লিখ্‌টেমান আর ম. লিখ্‌টেমান ছিলেন। প্রায় প্রতিদিন সবাই অশ্বারোহনে যেতেন পাহাড়ে, গ্রামের আশেপাশে। সংগ্রহ করতেন পার্বত্য শিলামূর্ত্তিকা, সমীক্ষা নিতেন প্রাচীন সমাধির, অধ্যয়ন করতেন স্থানীয় রীতিনীতি ও উপভাষা, টুকে রাখতেন সিন্ধাই, শ্বেতবন্যা, শাদা বুরখান আর তাঁর মিত্র ওইরতের লৌকিক কিংবদন্তি। স্থানীয় উপাদানের ভিত্তিতে কয়েকটি ছবি আঁকেন রোয়েরিখ: 'পাতালের সিন্ধাই,' 'ওইরত॥ আলতাই' ইত্যাদি।

কিন্তু শুধু গভীর অতীতেই রোয়েরিখের আগ্রহ ছিল এমন নয়, সাম্প্রতিক ঘটনার কথাও তিনি লিখেছেন: 'এখানে রাস্তায় অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় লাল বাহিনী। পাহাড়ের সানুদেশে লাল কমিসারদের ভূমিশয্যা। পথে কবর অনেক, তাদের কাছে বাড়ছে ঘন কচি ঘাস।'

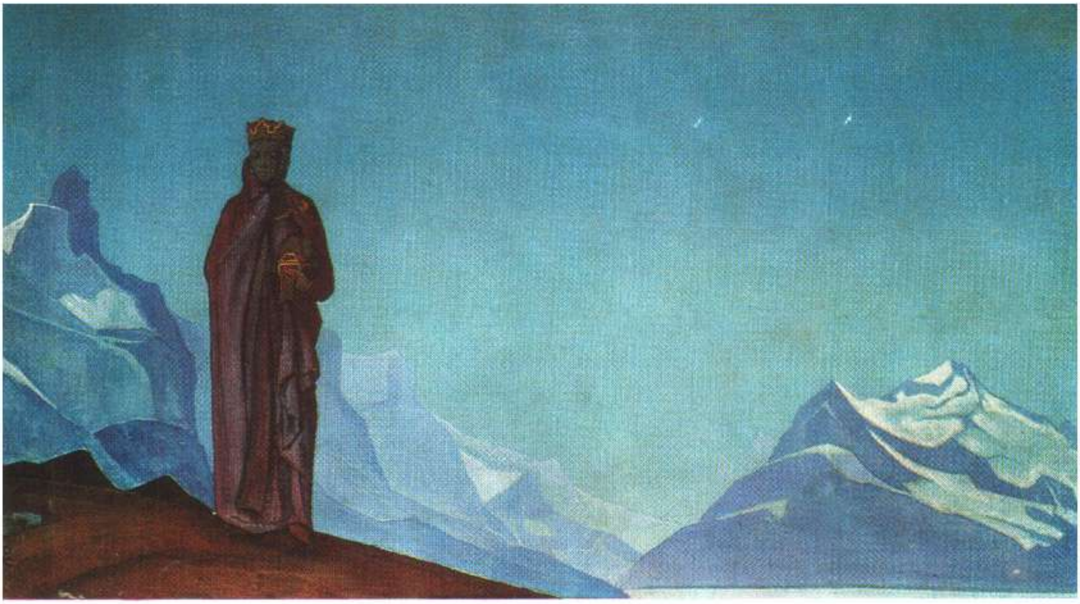
এসবের মধ্যে রোয়েরিখ দেখেছিলেন নবজীবনের বাস্তব উন্মেষ: '...নানা নবপ্রবর্তনার ফলে কুসংস্কার অনেক মিলিয়ে গেছে আর কঠোর অর্থনীতিচেতনা হ্রাস পায় নি, বরং অংকুর গজিয়েছে তার। নির্মাণকর্ম, অনুদ্‌ঘাটিত ভূগর্ভ, তেজস্ক্রিয়তা, সওয়ারীর চেয়ে উঁচু ঘাস, বন, পশুপালন, বিদ্যুতীকরণের ডাক দেওয়া গর্জিত নদী — এসবই আলতাইকে দিচ্ছে একটা অবিস্মরণীয় গুরুত্ব!'

আলতাই থেকে রোয়েরিখরা বার্নাউল, নভোসিবির্স্ক ও ইরকুৎস্ক হয়ে পেঁছিলেন উলান-উদে'তে এবং সেখান থেকে ১৯২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কিয়াখ্‌তা হয়ে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান-বাতোরের পথ ধরলেন। ইতিমধ্যেই উলান-বাতোরে প্রকাশিত হয়েছিল 'বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা', যা প্রচারিত হয় বুরিয়াতিয়ায় এবং পরে বুরিয়াতী লামাতন্ত্র নিয়ে সোভিয়েত গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে উলান-উদে'তে লেখকের সম্পর্কে কোনো খবরাখবর ছিল না, লোকে ধরে নেয় সেটি লামাতন্ত্রের 'নবীভবন' আন্দোলনের স্থানীয় অনুগামীদের লেখা। গ. সিবিকভের মঙ্গোলীয় ডায়েরিতে বইটি প্রসঙ্গে বলা হয় এটি 'প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের নীতির ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস'।

আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নে আসার কিছু আগে বইটি লিখেছিলেন ইয়েলেনা ইভানোভনা রোয়েরিখ। ঔপনিবেশিক ভারতে ফিরে বইয়ের মলাটে নিজের নাম ছাপানো তাঁর পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব ছিল, কেননা নানা কথার মধ্যে লেনিনের উচ্চ প্রশস্তি ছিল তাতে।

একই সময়ে প্রকাশিত হয় অনামা লেখকের 'গ্রামসমাজ', তার পাঠাংশে 'বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা'র একাংশ হুবহু নিবদ্ধ থাকায় অনুমান করা যায় যে এটিও লিখেছিলেন ইয়েলেনা ইভানোভনা কিংবা তাঁর সঙ্গে একত্রে নিকোলাই রোয়েরিখ।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে রোয়েরিখের ভাবনা, পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিশেবে রাশিয়ার মহিমা নিয়ে তাঁর দেশাত্মবোধ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে



বিশ্বরক্ষয়িত্রী। ১৯৩৩। বগ্‌দানোভা'র সংগ্রহ।



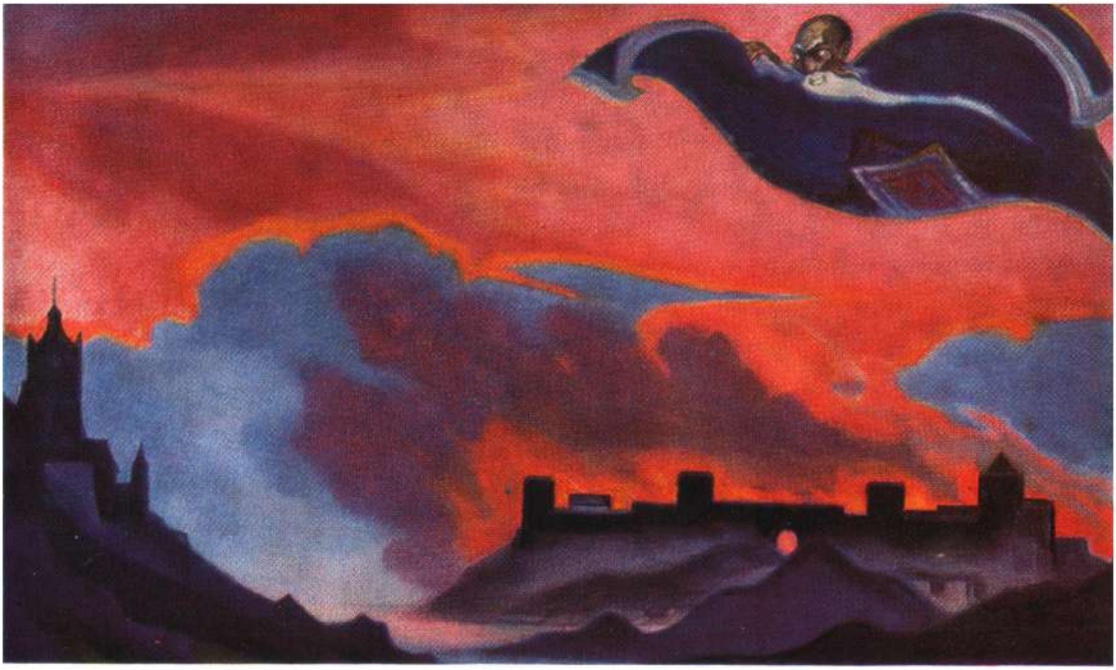
পরিনির্বাণ। ১৯৩৫—১৯৩৬। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



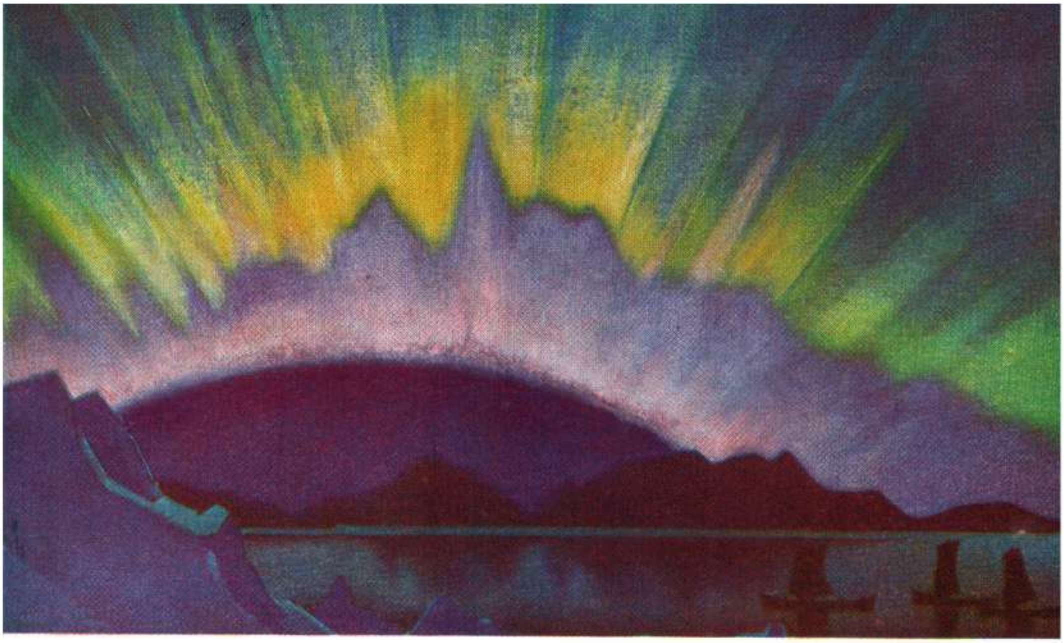
হূন সমাধি। ১৯৩৫—১৯৩৬। রাষ্ট্রীয় রূশ মিউজিয়ম,
লেনিনগ্রাদ।



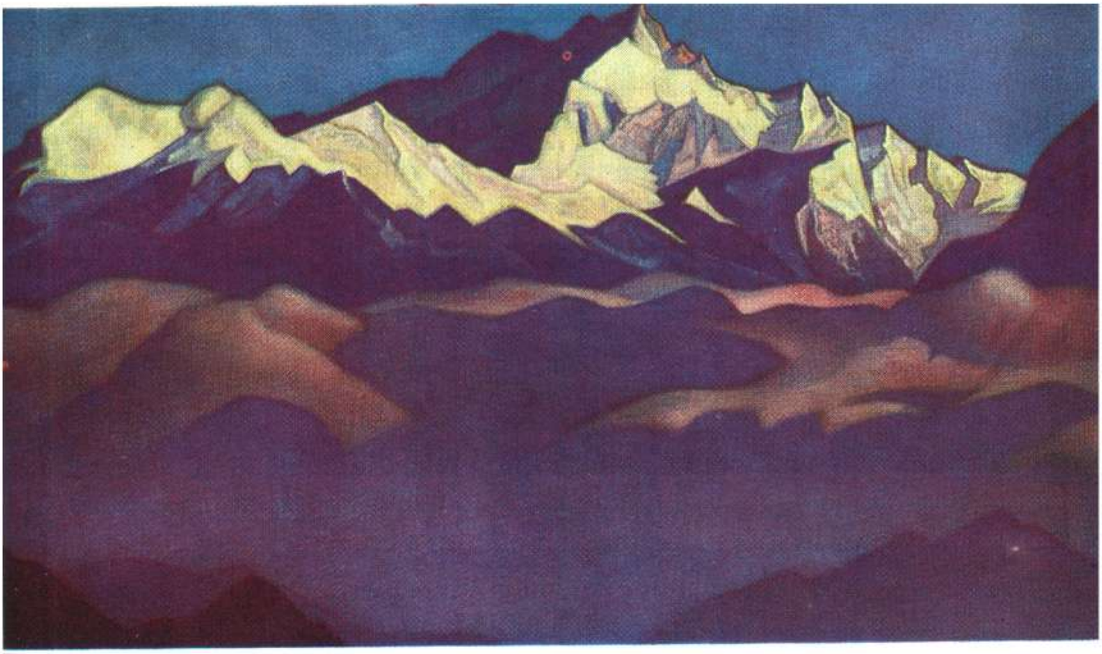
পয়গম্বর (হিরা পর্বতে মহম্মদ)। ১৯৩৮। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



উড়ন্ত গালিচা। ১৯৩৯। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



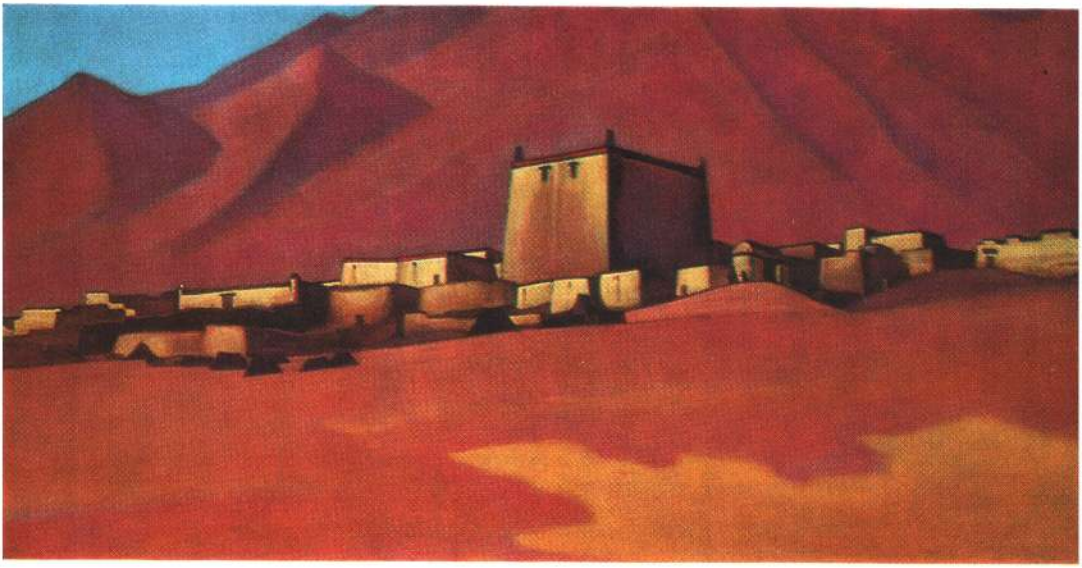
মধ্যনিশা। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



হিমানীর ধনভাণ্ডার। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



বিজয়ের আলো। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



চাটু গোম্পা। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

১৯২৬ সালে লেনিন প্রসঙ্গে লেখা তাঁর ছত্রকয়টিতে:

'সর্বাকিছু জড়ো করে তিনি প্রত্যেকটি জিনিস উপযুক্তরূপে বসিয়েছেন বিশ্ব নির্মাণে। এই সংগ্রহেই তাঁর পথ খুলে গেছে সর্ব মহাদেশে। লোকে কিংবদন্তি রচনা করছে তাঁর ক্রিয়াকলাপের বিবরণ নিয়ে শুধু নয়, প্রয়াসের উৎকর্ষ নিয়েও। আমাদের পক্ষে রয়েছে চব্বিশটি দেশ আর আমরা নিজেরাই তো সত্যিই দেখলাম জনগণ কীভাবে বুঝেছে কমিউনিজমের আকর্ষণী শক্তি। আপত্তি হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট মন্ত্রণা। প্রতিটি আপত্তির পেছনে লুকিয়ে থাকে অজ্ঞতা। আর অজ্ঞতাই হল প্রতিবিপ্লবরূপী রক্তবীজের বাসা।'

এর পর 'বলশেভিকদের কাছ থেকে রোয়েরিখের পলায়ন', 'বিশ্ব পুঁজির জন্য রোয়েরিখের সাধনা' ইত্যাকার উদ্ভট বিবৃতি শিল্পী কীভাবে নিতে পারেন তা অনুমান করা কঠিন নয়। এইসব রটনা খুবই মর্মাহত করে তাঁকে। 'দিনলিপির পাতায় তিনি লিখেছেন: 'আপনি জানেন যে কুৎসার জন্মদাতা এই অসুয়কটিকে কখনোই খুঁজে পাওয়া যাবে না। জানেন হয়ত-বা একযোগে একটা লজ্জাকর 'সৃজনই' ঘটেছে। এ সবই জানেন, কিন্তু তাতে তো মন হালকা হবে না। ভেবে কষ্ট হয়: কেন? কিসের জন্য? কী উদ্দেশ্যে?'

তাঁর 'গোপন দীক্ষা' এবং 'ধর্মত্যাগ' অর্থাৎ প্রায় বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বিষয়ে গুজবটা তিনি নিয়েছিলেন অনেক নির্বিকার চিত্তে তবে ব্যঙ্গভরে। প্রাচ্যের প্রতি শিল্পীর আগ্রহ ছিল শুধু বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে নয়, জৈন ধর্ম, যোগ, বেদান্ত, সাংখ্যের দর্শন নিয়েও। এবং বোঝাই যায় যে, শিল্পীর কথায়, যারা 'আসন পিঁড়ি হয়ে বসা প্রতিটি লোককেই বুদ্ধ' জ্ঞান করে, তাদের মতামত বিজ্ঞানী হিশেবে রোয়েরিখ গায়ে মাখতে পারেন না।

রোয়েরিখ এবং তাঁর পরিবারবর্গের ধর্মত্যাগ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল ঠিক এই ধরনের লোকে। গির্জার যাজকবৃন্দের কাছ থেকে রোয়েরিখ পরিবারের শাশ্বত সুখ অর্জনের সুযোগ ব্যাখ্যায় উৎসাহী জনৈক ব্যক্তিকে ইয়েলেনা ইভানোভনা লিখেছিলেন: '...গির্জাওয়ালাদের এড়িয়ে থাকাই যাক, সেটা আরো এই কারণে যে গির্জাওয়ালা বলতে আমি শুধু যাজকদের নয়, সমস্ত গোঁড়া আর রক্ষণশীলদেরই বুঝি যারা তাদের কুকর্ম চাপা দেয়... নতজানু প্রণাম আর ক্রুশ চুম্বনে। আমি সর্বদাই গির্জা আর তার প্রতিনিধিদের থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছি ঠিক এই ইচ্ছায় যে ছেলেদের মধ্যে স্বধর্মে শ্রদ্ধা থাক আপাতত ততদিন পর্যন্ত যতদিন না তার সবকিছু সুন্দর দিকের গুণগ্রহণ এবং নেতিবাচক দিকগুলিকে স্থিরমস্তিষ্কে দেখার মতো পূর্ণ পরিণত হয়ে তারা না উঠছে...'

রোয়েরিখ এবং প্রাচ্য নিয়ে কয়েকটি বইয়ের লেখিকা ও অনুবাদিকা তাঁর স্ত্রী কেউই তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশুদ্ধ বস্তুবাদী অবস্থান নেন নি। প্রাচ্য জনগণের মধ্যে স্বকালে যেসব ধর্মের খুবই প্রতিষ্ঠা ছিল সেগুলিকে তাঁরা খুবই মান্য করতেন। কিন্তু কোন ধর্মমতের লোক তাঁরা এই দিয়ে তাদের বিচার করেন নি, তাই 'ধর্মান্তর' গ্রহণের সমস্যা তাঁদের কাছে ছিল অবাস্তব।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি নিকোলাই রোয়েরিখের আগ্রহ মোটেই আপাতিক কিছু নয়। বিশের দশকেই রোয়েরিখ মন্তব্য করেছিলেন, 'লক্ষিত হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের মতবাদ উত্তর-পশ্চিমে এবং লেনিনের মতবাদ দক্ষিণ-পূর্বে ব্যাপ্তির প্রয়াস'।

চিচেরিন ও লুনাচারস্কির সঙ্গে আলাপে তিনি

তাঁর এই ভাবনাটা বিশদ করেন। প্রাচ্য দেশেদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও রাজনৈতিক নৈকট্যের ক্ষেত্রে রোয়েরিখের ক্রিয়াকলাপে তাঁরা সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু বলাই বাহুল্য, বৌদ্ধ ধর্মের শীলসংহতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের মিলন বিষয়ে শিল্পীর বক্তব্য কোনো সমর্থন পায় নি মস্কোয়।

তবে রোয়েরিখের এই সন্তুষ্টি ছিল যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের যেসব কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তাঁর প্রতি তাঁরা ছিলেন আস্থাশীল। তাই দেশ ত্যাগ করার সময় রোয়েরিখ আশা রেখেছিলেন যে তাঁর গবেষণা তিনি চালাবেন সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগে। তাঁর কাছে এটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উলান-বাতোরে রোয়েরিখ তিব্বতের মালভূমি ও হিমালয় হয়ে সিকিমে যাবার পথ নির্ধারণে মন দিলেন। মঙ্গোলিয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলির কথা তাঁর জানা ছিল, ১৯২৪ সালের মে মাসেই ভারত থেকে তিনি ইউরোপে লেখেন যে তিনি মঙ্গোলিয়াকে মনে করেন মধ্য এশিয়ায় বলিষ্ঠ প্রাণসঞ্চারের বাহক। আর এখন সেই বীর্যবান মঙ্গোলিয়াতেই তাঁর অভিযাত্রা। উলান-বাতোরের রাস্তায় বিপ্লবী যোদ্ধারা আবেগভরে কী একটা গান গাইত। তার কথাগুলো শুনে ইউরি রোয়েরিখ তরজমা করেন:

> চাঙ শাম্বলিন দাইন...
> উত্তর শম্বলের যুদ্ধ।
> সে যুদ্ধে প্রাণ দেব
> যাতে ফের জন্ম নিই
> শম্বলপতির সেবক হয়ে।

আলাপ করে জানা গেল গানটা মঙ্গোলিয়ার জাতীয় বীর, বিপ্লবের নায়ক সুহে-বাতোর-এর রচনা। রাশিয়ার মতো মঙ্গোলিয়াতেও নতুন জীবন পাকা ঠাঁই করে নিচ্ছে।

উলান-বাতোর ছেড়ে যাবার কিছু আগে রোয়েরিখ মঙ্গোলিয়া জনপ্রজাতন্ত্রের সরকারকে উপহার দেন 'রিগদেন জাপো — শম্বলপতি' ('মহা অশ্বারোহী') ছবি। এটি 'শম্বল আসছে' ছবির প্রায় হুবহু পুনর্চিত্রণ তবে মঙ্গোল রীতিতে, বর্ণাভাস বিনা উজ্জ্বল বিশুদ্ধ রঙে আঁকা। শুধু ছবির নিম্নাংশে রোয়েরিখ এবার আঁকলেন বগদো-উলা পাহাড়ের পদতলে বৃহৎ প্রান্তর-সমাবেশ। ছবিটি দেবার সময় শিল্পী বলেছিলেন:

'নবযুগের পতাকাতলে মঙ্গোল জনগণ তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে। মুক্তির মহান অশ্বারোহী তার বিস্তারে ধাবমান... কার্যকরী সম্মেলনে মহান হুরালদান রচনা করছেন নতুন জনজীবনের সিদ্ধান্ত। সজোরে ধ্বনিত হচ্ছে অপরূপ লাল অশ্বারোহীর আহ্বান। এশিয়ার শ্রীবৃদ্ধির কালে সেরা উপহার বলে গণ্য হত শিল্পসামগ্রী বা গ্রন্থ। আবার ফিরে এসেছে এশিয়ার সেকাল...'

মঙ্গোল সরকারের সভাপতি সেরেনদোর্জ, যিনি একসময় সুহে-বাতোরের সঙ্গে লেনিনের কাছে এসেছিলেন মস্কোয়, রোয়েরিখের জবাবে বলেন:

'আমাদের সাধারণ গুরু লেনিনের ভাবনা এই ছবিতে আঁকা শিখার মতো সারা পৃথিবীতে ছড়াক এবং যে মরদেরা সে মতবাদ অনুসরণ করছে তারা যেন তাদের কাজ চালিয়ে যায় ধাবমান মহা অশ্বারোহীর মতো দৃঢ়তায়।'

ইতিমধ্যে সোভিয়েত প্রতিনিধির সক্রিয় অংশগ্রহণে উলান-বাতোরে অভিযাত্রার প্রস্তুতি চলছিল সামনের অভিযানের জন্য। রোয়েরিখ

পেলেন অভিযাত্রার সোভিয়েত পাসপোর্ট এবং মঙ্গোল সরকারের আরক্ষা পত্র।

তিব্বত এবং চীনা ভূখণ্ডের মধ্যে যাবার জন্য আগেই দুটি পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছিলেন রোয়েরিখ। লাটসায়েব ইয়ান দুতু খোটান অভিযাত্রার সদস্যদের প্ররোচনামূলক যে গ্রেপ্তার তাঁর অজ্ঞাতসারে হয় নি, তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্য রোয়েরিখকে বলেন যে ব্যাপারটার জন্য প্যারিসের চীনা রাষ্ট্রদূত দায়ী, কেননা যে পাসপোর্ট তিনি দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট সম্পূর্ণাকারে নয়। চীনা এলাকায় এরকম 'ভুল বোঝাবুঝি' এড়াবার জন্য ইয়ান দুতু সৌজন্য সহকারে একটি নতুন পাসপোর্টের প্রস্তাব দেন যার সম্পূর্ণতা বিষয়ে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ ছিল না, কেননা কুণ্ডলী খোলার পর তার দৈর্ঘ্য দেখা গেল স্বয়ং নিকোলাই রোয়েরিখের সমান।

কিন্তু রোয়েরিখকে যেতে হত এমন ভূখন্ড দিয়ে যা লাসার অধীনস্থ। উলান-বাতোরে ছিলেন লাসার প্রতিনিধি লবজাঙ্গ চলদোন। তিনি আশ্বাস দিলেন, গোটা তিব্বতেই অভিযানের পথ উন্মুক্ত। তাহলেও তিক্ত অভিজ্ঞতায় ঠেকে শিখে রোয়েরিখ অনুরোধ করলেন, লাসার সঙ্গে যোগাযোগ করে সরকারী দলিল দেওয়া হোক তাঁকে। এই উপলক্ষে তিব্বতী কারাভানের সঙ্গে একটি বিশেষ জিজ্ঞাসা পাঠানো হয় লাসায়, পিকিঙে লাসার প্রতিনিধির কাছেও অনুরূপ জিজ্ঞাসা যায়। সেখান থেকেও পাওয়া গেল সুবিস্তৃত একটি দলিল যাতে লাসায় থেমে তিব্বতের মধ্যে দিয়ে যাবার অনুমতি মিলল।

এইখানেই শেষ হল অভিযাত্রার প্রস্তুতি। তার সমস্ত সভ্যদের মধ্যে গোটা পথটা পাড়ি দিয়েছিলেন কেবল রোয়েরিখ নিজে, তাঁর স্ত্রী আর পুত্র ইউরি। মোটামুটি তিন বছরে তাঁরা অতিক্রম করেন পঁচিশ হাজার কিলোমিটার। এত দীর্ঘ পথে এমন লোক জোটানো ছিল অসম্ভব যারা বিনা বদলিতে বরাবর চলবে। তাই এক-একটা পর্যায়ে বদলাতে হত সহযোগী। পথের প্রায় গোটা প্রথমার্ধটা যায় লামা লবজাঙ্গ, তিব্বতী তুম্বাল, চীনা সাইকেন হো, লাদাকী রামজানা, অসুস্থতার জন্য সে রোয়েরিখদের কাছ থেকে বিদায় নেয় কেবল আলতাইয়ে। উলান-বাতোরে অভিযাত্রায় যোগ দিলেন ডাক্তার রিয়াবিনিন, পরিবহণ অধিকর্তা পোর্তনিয়াগিন এবং জনকয়েক বুরিয়াতী লামা। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানগুলোর সময় সাধারণত যোগাযোগ করা হত স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। সংক্ষিপ্ত পর্যায়গুলোতে পথপ্রদর্শক আর গাইড সংগ্রহ করা হত স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে। কারাভানের বহর ছিল শতখানেক পর্যন্ত ভারবাহী পশুর উপযোগী, ফলে তা জোটাতে সময় লেগে যেত অনেক।

১৯২৭ সালের ১৩ এপ্রিল উলান-বাতোর ত্যাগ করে অভিযাত্রা এগুতে থাকল দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়ে মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত চৌকি ইউম-বেইসে মঠের দিকে। এই পর্যায়টা মোটরগাড়িতে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। অবিশ্যি রাস্তা বলতে তেমন কিছু ছিল না। কোথাও কোথাও উট যাবার হাঁটা পথ, কোথাও আবার গাড়ি ছুটত স্রেফ অহল্যা ভূমির ওপর দিয়ে। বারো দিনে তাঁরা পাড়ি দেন ছয় শ' মাইল। পথের প্রথম ধাপেই দুটি করুণ অবস্থার মধ্যে পড়েন রোয়েরিখ। দেখা গেল, এ অঞ্চলের যত মানচিত্র ছিল সবই নিতান্ত আপেক্ষিক, আর স্থানীয় পথপ্রদর্শকদের ওপর ভরসা করা কঠিন। তাঁদের গাইড বুদ্ধি খাটিয়ে কারাভানকে যে ইউম-বেইসে মন্দিরে নিয়ে গেল তা বহুকাল আগে থেকেই ভগ্নাবস্থায়। বর্তমানটা ছিল প্রায় ৫০ মাইল পুবে। তাহলেও কোনোক্রমে যাওয়া গেল সেখানে।

ইউম-বেইসের পর মোটরে করে আর এগ্নো সম্ভব ছিল না। স্থানীয় মঠের কর্তারা বললেন, নিজেদের উটে তাঁরা পরিব্রাজকদের পেশছে দেবেন সোজা আনসি পর্যন্ত। এই খাটো পথটা ইউরোপীয় পর্যটকেরা আগে কখনো ব্যবহার করে নি। একসময় এটা গিয়েছিল অধ্না-বিল্প্ত 'দ্বীপাশ্রিত' মর্দ্যান দিয়ে, রোয়েরিখের কাছে তা কৌত্হলোদ্দীপক এইজন্য যে ওখানে বাসা পেতেছিল যাযাবরেরা। তাদের চিহ্নাদি আবিষ্কারের আশায় রোয়েরিখ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, বৃদ্ধ লামার সঙ্গে রওনা দিল অভিযাত্রা, একমাত্র সেই জানত পথটা।

নির্বাচিত পথটার তারিফ করলেও লামা একটা বিপদ সম্পর্কে হ্শিয়ারি দিয়ে রাখল: মঙ্গোলদের হাতে দ্'বছর আগে নিহত দ্র্দান্ত দস্যু জেলামার* অন্চররা ঘ্রে বেড়ায় এখানে। দস্যু মধ্য গোবি মর্ভূমিতে প্রো একটা নগর বানিয়েছিল নিজের, শত শত বন্দী খাটত সেখানে। এখন সবাই নগর ছেড়ে গেছে, কিন্তু জেলামার সাঙ্গোপাঙ্গরা মাঝে মাঝে বাহিনী নিয়ে এসে জোটে এখানে, হানা দেয় কারাভানে।

পরিত্যক্ত শহরটা বৃদ্ধ লামার কল্পনা নয়। অচিরেই তার কাছাকাছি এসে গেল অভিযাত্রা। জেলামা সম্পর্কে ভীতি ছিল এতই প্রবল যে কারাভানের কেউই নিস্তব্ধ নগর প্রাচীরের কাছে যাবার সাহস করলে না। তখন প্ত্র ইউরি রোয়েরিখ কারবাইন বন্দ্ক হাতে এগিয়ে গেলেন সন্ধান করে দেখতে, কিছ্ক্ষণ পরে ব্র্জ থেকে সংকেত দিয়ে জানালেন যে কোনো বিপদ নেই। জনহীন শহরটায় এল অভিযাত্রার সমস্ত লোক। বিখ্যাত দস্যুর কল্পনার বহর অবাক করার মতো, কিন্তু কী ম্ল্যেই না মাথা তুলেছে জটিল সব নির্মাণ।

একুশ দিনের মধ্যে জনহীন পথে সাক্ষাৎ মেলে শ্ধ্ একটি কারাভানের, সেটাও যাচ্ছিল আড়াআড়ি পথে কোকোখোতো থেকে খামি'র দিকে। এ সাক্ষাতে প্রায় সশস্ত্র সংঘর্ষের উপক্রম হয়েছিল। কারাভানের মালিক চীনা সওদাগর অভিযাত্রাকে দস্যুবাহিনী ভেবে নিজের একটি মাত্র বন্দ্ক থেকে গ্লি ছোড়ে। ভাগ্যি ভালো যে অভিযাত্রার রক্ষিদলের অধিনায়ক ইউরি রোয়েরিখ গ্লির জবাব দেন নি, ফলে এড়ানো যায় একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার।

তবে আতঙ্কিত সওদাগরের আচরণটা দ্র্বোধ্য নয়। কে জানে কোথা থেকে এক-একজন ঘোড়সওয়ার এসে জ্টত রোয়েরিখের অভিযাত্রায়। ওদের সবচেয়ে বেশি নজর ছিল অভিযাত্রার অস্ত্রশস্ত্রে। আর তা যে আছে বেশ ভালোরকম, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে তারা যেমন এসেছিল তেমনি উধাও হয়ে যেত হঠাৎ। বোঝা যায়, খবরাখবর জানতে লোক পাঠাত যেসব বাহিনী তাদের শক্তি ছিল সামান্য।

আনসি পেরিয়ে অভিযাত্রা চলল উচ্চপার্বত্য চারণভূমি শারা-গোলে। নদীর তীরে ছাউনি ফেলে এখানে তা থাকে ১৯২৭ সালের জ্ন আর জ্লাই। অভিযাত্রার কোনো কোনো দল বৈজ্ঞানিক মালমশলা সংগ্রহের জন্য ছাউনি ছেড়ে চলে যেত সাইদামের বিভিন্ন এলাকায়। তখন ছাউনিতে চলত আরো যাত্রার প্রস্তুতি। ইউম-বেইসে থেকে আসা উটগ্লো তাদের সহিস সমেত ফিরে গেছে, প্রয়োজন ছিল নতুন পশ্ জোগাড় করা, রসদের ঘাটতি প্রানো।

ছাউনির মাপা তালের জীবন প্রায়ই তছনছ

---

* জেলামা (জে-লামা) জাম্বা-জাম্ৎসান, জাতিতে কালমিক। নিজেকে 'মঙ্গোলদের ম্ক্তিদাতা' বলে ঘোষণা করে একটা দস্যুদল জোটায়, যারা ল্ট করত পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার গ্রাম।

হত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। বিশেষ স্মরণীয় ২৮ জুলাইয়ের দিনটা। সবাই নিশ্চিন্তে খেতে বসবে এমন সময় পাহাড়ের ফাটল থেকে ঝরঝরিয়ে নেমে এল দেড় মিটার গভীর তরঙ্গের জলস্রোত, রান্নাঘর আর খেতে বসার জন্য তৈরি টেবিল ভাসিয়ে নিয়ে গেল নদীতে, চোখের সামনে নদীও পরিণত হল এক উত্তাল ঝোরায়। ঘণ্টা দুয়েক পরে স্রোত কমতে লাগল আর সকাল বেলায় চমৎকৃত পর্যটকদের সামনে দেখা দিল এক অপরিচিত দৃশ্য। যেখানে ছিল টিলা সেখানে স্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া এক গভীর গহ্বর আর নাবালগুলোয় মাথা তুলেছে ঢিবি।

শম্বল কথার সঙ্গে সঙ্গে রোয়েরিখের আগ্রহ ছিল গেসের-গাথা মহাকাব্যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাকে বলেছেন মধ্য এশিয়ার ইলিয়াড। এ কাব্য নানা ভাষ্যান্তরে উত্তর ভারত থেকে আমুর, চীনের মহাপ্রাচীর থেকে লেনা নদীর তীর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। এবার অভিযাত্রা সেই জায়গা দিয়ে গেল যেখানে এগারো শতকের গোড়ায় লোককথার বীর গেসের খাঁ, কিংবদন্তি অনুসারে ক্রীতদাসীর পুত্র, স্থানীয় সামন্ত আর পরদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত অধিবাসীদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন।

বলাই বাহুল্য যে ঐতিহাসিক গেসের খাঁ আর কাব্যের যে গেসের-গাথায় কথকদের লেগে যেত বেশ কয়েক সপ্তাহ, তার মধ্যে তফাৎ অনেক। খুবই সম্ভব যে 'সম্ভ্রান্তদের মাথা নত করে আর্তদের সহায় ও সম্বল' হবার যে ব্রত গ্রহণ করেছে কাব্যের নায়ক, আসলে প্রভুত্বকারী খাঁ জনগণের জন্য সংগ্রামে তেমন কিছু গণতান্ত্রিক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন এমন নয়। কার্যত যিনি দেশ শাসন করেছিলেন সে গেসের খাঁ-য়ের কীর্তিকলাপ বহুকাল আগেই মিলিয়ে গেছে লোকনায়কের মূর্তিতে। রোয়েরিখ মনে করতেন, একটা শ্রেয় ভবিষ্যতের জন্য জনগণের অদম্য কামনাতেই গেসের-গাথা অত প্রচার পেয়েছে।

'স্পন্দিত হচ্ছে কি এশিয়ার বক্ষস্থল? তা কি চাপা পড়েছে বালুকণায়?' স্থলভাগের মধ্যাঞ্চলে মরুভূমিতে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন শিল্পী। আর মরু পেরিয়ে উত্তর দিয়েছেন: 'ভারতীয় যোগী যখন সমাধির অবস্থায় যায়, তখনো তার হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া চলতে থাকে। এশিয়ার হৃৎপিণ্ডের ব্যাপারটাও তাই। মরুদ্যান, চারণক্ষেত্র, কারাভানে আছে এক স্বকীয় চিন্তা। বহির্বিশ্ব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এইসব অসংখ্য লোক বেশ কয়েক মাস বাদে কোনো একটা বিকৃত খবর যারা পায়, তারা মারা যাচ্ছে না। সভ্যতার প্রতিটি চিহ্নকে তারা নেয় দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সংবাদ হিশেবে।'

রোয়েরিখের অভিযাত্রায় নির্ণীত হয় যে গেসের-গাথার সম্পূর্ণ তিব্বতী ভাষ্যে আছে ১৬ খণ্ড, প্রতিটি খণ্ডের অধ্যায় কয়েক শত পাতা নিয়ে। অসংখ্য মঙ্গোল, বুরিয়াত, চীনা ভাষ্যেরও নিরীক্ষা ও তুলনা করতে হয়েছে অভিযাত্রীদের। পূর্ব তিব্বতে নিকোলাই রোয়েরিখ যে গেসের-গাথার ভাষ্য আবিষ্কার করেন তা ১৯৪১ সালে প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ র. স্তেইন ব্যবহার করেন তাঁর গবেষণায়। এ মহাকাব্যের সোভিয়েত গবেষক, মঙ্গোলবিদ স. দামদিনসুরেনও তাঁর 'গেসের-গাথার ঐতিহাসিক মূল' নামক বনিয়াদী গ্রন্থে (সোভিয়েত বিজ্ঞান অকাদেমির প্রকাশালয় থেকে ১৯৫৭ সালে মুদ্রিত) বারম্বার নিকোলাই ও ইউরি রোয়েরিখের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ও তাঁদের সংগৃহীত তথ্য পেশ করেছেন।

প্রবল জঙ্গী উপজাতি পশ্চিমী কারলুকদের বিরুদ্ধে ১০১৪ সালে গেসের খাঁ যেখানে বিদ্রোহ করেছিলেন, ১৯ অগস্ট অভিযাত্রা সে জায়গাটা ছেড়ে তিব্বত মালভূমি দিয়ে সোজা পথে রওনা

দেয় নাগচু'র দিকে। ১৮৮০ সালে প্রজেভাল্‌স্কি যে কারাভান পথ দিয়ে গিয়েছিলেন, এটা তার সমান্তরাল একটা নতুন পথ। প্রজেভাল্‌স্কি নাগচু পর্যন্ত যান নি, ফিরে আসেন। রোয়েরিখ ঠিক করলেন, মধ্য এশিয়ার স্বনামধন্য রুশী গবেষক প্রজেভাল্‌স্কি ও কজলোভের কাজটা সম্পূর্ণ করে তিব্বতের মালভূমি পেরবেন লাসা হয়ে।

যে পথ রোয়েরিখ ঠিক করেছিলেন সেটা সংক্ষিপ্ত হলেও বিপজ্জনক। পথে পড়ত সাইদাম নোনা ডাঙা, সেখানে ঘাঁটি গাড়া খুবই মুশকিল। তাই বিশ্রাম না নিয়ে যেতে হয় সারা দিন-রাত। তাহলেও সংকটটা কাটল বিনা লোকসানেই।

পরের পর্যায়ে এল্‌মস্তে-দাবান গিরিসংকটের কাছে হানা দেয় গলোকরা। মধ্য এশিয়ার জঙ্গী সন্তানদের ধূর্ততা যখন প. ক. কজলোভ নিজের অভিজ্ঞতায় টের পেয়েছিলেন, মনে হয় তখনো তাদের রীতিনীতি বদলায় নি। খাদ থেকে বেরুবার মুখে গলোকরা হাতিয়ার সমেত হামলার জন্য তৈরি ছিল। কিন্তু অভিযাত্রার সন্ধানীরা সময়মতোই তাদের খোঁজ পায়। উলান-বাতোরেই ইউরি রোয়েরিখ যাদের তালিম দিয়েছিলেন, তেমন একটা সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তিনি হানাদারদের এড়িয়ে একটা টিলায় গিয়ে গুলি চালাতে থাকেন তাদের পশ্চাদ্‌ভাগে। পথ ছেড়ে দিতে হল শত্রুদের, গিরিসংকট দিয়ে অভিযাত্রা পোঁছল তিব্বতের উত্তর মালভূমিতে।

এখানে ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে শুরু হয় বজ্রঝঞ্ঝা আর প্রচুর তুষারপাত যা এ ঋতুর পক্ষে অস্বাভাবিক। ২০ সেপ্টেম্বর অভিযাত্রা পোঁছয় তিব্বতের প্রথম সীমান্ত ঘাঁটিতে, উলান-বাতোরে লাসার প্রতিনিধি প্রদত্ত পাসপোর্ট এখানে পেশ করলেন রোয়েরিখ।

পাসপোর্টের ব্যাপারে এবং সাধারণভাবেই অক্ষরপরিচয়ে ঘাঁটির কম্যান্ডারের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল না। স্রেফ পাসপোর্টটা নিয়ে সে বললে যে 'ওপরওয়ালাদের কাছে' পাঠাবে, অভিযাত্রা নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ৬ অক্টোবর চুনারকেনের সীমান্তদেশে রোয়েরিখের কারাভানকে আটকাল তিব্বতী সৈন্য এবং স্থানীয় খোর-পা যাযাবরেরা, যারা ছিল পশ্চিম খোর প্রদেশের অধিকর্তার অধীনে, অর্থাৎ লাসার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর অংশ।

দিন কয়েক পরে সীমান্তের অধিকর্তা জেনারেল অভিযাত্রাকে তাঁর হেড কোয়ার্টারের কাছাকাছি সরে আসার প্রস্তাব দিলেন এবং সত্যিকারের কূটনীতিকের মতো সৌজন্য সহকারে জানালেন যে নির্দেশ অনুসারে কারাভানকে যাচাই করতে হবে এবং সেটা করবেন তিনি নিজে, কেননা 'ছোটো লোকেরা বড়ো লোকেদের জিনিস হাত দিয়ে ছোঁবে' সেটা অনুচিত। বলা হল এতে তিন দিনের বেশি সময় লাগবে না এবং কারাভানের যাত্রার অনুমতিপত্র তৈরি না হওয়া পর্যন্ত হেড কোয়ার্টার ছাড়বেন না তিনি।

নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী বখশিস চেয়ে জেনারেল উধাও হয়ে গেলেন এক হপ্তা বাদে, তাঁর জায়গায় রেখে গেলেন এক মেজরকে। কাটতে লাগল দিনের পর দিন।

স্বয়ং দালাই লামার বিশ্বস্ত পাত্র নাগচুর লাটের সঙ্গে রোয়েরিখের পাঁচ মাস যাবৎ কথোপকথনের একমাত্র মধ্যস্থ ছিল এই সন্দানেশাতুর মেজর। তার মারফত চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠানো হয় কলকাতায় মার্কিন কনস্যুলেটে, সিকিমে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাছে, লাসায় খোদ দালাই লামার নিকটে। সবই ফেরত আসে।

ইতিমধ্যে শুরু হল সুকঠোর শীত। স্থানীয় যে অধিবাসীরা উষ্ণ ছাউনিতে থাকত তাদের পক্ষেও সে শীত সহ্য করা মুশকিল ছিল, আর অভিযাত্রার

ছিল কেবল হালকা গ্রীষ্মকালীন তাঁবু। শেষ হয়ে আসছিল খাবার, পশুদের আহার। উটেরা রোজ রাত্রে যেন পরিত্রাণের আশায় আসত তাঁবুর কাছে, সকালে দেখা যেত তারা মরা, সরিয়ে ফেলা হত ছাউনির বাইরে, যেখানে বুনো কুকুরের পাল আর শকুনেরা থাকত অদের অপেক্ষায়। লোকে রোগে পড়ত। ডাক্তার খেপে উঠত, বলত যে লাসার কর্তারা ইচ্ছে করে অভিযাত্রার লোকেদের মারতে চাইছে। শেষ হয়ে আসছিল ওষুধ-পত্র। আর শীত এমন যে চলমান ঔষধালয়ে জমে যেত কনিয়াক।

কিন্তু নিকোলাই রোয়েরিখ আর ইয়েলেনা ইভানোভনা মনোবল হারান নি, আর তাঁদের দেখে গোটা অভিযাত্রাই টিকে রইল। এমনকি বৈজ্ঞানিক কাজও থামে নি একদিনের জন্যও। কাছাকাছি এলাকাগুলোয় সন্ধান চলত, আঁকা হত ছবি, ছক করা হত পরিকল্পনার, ভরে তোলা হত মণিক ও উদ্ভিদের সংগ্রহ। শীত যাপনের সময় যাযাবর খোর-পা-দের বিষয়ে সংগৃহীত হয় অতি বিরল সব তথ্য। এরা কথা কইত একান্ত প্রাচীন তিব্বতী উপভাষায়। কাছের মঠগুলোয় আবিষ্কৃত হয় প্রাক্‌বৌদ্ধ তিব্বতী ওঝা-তন্ত্রের পাণ্ডুলিপি। তিব্বতের যাযাবর অতীতের অনেক স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করে অভিযাত্রা। তার ভেতর ছিল এমন সমাধি যা স্থানীয় যাযাবরদের কাছে একেবারে অজানা। 'পাষাণ সমাধি' ধরনের এমন কবর পাওয়া যায় যা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দেখেছিলেন কেবল উত্তর মঙ্গোলিয়া, বুরিয়াতিয়া আর আলতাইয়ে। খোর প্রদেশে যাযাবরদের অলংকৃত পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রে আবিষ্কৃত হয় তথাকথিত 'জান্তব' শৈলী, যা শক-সাইবেরীয় রীতির কাছাকাছি।

সমস্ত দুরূহতা আর মারাত্মক বিপদ সহ্য করে অভিযাত্রা বসন্তের উষ্ণ মাসগুলো পর্যন্ত কাজ করে যায়, তবে শোকাবহ ক্ষয়ক্ষতি বিনা নয়। শীতে অসুস্থ হয়ে মারা যায় পাঁচ জন লোক। টেঁসে যায় প্রায় সবকটি উট, শ' দুয়েকের মধ্যে বেঁচে থাকে কেবল দশটি, তাও কোনোক্রমে, আরো যাত্রার সামর্থ্য ছিল শুধু দু'টির। তাপমাত্রার প্রখর ওঠা-নামায় নষ্ট হয়ে যায় সিনেমার ফিল্ম। তাহলেও অধিকাংশ সংগ্রহ, স্কেচ ও ছবি (প্রায় ৫০০টি) টিকিয়ে রাখা গিয়েছিল।

শুধু ১৯২৮ সালের ৪ মার্চ অভিযাত্রা ডেরা ছাড়ার অনুমতি পেল। এখান থেকে নাগচু কেল্লা মাত্র দু'দিনের পথ, রোয়েরিখের মতো কয়েকটা কারাভানের বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাবার মতো প্রাচুর্য সেখানে অঢেল। নাগচুতে তখন ছিল দু'জন তিব্বতী লাট এবং তিব্বতী ফৌজের উচ্চপদস্থ অফিসাররা। তাঁরা রোয়েরিখকে জানালেন যে উলান-বাতোরে প্রদত্ত তিব্বতী পাসপোর্ট লাসার সরকার অগ্রাহ্য করেছেন এবং অভিযাত্রাকে অনুমতি দিচ্ছেন না লাসায় যাবার যা ওখান থেকে ২০০ কিলোমিটারেরও কম। লাসার অনেক পশ্চিমে একটা ঘুরপথ দেখানো হল রোয়েরিখকে। নাগচুর লাটের সঙ্গে রোয়েরিখের ব্যক্তিগত আলাপে বিশেষ কিছুই স্পষ্ট হল না। শুধু এইটুকুর ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে 'লাল'দের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে তাঁকে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং সেই কারণে প্রাপ্ত নির্দেশ লাট দৃঢ়ভাবে পালন করবেন, কারাভানকে যেতে দেবেন না তিব্বতের গভীরে।

দেখা গেল, খোদ মঙ্গোলিয়া থেকে যেসব বৌদ্ধ কারাভানের সঙ্গে এসেছিল, তাদের মধ্যে প্রচার চলেছিল প্রচণ্ড। নানা প্রকার সৌভাগ্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তাদের, লাসায় তীর্থযাত্রার অনুমতিও মিলেছিল, তবে এই সর্তে যে 'লাল রুশী'টাকে তারা ছেড়ে যাবে।

অথচ ওই সময়েই কে জানি গুজব ছড়ায় যে 'রোয়েরিখের সম্মানে দালাই লামা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে', এই উপলক্ষে শিল্পী 'নিজের ঢাক

নিজে পিটিয়েছেন'। বিদ্যুদ্বেগে সব জল্পনা পৌঁছয় সংবাদপত্রে। 'দিনলিপির পাতায় রোয়েরিখ লিখেছেন:

'লন্ডনে কথা রটেছিল যে আমরা দালাই লামার সমস্ত ধনসম্পদ সমেত তাকে বন্দী করেছি। দালাই লামাকে আমরা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিই, কিন্তু তার অগাধ ঐশ্বর্য রেখেছি নিজেদের কাছে। এমন আষাঢ়ে গল্পে বয়স্ক লোকেদেরও ঘেন্না হয় না... লন্ডনে ব্যারন মিলিউকোভ খুব বিশ্বাসভরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'আচ্ছা, রোয়েরিখের শুধু চাউনিতেই চুল পেকে যায় নাকি?' এই হল আপনাদের দুমার প্রতিনিধি, সত্যিই আমরা বাস করছি কোন এক অন্ধকার মধ্যযুগে। যেমন, হারবিনে কোন এক 'বুদ্ধিজীবী মহিলা' আমায় দেখেছেন সুঙ্গারি নদীর জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে — এটা তিনি শপথ করে বলেছেন। নিজের এমন বিজ্ঞাপন কি আমি নিজে দেব?'

১৯২৮ সালের ৬ মার্চ রোয়েরিখের কারাভান নির্ধারিত পথে রওনা দিল। ভারতে ফেরা তিনি দুমাস পিছিয়ে দিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্পকর্মের দিক থেকে এটা ছিল আগ্রহজনক। হিমালয়ের উত্তর শৃঙ্গ পর্যবেক্ষণের সুযোগ কাজে লাগান রোয়েরিখ, রুশী পর্যটকেরা ততদূর কখনো যান নি, পশ্চিম ইউরোপীয়রাও বিশেষ দৃক্‌পাত করেন নি এদিকে। দরিঙ্গ-এ রোয়েরিখ মেয়েদের এমন একটি শিরোভূষণ আবিষ্কার করেন যা তিব্বতের পক্ষে অস্বাভাবিক। এটা অনেকটা স্লাভ শিরোভূষণের মতো, লাল রঙ, ফিরোজা পাথর, রুপোর মুদ্রা আর পুঁতি দিয়ে সাজানো। আর ইউরি রোয়েরিখ অনেক তিব্বতী উপভাষার পরিচয় নেন, লাসার মূল ভাষা থেকে তা এতই পৃথক যে লাসাবাসীর কাছে এসব ভাষা দুর্বোধ্য।

স্বল্পজ্ঞাত এই সব অঞ্চল নিয়ে খাটলেও তিব্বতের আধুনিক জীবনের সঠিক মূল্যায়নে অসুবিধা হয় নি রোয়েরিখের। তখনই তিনি দালাই লামার 'দিগ্বিজয়ী' ক্ষমতার অমোঘ ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। 'তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম' প্রবন্ধে ১৯২৮ সালে তিনি লিখেছিলেন: 'যদি ভাবেন যে দালাই লামার আদেশ লাসার প্রাচীরের ওপারেও শিরোধার্য তাহলে ভুল করবেন।' তিব্বতের বৌদ্ধ যাজক সম্প্রদায়ের হতবুদ্ধিকর অজ্ঞতা আর অর্থলোলুপতার দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েছেন এই প্রবন্ধেই।

পূর্ব তিব্বতের পথে আড়াই মাস কাটিয়ে অভিযাত্রা সেপোলা গিরিসংকট দিয়ে হিমালয় পেরিয়ে নেমে আসে সিকিমের রাজধানী গ্যাঙ্গটকে এবং অবশেষে ১৯২৮ সালের ২৮ মে পৌঁছয় দার্জিলিঙে, ১৯২৫ সালের মার্চে যেখান থেকে রোয়েরিখের যাত্রারম্ভ। অভিযাত্রা সম্পর্কে নিজেই তিনি লিখেছেন:

'বলাই বাহুল্য, শিল্পী হিশেবে আমার প্রধান তাগিদ ছিল শিল্পকর্ম। সমস্ত শিল্পীয় রেখাপাত ও অভিজ্ঞতা কবে মূর্তিময় করে তুলতে পারব বলা কঠিন — এশিয়ার এ দাক্ষিণ্য এতই বিপুল... শিল্পের এই কাজটা ছাড়াও মধ্য এশিয়ার প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলির পরিচয় গ্রহণ, ধর্ম ও রীতিনীতির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, জনগণের বিপুল স্থানান্তর গমনের চিহ্ন নিরীক্ষাও আমাদের অভিযাত্রার লক্ষ্য ছিল। এই শেষোক্ত কাজটা বহুকাল থেকেই আমার প্রিয়। কজলোভের হালের আবিষ্কারে, প্রফেসর রস্তোভৎসেভ, ব্রভকা, মাকারেঙ্কো, তোল এবং আরো অনেকের রচনায় আমরা দেখি শক, মঙ্গোল এবং গথ স্মৃতিচিহ্নে বিপুল আগ্রহ। সাইবেরিয়ার প্রাচীনত্ব, মিনুসিনস্ক, আলতাই, উরালে জনগণের বিপুল স্থানান্তর গমনের চিহ্ন থেকে সারা ইউরোপের রোমক ও আদি গথিক সভ্যতার ক্ষেত্রে অসাধারণ

সমৃদ্ধ শিল্পীয়-ঐতিহাসিক মালমশলা পাওয়া যায়।'

এই সমস্ত লক্ষ্যই সিদ্ধ করেছেন রোয়েরিখ। শুধু তাই নয়, উলান-বাতোর থেকে গোবি, নান-শান, সাইদাম এবং পূর্ব তিব্বত হয়ে ভারত — তাঁর অভিযাত্রার এই শেষার্ধকে বলা যায় মধ্য এশিয়ার রুশী গবেষকের এক সত্যকার বিজয়। মানচিত্রে প্রথম নিবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট হল বিস্তর গিরিশৃঙ্গ আর গিরিসংকট, লেখা হল বিজ্ঞানে অজ্ঞাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিচিহ্নের কথা, পাওয়া গেল বিরলতম সব পাণ্ডুলিপি, সংগৃহীত হল জাতীয় রীতিনীতির বিবরণ, সমৃদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক মালমশলা।

অভিযাত্রার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখের 'এশিয়ার বক্ষস্থল', 'আলতাই-হিমালয়', 'দীপ্তিমান শম্বল' গ্রন্থে, ইউরি নিকোলায়েভিচ রোয়েরিখের 'উত্তর তিব্বতের যাযাবরদের জান্তব শৈলী', 'মধ্য এশিয়ার হাঁটা পথে' রচনায়, এবং আরো অনেক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে।

অভিযাত্রা যে বিপুল বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিল, প্রয়োজন হয় তার বর্গীকরণ ও প্রসেসিঙের। প্রত্নতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক, উদ্ভিদ্‌বিদ্যাঘটিত আবিষ্কার হয় হাজার হাজার। পথে যেতে যেতে আঁকা শত শত স্কেচ শিল্পীকে টানছিল ক্যানভাসে রূপ দেবার জন্য। এতটা সাফল্যের সঙ্গে যে কাজের শুরু, সেটা চালিয়ে যাবার জন্য দরকার ছিল সংবাদের ফলপ্রদ রূপের। রোয়েরিখও একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন।

৮। বিজ্ঞানী ও মানববাদী

সিকিমে থাকার সময় ভারত, আমেরিকা ও ইউরোপের বিজ্ঞানীদের সমর্থন নিয়ে রোয়েরিখ তাঁর হিমালয় গবেষণার ইনস্টিটিউটের কাজ শুরু করেন ১৯২৮ সালের ২৯ জুলাই, এটির তিনি নাম দেন 'উরুস্বতী'।

তবে অচিরেই সিকিম ছাড়ার ইচ্ছে হয় তাঁর। ১৯২৫ সালে কাশ্মীরে থাকতেই কুলু উপত্যকায় যাবার কথা তিনি ভেবেছিলেন, তবে অভিযাত্রার পথ ছিল তাকে পাশ কাটিয়ে। ভারতীয় ও তিব্বতী সাহিত্যে এ উপত্যকার একটা শ্রদ্ধেয় স্থান আছে। এখান থেকে বিয়াস নদী বরাবর ভারত থেকে পথ গেছে তিব্বত, কৈলাস, লাদাক, খোটানে, সেখান থেকে গোবি মরুভূমি পেরিয়ে একেবারে আলতাই পর্যন্ত।

বিয়াস নদীর তীরে ছিল মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের সংকলক ব্যাস মুনির আশ্রম। ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে এসেছিলেন এখানে। কিংবদন্তি অনুসারে এখানে ছিলেন বুদ্ধ ও পদ্মসম্ভব*, অর্জুনাদি পাণ্ডবেরাও এখানে এসেছিলেন।

দুই সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক স্মরণিকার আশ্রয় কুলু। পাহাড়ী ঝোরায় ক্ষয়ে যাওয়া অসংখ্য খাদে প্রাচীন সব মন্দির, কতকগুলি বহুকাল আগেই পরিত্যক্ত, গাছপালায় আকীর্ণ। এখানে পাওয়া যায় চার-পাঁচ শতকের চমৎকার ব্রোঞ্জ জিনিসপত্র এবং চোদ্দ-পনের শতকের অপূর্ব মিনিয়েচার। ইউরোপীয়দের পক্ষে এ উপত্যকার আবহাওয়া অনুকূল, যেটা সিকিম সম্পর্কে বলা যায় না। প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, তথা উদ্ভিদবিদ্যা ও ভূবিদ্যার দিক থেকে হিমালয়ের পশ্চিমাংশ সমেত উত্তর পঞ্জাব ছিল 'উরুস্বতী' ইনস্টিটিউটের পক্ষে উপাদানের এক অক্ষয় ভাণ্ডার, এখানেই আসা স্থির করলেন রোয়েরিখ।

১৯২৮ সালে ডিসেম্বরের শেষের দিকে রোয়েরিখরা কুলু উপত্যকায় পৌঁছলেন, এগতে লাগলেন প্রাচীন লোকালয় 'নগরের' দিকে। বিয়াস নদী পেরবার আগেই কাত্রাইন থেকে দেখলেন খাড়া পাহাড়ের গায়ে একলা একটি বাড়ি। সেখান থেকে তুষার মৌলি শিখরে ঘেরা উপত্যকার অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ার কথা। বাড়িটা ভাড়া নেওয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করলেন স্থানীয় লোকেদের। মোক্ষম জবাব এল:

'কী বলছেন! এটা মণ্ডি রাজার বাড়ি। বাইরের লোককে ভাড়া দেওয়া হয় না কখনো।'

---

* পদ্মসম্ভব — বৌদ্ধ ধর্মের একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, সিকিম ও ছোট তিব্বতে যা প্রচারিত হয়।

তাহলেও ওই বাড়িতেই ঠাঁই হল এবং পরে প্রথানুযায়ী অধিকার এবং দায়দায়িত্ব সমেত তার মালিকানাও পাওয়া গেল, যাতে জল ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ত্রিপাক্ষিক চুক্তির — জামলু দেবতা, ব্রিটিশ সরকার এবং গৃহস্বামীর। এইভাবেই দু'হাজার মিটার উঁচুতে 'নগরের' উপকণ্ঠের ভবনটি হল ভারতে রোয়েরিখের স্থায়ী নিকেতন।

সংকীর্ণ একটা প্যাকদণ্ডী পথ উঠে গেছে বাড়ির দিকে, চারিপাশে পাথরে বাঁধানো চাতালে বাগান। শীতে পথটা ঢেকে যেত তুষারস্তূপে, কিছু সময়ের জন্য ছিন্ন হয়ে যেত নিচের সঙ্গে যোগাযোগ, কিন্তু বসন্তের শুরুতেই মঞ্জরি ফুটত ফলের গাছে, মাটি ছেয়ে যেত সরস শ্যাম-মরকত ঘাস আর ফুলে। প্রায় ঘরের কাছেই ঘন বনের শুরু, — নীলাভ রঙের অপূর্ব সব পাইন, লাইম গাছ, রুপোলী রঙের ফার, ওক, মেপল — হাতের বেড়ে দু'মিটার। শরতে এইসব গাছের তলায় গজাত ছেলেবেলা থেকে চেনা যত ব্যাঙের ছাতা। তবে এই পদাবলি প্রায়ই ছিন্ন হত হিংস্র হিমালয়ী ভল্লুক, প্যান্থার, চিতাবাঘে। রাতে তারা ঘুরঘুর করত একেবারে বাড়ির কাছে, ধারালো কাঁটামারা লোহার কলার ছাড়া কুকুরদের ছেড়ে দেওয়া চলত না।

উত্তরে হিমাবৃত রোটাঙ্গ গিরিসংকট, তিব্বত আর মধ্য এশিয়ার দিকে পথটা গেছে এইখান দিয়ে। হাঁটা পথটা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসত কারাভানের ঘণ্টি, কিন্তু এই পথটা ছাড়াও ছিল বড়ো বড়ো পাথরে গড়া সিঁড়ি। লোককথায় এই 'মহাবীর সিঁড়িটা' গেসের খাঁয়ের নামের সঙ্গে জড়িত।

পশ্চিমে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যেত ধ্বংসস্তূপ। প্রাচীন লিপি থেকে জানা যায় যে কুলু উপত্যকায় একদা ছিল চোদ্দটি বৌদ্ধ মঠ। তখন টিকে ছিল কেবল তাদের রহস্যময় নয়নাভিরাম ভগ্নশেষ। দক্ষিণে জায়গাটা থেকে পথ গেছে সিমলায়, রওয়ালসার হ্রদ আর ভারতের আতপ্ত উপত্যকায়।

বাগানে দেওদার গাছের নিচে ছিল এইসব এলাকার মালিক প্রাচীন রাজপুত রাজা গুপ্ত-চৌহানের প্রস্তরমূর্তি। রোয়েরিখের বহু ছবিতেই তার প্রতিকৃতি আছে। কুলু উপত্যকায় দেবতার সংখ্যা তিনশ' ষাট। তাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হত মেলার দিনে। বাজত ঢাক-ঢোল, পরবের সাজে সেজে লোকে কাঁধে করে বয়ে আনত বেদীস্থ দেবতা। বর্ণাঢ্য তেমন একটা মিছিল দেখা যাবে পুত্র স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ রোয়েরিখের 'দেবতার আগমন' চিত্রে। ১৯৬০ সালে এটি প্রদর্শিত হয় মস্কো ও লেনিনগ্রাদে তাঁর প্রদর্শনীতে।

বিয়াস নদীর তীরে কাত্রাইন, যেখানে চড়াই শুরু, সেখান থেকে রোয়েরিখের বাড়ি অশ্বপৃষ্ঠে যাওয়াই ছিল শ্রেয়। চার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে লাগত দেড় ঘণ্টা। ইনস্টিটিউটের ভবন নির্মাণে অসুবিধা হয়েছিল এতে। স্বস্থানে যা বানানো সম্ভব নয় তেমন মালমশলা বয়ে আনত মুটেরা।

যাঁরা জানানি না দিয়ে আসতেন তাঁরা পড়তেন বেশ মুশকিলে। যেমন ইউরোপ থেকে আগত এক ভদ্রলোক সন্ধের সময় কাত্রাইনে পেঁছে স্থির করলেন যে চার কিলোমিটার চড়াই এমন একটা কিছু নয়, রওনা দিলেন পদব্রজে। এদিকে পাহাড়ে অন্ধকার তো হয়ে আসে তাড়াতাড়ি, অচিরেই ধরা পড়লেন সূচীভেদ্য নিশুতিতে। হিমালয়ের ভল্লুকাদি জন্তু জানোয়ারের কথা শোনা থাকায় তিনি স্থির করলেন ভোর পর্যন্ত কোনো একটা বৃক্ষ আশ্রয় করাই ভালো। উঠলেন কাছের গাছটিতে। নিদ্রাহীন রাতে আর্ত অতিথির ঘুম

এসেছিল কেবল ভোরের দিকে, হঠাৎ কী একটা সন্দেহজনক খসখস শব্দে ঢুলুনি থেমে গেল। নিচু হয়ে তাকিয়ে দেখলেন কে একজন অবাক হয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। পরে জানা গিয়েছিল এটি রোয়েরিখের বাগানের মালী কেসাঙ্গ, আর যে গাছে ভদ্রলোক রাত কাটিয়েছিলেন সেটির জন্ম বাড়ির অদূরেই বাগানে। এরকম ঘটনা এড়াবার জন্য রোয়েরিখ চড়াইয়ের গোড়ায় কাত্রাইনে লোক পাঠাতেন।

এইসব সাংসারিক অসুবিধার ক্ষতিপূরণ হয়ে যেত পরিপার্শ্বের অপরূপ দৃশ্যে, স্বচ্ছ-সূচি পার্বত্য হাওয়ায়, অদৃষ্টপূর্ব রঙে আকাশ-মাটি রাঙানো অত্যুজ্জ্বল সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তে।

কুলুতে বাস পাতার কয়েক মাস পরে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ ও ইউরি নিকোলায়েভিচ রোয়েরিখ ইউরোপ ও আমেরিকায় যান কর্মব্যপদেশে। নতুন ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমী দেশেদের কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার প্রয়োজন ছিল।

রোয়েরিখের অংশগ্রহণে গঠিত আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁর পাঁচ বছরের অবর্তমানে বেশ প্রসারিত ও সুদৃঢ় হয়। আগেই নিউ-ইয়র্কে স্থির হয়েছিল যে এগুলির জন্য বিশেষ ভবন নির্মাণ প্রয়োজন। ১৯২৫ সালে রোয়েরিখ যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি সায় দিয়ে ২৪ তলা একটি ভবনের পরিকল্পনা ও স্কেচ পাঠান ভারত থেকে, তাতে থাকার কথা ছিল মিউজিয়ম, সম্মিলিত শিল্পের ইনস্টিটিউট, চিত্র গ্যালারি, সাড়ে তিনশ দর্শকের জন্য রঙ্গমঞ্চ, বিভিন্ন বিভাগের জন্য কাজের স্টুডিও। রোয়েরিখের অভিপ্রায় ছিল ওপরতলার ফ্ল্যাটগুলিতে থাকবে স্টুডিও এবং সামান্য ভাড়ায় শিল্পী, বাদক, লেখক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতীদের জন্য বাসা।

রোয়েরিখের সমস্ত মন্তব্য পাঠানো হয় স্থপতি এইচ. করবাটের কাছে। তিনি সেগুলি নিয়ে খাটেন, ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঋণ সম্পর্কে কথাবার্তা কয়ে নির্মাণ শুরু করেন। ১৯২৯ সালের জুনে নিকোলাই ও ইউরি রোয়েরিখ যখন নিউ-ইয়র্কে এলেন, গগনচুম্বী ভবন তখন প্রায় তৈরি।

আমেরিকার শিল্প আর বিজ্ঞানের জগত রোয়েরিখকে স্বাগত করল অতি সমাদরে। তাঁর বক্তৃতায় ইনস্টিটিউটে ও বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে শ্রোতাসমাগম হত প্রচুর। তিনি বলতেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা, দেখাতেন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, এশীয় জনগণের সাম্প্রতিক ফলিত কলার সামগ্রী।

এই পরিভ্রমণে শিল্পের প্রাণবান মূল্যের কথা তিনি বলেছিলেন অনেক। মার্কিন মুলুকে এসে শিল্পী সেখানে কোনো মঙ্গল দেখেন নি। প্রচণ্ড নামছিল শেয়ারের দাম, কমছিল উৎপাদন, বাড়ছিল বেকারি, জীবনযাত্রার মান ঠেকছিল সর্বনাশা মাত্রায়। পুঁজিবাদের অপরিহার্য অভিশাপ — অর্থনৈতিক সংকটের পরবর্তী পালা শুরু হচ্ছিল ১৯২৯—১৯৩৩ সালে।

নিউ-ইয়র্কের ছাত্রদের উদ্দেশে রোয়েরিখ বলেছিলেন:

'কাগুজে মূল্যের খরবেগ হ্রাস সবাই দেখেছেন। প্রত্যেকেই প্রমাণ নিক নিজেদের মস্তিষ্ক দিয়ে। নিথর হয়ে আসা বন্ধুদেরও মনে পড়বে কীভাবে তাদের চোখের সামনে তুচ্ছ বলে গণ্য সামগ্রী হঠাৎ প্রচুর মূল্য অর্জন করেছে, এবং উলটোটাও: দৈনন্দিনের দিক থেকে যার মূল্য অটল তা পরিণত হয়েছে কাগজের একরাশ আবর্জনায়। বিপ্লবের কালে আমরা একাধিক বার দেখেছি কীভাবে মুছে গেছে ব্যাঙ্কার আর অর্থপতিরা,

অথচ টিকে থেকেছে শিল্পী এবং শিল্পের সংগ্রাহকেরা। খোদ জীবনই দেখিয়ে দিচ্ছে যে সৃজনের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই বেঁচে থাকে। বাঁচে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর অক্ষয় হয়ে থাকে চিন্তা।'

১৯২৯ সালের ৭ অক্টোবর নতুন ভবনে মিউজিয়মের উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে রোয়েরিখ মিউজিয়মের সংগ্রহ পরিপূরণ করেন এশিয়ায় পর্যটনকালে আঁকা অজস্র ছবি দিয়ে।

গগনচুম্বী অট্টালিকায় মিউজিয়ম ছাড়াও ছিল নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী প্রতিষ্ঠান। রোয়েরিখের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সম্মানী সদস্য ছিলেন মিলিকেন, জ. বসু, আইনস্টাইন, অসিত কুমার হালদার, স্তকোভ্স্কি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইগ্নাসিও সুলোআগা প্রভৃতি অনেকেই।

১৯২৯ সালে নিকোলাই রোয়েরিখ ফের যুদ্ধকালে সাংস্কৃতিক মূল্য সংরক্ষণের প্রশ্ন তোলেন। এই ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তির যে প্রস্তাব রোয়েরিখ করেছিলেন ১৯১৪ সালে তাতে সাড়া মেলে নি। শিল্পীর একান্ত দুরাশঙ্কার সাক্ষ্য দিয়েছিল রেইমসের ভগ্নস্তূপ, লুভেন গ্রন্থাগারের ভস্মকণা, শত শত মিউজিয়ম, ল্যাবরেটরি, বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ। বিশের দশকের শেষাশেষি এ আশংকা খুবই বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শান্তি চুক্তির অনির্ভরতায় কারো খুব একটা সন্দেহ ছিল না, ওদিকে নিত্য বাড়ছিল সশস্ত্রীকরণের বেগ, যুদ্ধ চালনার সংহারক শক্তি।

বিতর্কমূলক প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং সৈন্য হ্রাসের সম্মেলন বানচাল হচ্ছিল একের পর এক, যদিও তাতে অংশ নিয়েছিলেন পশ্চিমী দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিকেরা। তাই কট্টর সমরবাদীদের ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করার জন্য রোয়েরিখের চুক্তির প্রয়াস অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল অবাস্তব।

তবে রোয়েরিখ ভেবেছিলেন অন্য কথা। তিনি রেড ক্রসের দৃষ্টান্ত দেন। এক সময় এ ব্যাপারটাও লোকের কাছে বিশ্বাস্য ঠেকে নি, কার্যকৃত করতে লেগেছিল অনেক সময় আর প্রচেষ্টা। রেড ক্রসের সর্বস্বীকৃত উপকারিতা থেকে রোয়েরিখ মনে করেন যে এ সংগঠনের কিছু নীতি তিনি স্মরণীয় সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান যুদ্ধকালে বাঁচিয়ে রাখার আন্তর্জাতিক বিশেষ ধারা প্রণয়নে কাজে লাগাতে পারবেন।

ইউরোপে এসে রোয়েরিখ তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইন ও রাজনীতির ডক্টর গ. শক্লিয়াভের এবং আচার্য-অধ্যাপক জোফ্‌ফর দ্যে লা প্রাদেল-এর কাছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চুক্তির একটি খসড়া রচনার অনুরোধ জানান তাঁদের। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় খসড়া চুক্তির পূর্ণ বয়ান এবং সেই সঙ্গে সরকার ও জনগণের কাছে রোয়েরিখের আবেদন। চুক্তির প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ছিল:

'শিক্ষামূলক, শিল্পমূলক, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক মিশন, তাদের কর্মিবৃন্দ এরূপ প্রতিষ্ঠান ও মিশনের সম্পত্তি ও সংগ্রহ নিরপেক্ষ বলে গণ্য হবে এবং সেই হিশেবে তা যুধ্যমানদের পোষকতা ও শ্রদ্ধা লাভ করবে। এরূপ কোনো একটা প্রতিষ্ঠান বা মিশন কোন রাষ্ট্রের অন্তর্গত তা নির্বিশেষে সর্বত্র উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ও মিশনের প্রতি পোষকতা ও শ্রদ্ধা চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির সর্বোচ্চ ক্ষমতার অন্তর্গত। রোয়েরিখ চুক্তির ভিত্তিতে নিবদ্ধীকৃত প্রতিষ্ঠান, সংগ্রহ ও মিশন একটা বিশেষ নিশান ধারণ করবে যা চুক্তিবদ্ধ সমস্ত দেশের ও যুধ্যমান রাষ্ট্রদের পক্ষ থেকে সংরক্ষণ ও শ্রদ্ধার অধিকার পাবে।'

চুক্তির সঙ্গে রোয়েরিখ একটা বিশেষ পতাকার প্রস্তাব দেন যাকে তিনি বলেছিলেন 'শান্তির নিশান'। সংরক্ষণীয় সামগ্রীর ওপর তা তোলার কথা ছিল। পতাকায় ছিল শাদা বস্ত্রখণ্ডের ওপর লাল বৃত্তরেখার ভেতর তিনটে লাল চক্র। শিল্পীর ধারণায় এ চিহ্ন ছিল চিরন্তনতা (বদ্ধ বৃত্তরেখা) এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পারম্পর্যের প্রতীক (তিনটি চক্র)। তবে এ প্রতীকের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে অন্যভাবেও, শিল্পী তাতে আপত্তি করেন নি। তিনি বলেছিলেন, জীবনের সংশ্লেষ বোধ থেকে যদি কোনো ব্যাখ্যা আসে, তাহলে তা সবই এ চিহ্নের অভ্যন্তরীণ ভাবনার সমীপবর্তী।

প্রতীকটার আবির্ভাব অতি প্রাচীনকালে। তার দর্শন মিলবে তৈমুরলঙের আমলে প্রচলিত দাগায়, তিব্বতী, ককেশীয়, স্ক্যান্ডিনেভীয় বকলসে, প্রাচীন বাইজানটিয়াম ও রোমের সামগ্রীতে। স্পষ্টতই সেখান থেকে তা যায় স্পেনে এবং ছড়ায় ইউরোপে। স্ত্রাসবুর্গ মাদোনাও তাতে অলংকৃত। রাশিয়ায় তা দেখা যাবে দেবপটচিত্রে সন্ত আর মুনিদের পোশাকে। সহজ অথচ সুন্দর এই অঙ্কনটি শাদার পটে দিব্যি ফুটে ওঠে। প্রাচীনতা সত্ত্বেও এটি কোনো জাতি বা ধর্মের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে নি, যার গুরুত্ব কম না। যেমন, রেড ক্রস চিহ্নটা জনবহুল মুসলিম জগতের কাছে অগ্রাহ্য হয়েছিল, তার বদলি নিতে হয়েছিল ঈদের চাঁদ। 'শান্তির নিশান' প্রস্তাবের সময় রোয়েরিখ যে এসব কথা ভাবেন নি, এমন হয়ত নয়।

বিশ্বের প্রগতিশীল জনসমাজে রোয়েরিখের প্রস্তাব ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। রোম্যাঁ রোলাঁ, বার্নার্ড শ', টমাস মান, আলবার্ট আইনস্টাইন, হার্বার্ট ওয়েলস প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামাই অভিনন্দন জানান রুশী শিল্পীর উদ্যোগে। চুক্তি এবং 'শান্তির নিশান'-এর স্থায়ী কমিটি ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নিউ-ইয়র্কে, ১৯৩০ সালে প্যারিস ও ব্রিউগেতে। ১৯৩০ সালে লীগ অব নেশনস-এর মিউজিয়ম সংক্রান্ত কমিটি খসড়া চুক্তি অনুমোদন করে তা আরো বিচারের জন্য পাঠায় বুদ্ধিজীবী সহযোগিতার আন্তর্জাতিক কমিশনের কাছে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রোয়েরিখকে লেখেন:

'জনগণের কল্যাণের জন্য আমি আপনার বিপুল মানবিক ক্রিয়াকলাপের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছি, আপনার শান্তি চুক্তি এবং সমস্ত সাংস্কৃতিক রত্নভাণ্ডার রক্ষার জন্য তার পতাকা জনগণের কাছে হয়ে দাঁড়াবে অসাধারণ সক্রিয় একটা প্রতীক। এই চুক্তি যে লীগ অব নেশনসের মিউজিয়ম সংক্রান্ত কমিটিতে গৃহীত হয়েছে তার জন্য আমি আন্তরিক আনন্দিত এবং গভীরভাবে আমি অনুভব করছি যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক বোঝাবুঝিতে তার পরিণাম হবে বিপুল।'

রোয়েরিখের প্রস্তাব কতটা সাড়া জাগিয়েছিল তা বোঝা যাবে ১৯২৯ সালে শান্তির নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ থেকে। সুপারিশ করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, সমর্থন পাওয়া যায় বহু দেশের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানাদি থেকে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় রোয়েরিখের জন্য যে আবেদন করে তাতে বলা হয়:

'নিকোলাই রোয়েরিখ তাঁর সাহিত্যকর্ম, বক্তৃতা, গবেষণা, ছবি ও বহুমুখী ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সক্রিয়ভাবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মতবাদ গ্রহণের ডাক দিয়েছেন। তাঁর শান্তি প্রচার ব্যাপ্ত হয়েছে বিশটির বেশি দেশে এবং ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। অতি বিভিন্ন সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট প্রেরিত বাণী এ প্রচারের প্রভাবের পরিচায়ক। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক শান্তি আসবে কেবল জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংস্কৃতি

এবং সমন্বিত সৌন্দর্য থেকে জাত জনগণের সাংস্কৃতিক মানকে উত্থিত করে। ন. রোয়েরিখের ত্রিশ বর্ষব্যাপী পরিশ্রমী ক্রিয়াকলাপ হল জাতিসমূহের পারস্পরিক নৈকট্যের এক উদাত্ত আহ্বান।'

নোবেল পুরস্কারের জন্য রোয়েরিখের নাম সুপারিশ করায় চুক্তি এবং 'শান্তির নিশানের' ধারণাটা প্রসার লাভ করে যদিও শিল্পীর চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারে কোনো মোহ তিনি পোষণ করেন নি। প্রথমত, মার্কিন রাষ্ট্রীয় সেক্রেটারি কেলগ, সিনেটর জুভেনেল, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতির মতো 'হোমরা চোমরাদের' নামও প্রস্তাবিত হয়েছিল একই সঙ্গে। দ্বিতীয়ত, রোয়েরিখকে পুরস্কার প্রদানে পশ্চিমী দেশেদের রাজনৈতিক স্বার্থ মিটত না। তাদের আনুকূল্য লাভ করা যেত কেবল প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিকূলতা করে।

রোয়েরিখ প্রস্তাবিত চুক্তির বাহ্যিক 'অরাজনৈতিকতার' ওপর জোর পড়লেও কিছু কিছু রাজনীতিক তাতে নির্বিকার থাকেন নি মোটেই। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজকর্মীদের মধ্যে পক্ষপাতী সংগ্রহ করে রোয়েরিখ চুক্তি সামরিকতা-বিরোধী প্রচারে সহায়তা করছিল। 'দিনলিপির পাতায় শিল্পী লিখেছেন:

'প্যারিস থেকে লিখে পাঠিয়েছে: 'সমবায় ইনস্টিটিউটের আইন বিভাগের অধ্যক্ষ রাইমন্ড ভেইস এসেছিলেন আমাদের এখানে। গৌণ রাষ্ট্রগুলি যাতে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে তার জন্য তাদের ওপরে জার্মানি যে চাপ দিচ্ছে, এ খবর তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেন... মনে আছে চুক্তি নিয়ে বিগত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে ছত্রিশটি দেশ একবাক্যে চুক্তি সমর্থন করে তার ভেতর জার্মানি ও ব্রিটেনের কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি। সত্যিই আমাদের শুনতে হয়েছে, কিছু কিছু রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান বাধা এই যে চুক্তির ধারণাটা এসেছে রুশীর কাছ থেকে। আমরা যথেষ্টই জানি যে দুর্বোধ্য কী এক পূর্বগানুকৃতির কারণে রুশীয় সবকিছুই অগ্রহণীয়। জনৈক যোগ্য ব্যক্তির মুখ থেকে আমাদের এও শুনতে হয়েছে যে চুক্তি নিয়ে দুচে* সাগ্রহে খাটতেন যদি চুক্তির আইডিয়াটা আসত একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই'।'

চুক্তির প্রতি সন্দেহজনক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন একা মুসোলিনিই নয়। প্যারিসে রোয়েরিখকে পীড়াপীড়ি করা হয় 'জেসুয়িট জেনারেলের' পরামর্শ নেবার জন্য। ক্যাথলিক মালটি সম্প্রদায় আলাপ-আলোচনার জন্য রোয়েরিখকে ডাকে রোমে। প্ররোচনামূলক গুজব রটানো হয় যে জিওনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে রোয়েরিখের সম্পর্ক আছে, কীসব বিশেষ কাজ নাকি তিনি সাধন করেছেন প্যালেস্টাইনে। এ থেকে বোঝা যায় বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে চুক্তির গুরুত্বটা বেশ বড়ো করেই দেখা হয়েছিল এবং রাজনৈতিক হঠাকারীদের অশোভন ঔৎসুক্য থেকে চুক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে কম কষ্ট করতে হয় নি রোয়েরিখকে...

পশ্চিমী দেশে চুক্তির পক্ষপাতী অনেক মিলেছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে আমেরিকায় কাজকর্ম নিয়ে আলাপ সেরে ১৯৩০ সালের বসন্তে নিকোলাই ও ইউরি রোয়েরিখ কুলুতে ফেরার আয়োজন করলেন। রওনা দেবার ঠিক আগে ভিসার জন্য তাঁরা গেলেন নিউ-ইয়র্কে ব্রিটিশ কনসালের কাছে। সেটা পেতে দু'দিনের বেশি লাগার কথা নয়। কিন্তু কনসাল কেন জানি কাঁচুমাচু করতে

---

* দুচে (duce — নেতা) — ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের নেতা মুসোলিনি। — অনুঃ

লাগলেন, বললেন লণ্ডনে ভিসা নেওয়াই ভালো, কেননা রোয়েরিখের পথ তো যাবে ইউরোপ দিয়েই।

প্যারিসে কিছুদিন কাটিয়ে নিকোলাই ও ইউরি রোয়েরিখ লণ্ডনে পররাষ্ট্র দপ্তরে এলেন, তাঁদের বলা হল ভারতে যাবার ভিসা আদৌ পাবেন না তাঁরা। মনে হল যেন মস্কো যাত্রা এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় সোভিয়েত কূটনীতিকদের সঙ্গে মেশামেশির মাসুল দেবার পালা এসেছে। মন্ত্রকের পদস্থদের কাছে বার কয়েক ধর্না দেবার পর যখন সৌজন্য সহকারে কিন্তু কোনো কারণ না দর্শিয়ে তাঁকে বলা হল ভারতে যাওয়া চলবে না, তখন রোয়েরিখেরও সেটা বুঝতে বাকি থাকে নি।

তবে ইউরোপ তো আর মরুময় তিব্বতী মালভূমি নয়, অচিরেই ভিসার ব্যাপারটা নিয়ে বহু দেশের কূটনীতিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও জনসেবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন রোয়েরিখ। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে আসতে লাগল আর্জি, আবেদন। লিখেছিলেন কার্ডিনাল ব্রুন, ক্যাণ্টারবেরির বিশপ, লণ্ডন গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ রাইট, লেখক গলস্‌ওয়ার্দি, অনেক দেশের ইংলণ্ডস্থ রাষ্ট্রদূত।

ওদিকে মন্ত্রকের রাজপুরুষেরা একেবারে মুখ বন্ধ করে রইলেন অথবা দায় সারলেন মামুলী জবাব দিয়ে। ফ্রান্সে কাজ ছিল রোয়েরিখের, লণ্ডন ছাড়ার আগে চূড়ান্ত জবাবের জন্য তিনি আরো একবার এলেন পররাষ্ট্র দপ্তরে। তখন স্বচক্ষেই দেখলেন যে ভারত গমন বিষয়ে তাঁর দলিলপত্রের ফাইলগুলো এত ফুলেছে যে করিডর দিয়ে তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একটা বিশেষ ঠেলায় করে। শিল্পী যখন একটা যুক্তিসিদ্ধ জবাব দাবি করলেন, তাঁকে ফের বলা হল:

'সমস্ত আর্জি আবেদন সত্ত্বেও ভারতে যাবার ভিসা আপনাকে দেওয়া হবে না!'

রোয়েরিখ জিজ্ঞাসা করলেন: 'এইটেই চূড়ান্ত?'

সৌজন্যের মস্তক হেলন সহ জবাব এল: 'চূড়ান্ত'।

'সুখের বিষয়, আমাদের দুনিয়ায় কিছুই চূড়ান্ত হয় না,' পাল্টা মন্তব্য করেছিলেন রোয়েরিখ।

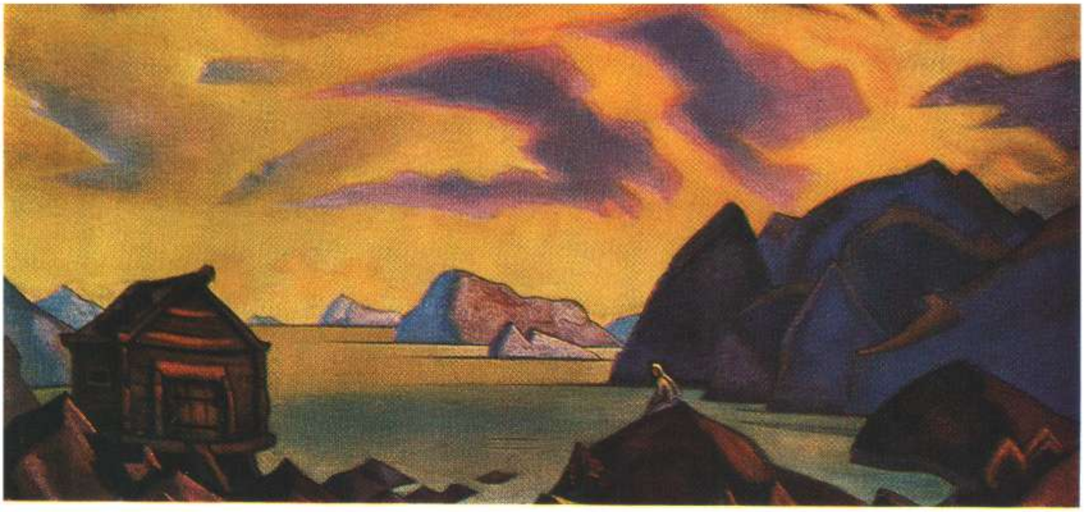
দিনকতক পর রোয়েরিখ এলেন প্যারিসে, সেখান থেকে পত্রবর্ষণ চালাতে লাগলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে। কিন্তু ইংরেজরা টলল না, আর, দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্সস্থ সুইডিশ রাষ্ট্রদূত এরেনসভার্ড যখন রোয়েরিখকে ভিসা দেবার জন্য আবেদন জানালেন, লণ্ডন থেকে নির্বিকার উত্তর এল যে সুইডেনের চেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্ররাও কোনো সাফল্য লাভ করে নি, সুতরাং তিনি একেবারে খামোকাই অস্থির হয়েছিলেন।

ভিসা পাওয়ার সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল বুঝে তিনি কৌশল বদলালেন, রওনা দিলেন মাদ্রাজের নিকটস্থ ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরিতে। রেওয়াজ অনুসারে মাদ্রাজে গিয়ে সাময়িকভাবে থাকার জন্য পণ্ডিচেরির অধিবাসীদের কোনো অনুমতি লাগত না। ফ্রান্স ছাড়ার সময় রোয়েরিখ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেণ্ডারসনকে টেলিগ্রাম করে জানান যে পণ্ডিচেরিতে থাকবেন স্থির করেছেন। জবাব এল, 'অবগত হলাম'। কিন্তু এটা ছিল নিছক একটা বাহ্যিক ঔদাসীন্য। রোয়েরিখ এখানে কী করতে চান ব্রিটিশ কনসালের এই প্রশ্নের জবাবে রোয়েরিখ বলেন:

'কিছু সম্পত্তি কিনব আর আপনাদের মাদ্রাজ, কলকাতার কাছে ফরাসী চন্দননগর, গোয়া, কারাকল প্রভৃতি যেসব জায়গার ভিসা আমার আছে, সেখানে যাব।'

ব্রিটিশ ভারতের সীমান্তবর্তী সমস্ত দেশে যাবার অনুমতি কনসালকে দেখালেন রোয়েরিখ।

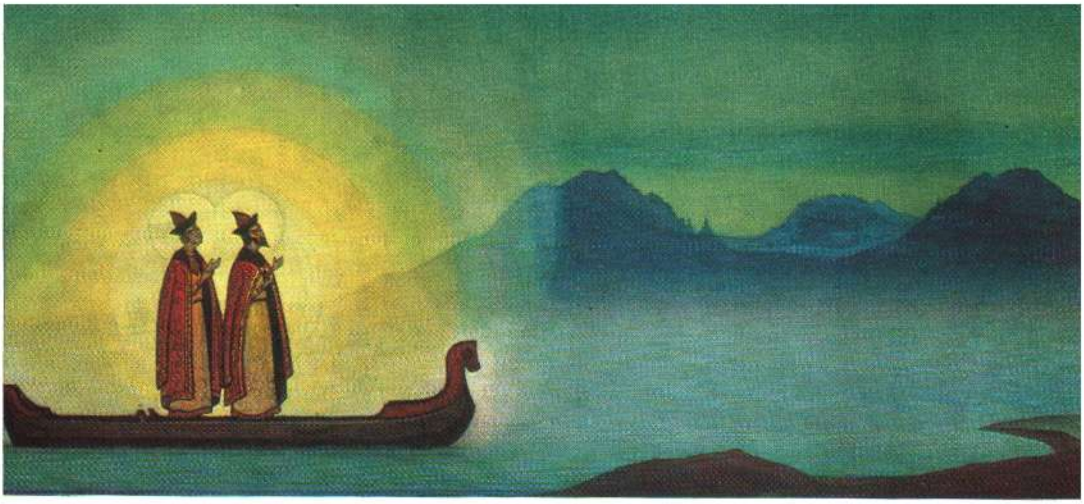
দেখা দিল একটা বিচিত্র পরিস্থিতি: কুলুতে যেত 'উরস্বতী' ইনস্টিটিউটের ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে



প্রতীক্ষমাণা। ১৯৪১। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



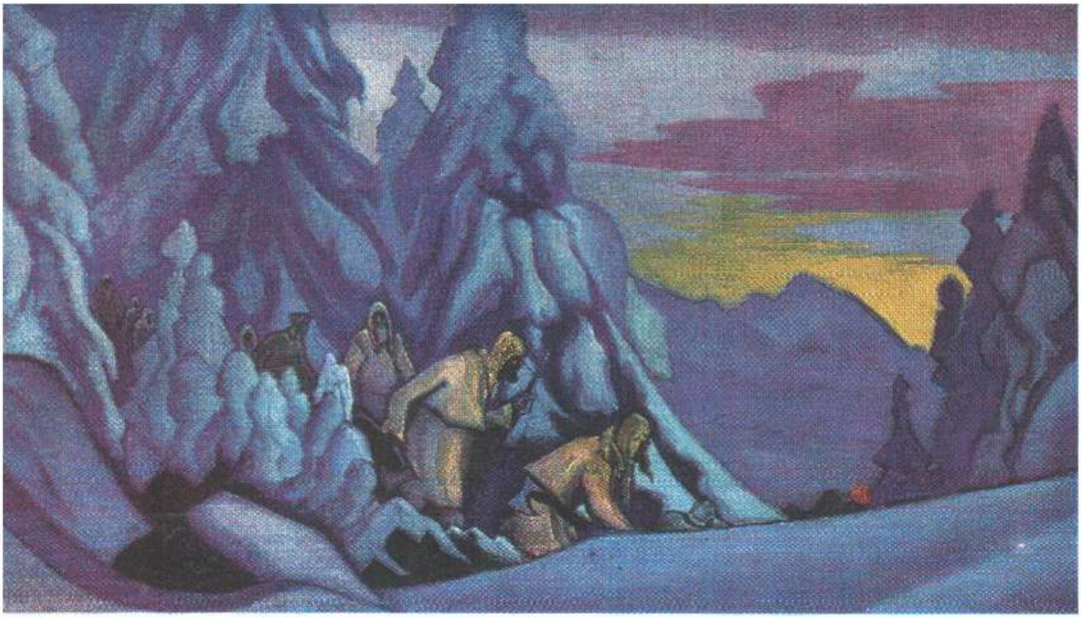
ইগরের অভিযান। ১৯৪২। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



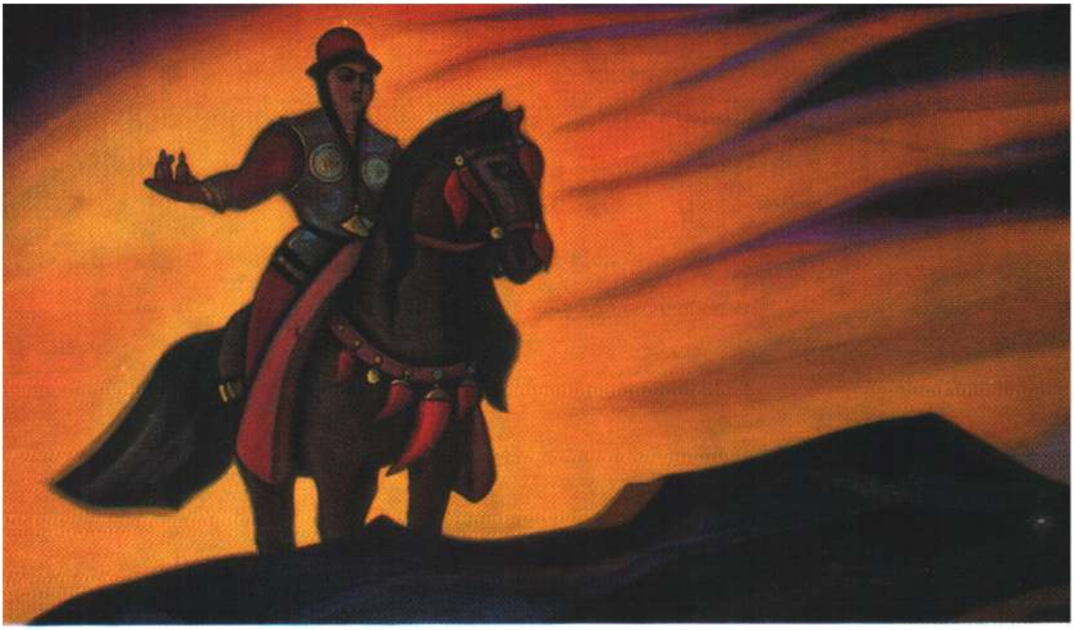
বরিস ও গ্লেব। ১৯৪২। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



পবিত্র বসন্ত। ১৯৪৩। নভোসিবির্স্ক আঞ্চলিক চিত্র গ্যালারি, নভোসিবির্স্ক।



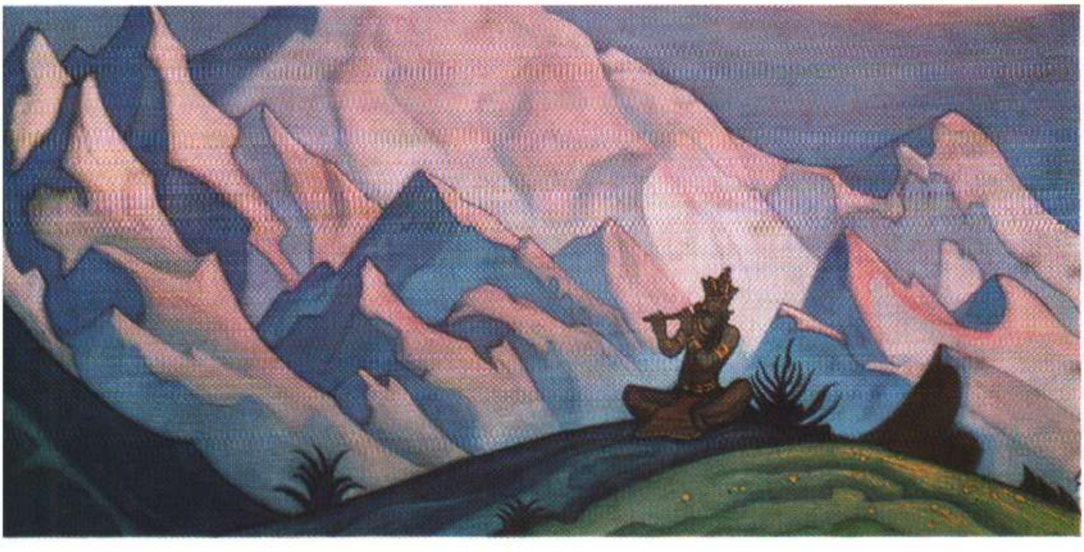
পার্টিজান। ১৯৪৩। বগ্‌দানোভার সংগ্রহ।



নাস্তাসিয়া মিকুলিচ্‌না। ১৯৪৩। নভোসিবির্স্ক আঞ্চলিক চিত্র গ্যালারি, নভোসিবির্স্ক।



পার্বত্য হ্রদ। ১৯৪৪। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



কৃষ্ণ। ১৯৪৬। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



লাসা। ১৯৪৭। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।



গঙ্গায় প্রদীপ। ১৯৪৫। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম,
লেনিনগ্রাদ।



মনে রেখো! ১৯৪৫। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম,
লেনিনগ্রাদ।

জিজ্ঞাসা আর চিঠিপত্র, রোয়েরিখের স্ত্রী ও ছোটো ছেলেও রয়েছে ওখানে, আর নিজে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ ভারতের সীমান্তস্থিত এলাকায় থেকেও সেখানে যেতে অক্ষম যে কারণে, তা খুলে না বলাই ব্রিটিশ সরকারের অভিরুচি। এই প্রসঙ্গে নানা রকমের অনুমান প্রকাশ পেতে থাকল সংবাদপত্রে। বেড়ে উঠল ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রতিবাদপত্রের স্রোত। পন্ডিচেরিতে তিনি ইতিমধ্যেই প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু করেছিলেন, সেখানে একমাস থাকার পর শিল্পী ও তাঁর পুত্র ভিসা পেলেন, তবে এবার ভারতের বড়ো লাটের কাছ থেকে।

কুলুতে ফিরে নিকোলাই ও ইউরি রোয়েরিখ তাঁদের প্রকৃতিসিদ্ধ উদ্যোগ নিয়ে 'উরস্বতী' ইনস্টিটিউটের থেমে থাকা কাজের সুব্যবস্থায় লাগলেন। কয়েক বছর পরে রোয়েরিখের পক্ষে লেখা সম্ভব হল:

'আমরা যখন ইনস্টিটিউট স্থাপন করি, তখন কাজের অবিরাম চলমানতার কথাই ভেবেছিলাম সর্বাগ্রে। প্রতিষ্ঠার প্রতি বছরই চলছে অভিযাত্রা... লোকে তো আর এইজন্য সম্মিলিত হয় না যে একটা ঘরে বসে প্রেরিত তথ্যাদিতে পুষ্ট হবে। ওটা শুধু কাজের আধখানা। দরকার ভারতীয়রা যাকে অমন অন্তর দিয়ে বলে 'আশ্রম'। সেটা নাভি বিন্দু কিন্তু আশ্রমের মনন-খাদ্য তো সংগৃহীত হয় বিভিন্ন স্থান থেকে।'

ব্যাপক আন্তর্জাতিক যোগাযোগের কথা মনে রাখা হয়েছিল ইনস্টিটিউটের ক্রিয়াকলাপে। তথ্য বিনিময়ে আর সহযোগিতায় রোয়েরিখ টেনে আনেন এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার অনেক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানকে। ইনস্টিটিউটের প্রত্যক্ষ কাজ দেখতেন ইউরি রোয়েরিখ। নৃকুল-ভাষা ঘটিত গবেষণা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান চালাতেন তিনিই। প্রাচ্যের ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার ক্ষেত্রে কাজ চলেছিল বিপুলে। বহু যুগের প্রাচীন ও বিরল পুঁথি সংগৃহীত ও ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। সমীক্ষা চলে অর্ধবিস্মৃত উপভাষা নিয়ে।

কনিষ্ঠ পুত্র স্‌ভিয়াতোস্লাভ রোয়েরিখ তিব্বতী ও স্থানীয় ঔষধ প্রণালী এবং এশীয় জনগোষ্ঠীর প্রাচীন শিল্প নিয়ে চর্চা করতেন।

আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ও সাময়িক কর্মীরা সংগ্রহ করতেন উদ্ভিদ ও পশুর নমুনা। কুলু থেকে বৈজ্ঞানিক মালমশলা যেত মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ-ইয়র্ক উদ্ভিদ্-উদ্যান, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্যারিস মিউজিয়ম, কেমব্রিজের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অকাদেমির উদ্ভিদ্-উদ্যানে। শ্রুতকীর্তি সোভিয়েত উদ্ভিদ্‌বিদ ও প্রজননবিদ, অকাদেমিশিয়ান ন. ই. ভাভিলোভ বৈজ্ঞানিক তথ্যের জন্য 'উরস্বতী' ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সেখান থেকে বীজ পান তাঁর অনন্যসাধারণ উদ্ভিদ্‌সংগ্রহের জন্য।

তিব্বতী লামা বৈদ্যদের সহায়তায় ইনস্টিটিউটের কর্মীদের পক্ষে বিশ্বে প্রথম তিব্বতী ঔষধির পাঞ্জিকা প্রণয়ন সম্ভব হয়। ইনস্টিটিউটে গড়া হয় ক্যান্সার রোগ নিয়ে গবেষণার বিভাগ সহ জীবরসায়ন ল্যাবরেটরি। উচ্চ পার্বত্যাঞ্চলে মহাজাগতিক রশ্মি সমীক্ষারও কাজ চলেছিল।

ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক দলেরা কাজ করতেন যেমন খাস কুলু উপত্যকায় তেমনি তার সীমানা ছাড়িয়ে দূরে — লাহোল, বেশার, কাঙড়া, লাহোর, লাদাক, জংস্করর, স্পিটি, রুপসাতেও। অনেক অভিযাত্রা পরিচালনা করেছেন স্বয়ং নিকোলাই রোয়েরিখ। যেমন, পণ্ডিচেরি থেকে কুলুতে আসার পর লাহোলে যাবার তোড়জোড় শুরু হয় আর ১৯৩১ সালেই রোয়েরিখ কারাভান নিয়ে যান রোটাঙ্গ গিরিসংকটের ওপারে।

তাঁর দিনলিপিতে পড়ি: 'ফের বাজছে কারাভান

খচ্চরের ঘণ্টা, ফের পার্বত্য গিরিসংকটের খাড়া চড়াই। ফের বিপরীত দিক থেকে আসা পথিকেরা, প্রত্যেকেই বহন করছে তাদের দিনযাপনের রহস্য। ফের উ'চু চ্যাপটা ছাদ থেকে সীমাহীন হিমবাহ, তুষারাবৃত চুড়ো, আর স্রোতের গর্জন তোলা গভীর উপত্যকায় মুগ্ধ দৃষ্টিপাত।'

পর্যটন ভালোবাসতেন নিকোলাই রোয়েরিখ। তাঁর এশীয় অভিযানগুলো থেকে অজস্র নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে বিজ্ঞান।

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার প্রভাবের ব্যাপারেও রোয়েরিখের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছিল প্রাচ্য। যোগের যেসব ঘটনা তাঁর চোখে পড়েছে তা তিনি খ'ুটিয়ে টুকে রাখেন। অসংখ্য হাটুরে ফকিরের চতুর ভেলকি থেকে মানুষের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় প্রমাণিত মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবপাতের একটা সুনির্দিষ্ট পার্থক্য টানার চেষ্টা করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন: "আচ্ছা, ভারতের অলৌকিক কাণ্ডগুলো কী জিনিস?' জিজ্ঞাসা করেন পশ্চিমের বন্ধুরা। বলব: 'অলৌকিক কাণ্ড কিছু চোখে পড়ে নি, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক শক্তির নানা আত্মপ্রকাশ দেখেছি। যদি কথা হয় একটা 'উচ্চতম অলৌকিক' শক্তি নিয়ে, তাহলে ওটা আলাপেরই যোগ্য নয়। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক শক্তির বাস্তবে অর্জনীয় বিকাশ যদি মানি, তাহলে ভারতে তার প্রকাশ দেখা যায় আজও।'

যেসব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারের অধ্যয়নে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন তাকে সরাসরি নস্যাৎ করা, তা নিয়ে হাসাহাসি কিংবা ইচ্ছাকৃত নীরবতা অবলম্বনকে রোয়েরিখ মনে করতেন অনুচিত। 'পরামনস্তত্ত্ব' (১৯৩৭) প্রবন্ধে শিল্পী লেখেন:

'তমসাচ্ছন্ন মধ্য যুগে পরামনস্তত্ত্ব নিয়ে যেকোনো গবেষণা সম্ভবত শেষ হত ধর্মীয় বিচার, নির্যাতন ও অগ্নিদাহে। আমাদের সমকালীন 'ধর্মীয় বিচারকরা'ও এখনো বৈজ্ঞানিক গবেষকদের হয় ডাকিনীবৃত্তি নয় মস্তিষ্কবিকৃতিতে অভিযুক্ত করতে পেছ-পা নয়। আমার মনে আছে কিভাবে চিত্ত নিয়ে গবেষক, আমাদের প্রয়াত বন্ধু প্রফেসর বেখতেরেভকে শুধু কর্মক্ষেত্রেই নিগৃহীত হতে হয় নি, জনমতের চোরাগলিতে স্বয়ং গবেষকেরই স্নায়বিক বিকার নিয়ে কানাকানি হয়েছে একাধিক বার। আমরা এও জানি যে চিত্ত নিয়ে গবেষণার জন্য গুরুত্বধারী বিজ্ঞানীরা নানা প্রকার অপ্রীতির সম্মুখীন হয়েছেন কর্মক্ষেত্রে, মাঝে মাঝে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদচ্যুতও হয়েছেন। এ ব্যাপার ঘটেছে ইউরোপে এবং আমেরিকায়। কিন্তু সমস্ত বাধা ও কুৎসা কাটিয়ে এগিয়ে চলে বিবর্তন... চিত্ত নিয়ে একটা বিজ্ঞান গড়ে উঠুক বা না উঠুক, মনস্তাত্ত্বিক বা আদ্যা শক্তি আবিষ্কৃত হোক বা না হোক, একটা জিনিস পরিষ্কার: বিবর্তন মানুষকে অমোঘভাবে প্রবৃত্ত করছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি আবিষ্কারে। সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞান মহাকাশে নতুন শক্তির সন্ধানী যা সমস্ত বল ও সমস্ত অভিজ্ঞতার অপরিসীম উৎস।'

১৯৩১ সাল থেকে 'উরুস্বতী' ইনস্টিটিউট একটি বার্ষিকী প্রকাশ করে যাতে থাকত সেখানকার কর্মীদের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের ফলাফল। তার প্রথম সংখ্যা উৎসর্গিত হয় প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ প্রফেসর লানমান (কেমব্রিজ)-এর নামে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতেও বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে এ ইনস্টিটিউট থেকে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

সর্বস্বীকৃত তত্ত্বে যেসব ঘটনা বিশেষ খাপ খেত না, তাদের বিষয়ে কখনো নীরব থাকেন নি রোয়েরিখ। বরং নতুন আবিষ্কারের অগ্রদূত হিশেবে তিনি তাদের সন্ধান ও স্বাগত করেছেন। তিনি বলতে ভালোবাসতেন: 'বিজ্ঞান যদি নবীভূত

হতে চায়, তাহলে সর্বাগ্রে তাকে হতে হবে অসীমিত এবং তাতে করে নির্ভীক।' কল্পচারী বলে খ্যাত হতে তাঁর ভয় ছিল না, অস্তিত্বের গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটনে ডাক দিতেন তিনি, বিশ্বাস রাখতেন মানবিক ধীশক্তির অনন্ত সম্ভাবনায়।

সোভিয়েত বিমানের সাফল্যে আনন্দিত হয়ে ১৯২৬ সালেই নিকোলাই রোয়েরিখ লিখেছিলেন: 'আকাশ জয়ের ঘটনা সহজেই ঘুরে যাবে দূর জগতের সন্ধানে।' মহাজগতকে তিনি সর্বদাই দেখতেন মানুষের আত্মপ্রকাশের একটা বাস্তব ক্ষেত্র বলে। শিল্পী লিখেছিলেন: 'যদি অভিব্যক্তির সহজতা, কামনার স্পষ্টতার সঙ্গে থাকে মহাকাশের অপরিমেয় মহিমা, তবে সেটাই হল সত্যকার পথ। এটা সেই অনধিগম্য মহাকাশ নয় যার সামনে ললাট কুঞ্চিত করেন প্রফেসর, এ সেই মহীয়ান ও সরল, যা আমাদের সারা জীবনে অনুপ্রবিষ্ট, অসংখ্য পটে যা গড়ে তোলে পর্বত, জ্বালিয়ে দেয় তারকার জগৎ।'

দূর জগৎ সন্ধানের যে কথা শিল্পী বলেছিলেন তার চল্লিশ বছর পরে প্রথম ব্যোমনাবিক ইউরি গাগারিন মহাজগতের পথ খুলে দিয়ে যে বলেছিলেন রোয়েরিখের রঙে তা ঝলকায়, সেটা অকারণে নয়।

বিজ্ঞানী হিশেবে রোয়েরিখ প্রধান একটা যে কর্তব্য নিয়েছিলেন সেটা হল পশ্চিমে প্রচলিত মনুষ্যসমাজ ও বিশ্ব সংস্কৃতির বিবর্তনের ইউরোপকেন্দ্রীয় তত্ত্বের পুনর্বিচার। এ তত্ত্ব ছিল ঔপনিবেশিকদের কাছে প্রাণবায়ুস্বরূপ। অন্যদিকে প্রাচ্য জাতিদের কীর্তি ও ঐতিহাসিক ভূমিকার বৈজ্ঞানিক সংবাদ ছিল স্বল্পপ্রচারিত। সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ অকাদেমিশিয়ান ন. ই. কনরাদ ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'প্রতীচ্য ও প্রাচ্য' পুস্তকে লিখেছেন:

'মানুষ ও সমাজ বিষয়ক বিদ্যার সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাচ্যের তাত্ত্বিক ভাবনার হিসেব রাখা আমাদের আবশ্যক, মনে রাখা উচিত যে প্রাচ্যে ঠিক এইসব ক্ষেত্রের চর্চা হয়েছে অসাধারণ ব্যাপক পরিসরে ও বিশদে। এই লক্ষ্যের কাজকে আমি বলব বিদ্যায় ইউরোপকেন্দ্রিকতা কাটিয়ে ওঠা এবং সেটাকে আমি মনে করি আমাদের কালে মানুষ ও সমাজ বিষয়ক বিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই পথেই বিদ্যা হতে পারে সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ ঐতিহাসিক অস্তিত্বের গোটা সময়টায় মানবজাতির জীবন ও কার্যকলাপ অধ্যয়নের পক্ষে কার্যকরী।'

অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে নিকোলাই রোয়েরিখ তাঁর প্রাচ্য বিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধাদি ছাপান বিশেষ বৈজ্ঞানিক সংকলনে, আরো ব্যাপক চরিত্রের পত্রিকায়, এমনকি দৈনিক সংবাদপত্রে। লিখতেন অতি বিভিন্ন সব প্রসঙ্গে। যেমন: 'ছন্দোগ্য উপনিষদ', 'ঋষি', 'নৈতিকতা ও নন্দনতত্ত্বে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি', 'গেসের খাঁয়ের খড়্গ' প্রভৃতি এশীয় সংস্কৃতির ইতিহাস ছিল তার অন্তর্গত, তেমনি জনচেতনার বিকাশ, যথা: 'ভরতের বাণী', 'ভারতসেবকদের প্রতি', 'প্রাচ্যের সুহৃদ', আবার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক মহাপুরুষ — রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আর নেহরুকে নিয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন।

রোয়েরিখ ছিলেন ফ্রান্সের প্রগৈতিহাসিক গবেষণা সমিতির সদস্য, যুগোস্লাভিয়ার বিজ্ঞান শিল্প অকাদেমি, বলোনায় (ইতালি) আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাহিত্য ইনস্টিটিউট অকাদেমির সভ্য, মার্ক টোয়েন সমিতির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সহসভাপতি, প্যারিসের প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রাহক সমিতির শরিক, প্যারিস অকাদেমির ইতিহাস সমিতির সম্মানী প্রটেক্টর, প্যারিসে নৃকুলবিদ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য, নিউ-ইয়র্কের ঐতিহাসিক স্মরণিকা সংরক্ষণ সমিতির সম্মানী

সদস্য, কলকাতায় জগদীশ বসু ইনস্টিটিউটের সম্মানী সদস্য, বাঙলার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, সান-ফ্রান্সিস্কোতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ইনস্টিটিউটের সম্মানী সভাপতি ও সাহিত্যের ডক্টর, প্যারিসে আন্তর্জাতিক গবেষণা সমিতির সদস্য, মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক ইনস্টিটিউটের সহসভাপতি, এশিয়া ইউরোপ আমেরিকার অন্য বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের করেসপণ্ডিং সদস্য। এসবের ফলে আলাদা আলাদা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস সম্মিলিত করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ দৃঢ় করা রোয়েরিখের পক্ষে সহজ হয়।

তিনি যখন হিমালয় গবেষণার ইনস্টিটিউট নিয়ে ব্যস্ত, এশিয়ায় অভিযাত্রা নিয়ে যাচ্ছেন, ইউরোপে তখন তাঁর প্রস্তাবিত চুক্তির পক্ষপাতীদের আন্দোলন বেড়ে উঠছিল। ১৯৩১ সালে ব্রিউগেতে গঠিত হয় রোয়েরিখ চুক্তির আন্তর্জাতিক লীগ। সেখানেই সেই বছরের সেপ্টেম্বরে আহূত হয় রোয়েরিখ চুক্তির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এতে অংশ নেন কয়েকটি রাষ্ট্রের সরকারী প্রতিনিধি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা। স্কুলে এবং উচ্চ শিক্ষায়তনে চুক্তির প্রচার চালাবার একটি পরিকল্পনা রচিত হয় সম্মেলনে। আন্তর্জাতিক শিল্প কমিটির সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপিত হয়, গঠিত হয় অস্ত্র সঙ্কোচের সম্মেলন ব্যুরো।

১৯৩২ সালে ব্রিউগেতে বসে রোয়েরিখ চুক্তির দ্বিতীয় সম্মেলন। সমস্ত দেশের কাছে এ চুক্তিকে আন্তর্জাতিক দলিলের শক্তিসম্পন্ন বলে মেনে নেবার আহ্বান জানানো হয় এখান থেকে। সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রদর্শনী হয় তাতে দেখানো হয়েছিল রক্ষণীয় স্থাপত্যকীর্তির ৬,০০০ ফোটোগ্রাফ।

তৃতীয় সম্মেলন হয় নিউ-ইয়র্কে ১৯৩৩ সালের নভেম্বরে। তাতে অংশ নেন ৩৬টি রাষ্ট্রের সরকারী প্রতিনিধি। সমস্ত দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক চুক্তি গ্রহণের সুপারিশ রচিত হয় এতে।

চুক্তির কথা প্রচারের ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন রোয়েরিখ। তিনি বলতেন যে সুইজারল্যাণ্ডের দিউনান ও মুয়ানে ১৮৬৩ সালে রেড ক্রসের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে নি। অথচ লাল ক্রস আঁকা মোটরগাড়ির সামনে ট্রাফিক থেমে যেতে দেখে আজ আর আশ্চর্য হয় না কেউ। প্রত্যেকেই বোঝে যে লোকের জীবন বাঁচাবার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের মতো কিছু একটা ঘটেছে। রোয়েরিখ ভাবতেন, সাংস্কৃতিক কীর্তির প্রতিও একই রকম মনোভাব লালিত করে তোলা দরকার, এবং সেটা দরকার শৈশব থেকেই, পরিবারে আর স্কুলে। শিল্পের স্মরণীয় নিদর্শন, বিজ্ঞানের সুকৃতি ধ্বংসে ক্ষতি যে হয় অপূরণীয়। তাই সংস্কৃতির প্রতিটি বিপদকে দেখতে হবে এমন কিছু বলে যার জন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন।

ব্রিউগেতে চুক্তির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মীদের সমীপে রোয়েরিখ লেখেন: 'সংস্কৃতি বলতে অনিকেত কিছু, নিষ্প্রাণ বিমূর্ত কিছু একটা বোঝায় না, এ হল সৃষ্টির বাস্তবতা, জীবনের অক্লান্ত কীর্তি, চিন্ময় শ্রম, সৃজন হল তার মর্ম... সেই কারণে 'শান্তির নিশান' আমাদের প্রয়োজন শুধু যুদ্ধকালেই নয়, আরো বেশি করে দৈনন্দিন ব্যাপারে, যখন কামান গর্জন ছাড়াই একই রকম অপ্রতিকার্য ভ্রান্তি ঘটে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে।'

চুক্তির প্রচার নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল নিকোলাই রোয়েরিখের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে। তিরিশের দশকের শেষে ত্রিশাধিক দেশে রোয়েরিখ নামাঙ্কিত সমিতি, মিউজিয়ম বা চক্র ছিল আশিটির বেশি। নিউ-ইয়র্কের মিউজিয়ম, প্যারিসের সমিতি, ব্রিউগের

কেন্দ্র, রিগার সমিতি ও মিউজিয়ম তার অন্তর্গত; ছিল বড়ো বড়ো শহর থেকে একেবারে দূরে বিক্ষিপ্ত নিতান্ত ছোটো ছোটো গ্রুপও। সবাই তারা সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী কাজ চালাত, সাধারণত তাদের কর্মসূচিতে থাকত ললিত কলা, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য নিয়ে পাঠচক্র, সংস্কৃতি রক্ষা বিষয়ে চুক্তির প্রচার, সেই সঙ্গে সংস্কৃতির প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণে স্থানীয় রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংগঠনাদিতে আকর্ষণ (চুক্তির প্রতি তাদের মনোভাব নির্বিশেষে); প্রায় প্রতিটি সমিতিতে ছিল প্রাচ্য অধ্যয়নের বিভাগ। সমাধিকারের জন্য নারী আন্দোলন, লোক শিক্ষা, যুবসম্প্রদায়ের বিভাগও গড়া হয়েছিল।

বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে বিকাশ পায় প্রকাশনার ব্যবস্থাও। কতকগুলি অনতিবৃহৎ গ্রুপ স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী প্রতিষ্ঠানের শাখা বলে গণ্য হয়। এইসব সঙ্ঘের খুব একটা স্থিতিশীলতা ছিল এমন নয়। রোয়েরিখের জনপ্রিয়তা, তাঁর কর্মোদ্যোগ, লোকের সঙ্গে আচরণের কুশলতাই ছিল প্রায়শই এসব সংগঠনের উদ্ভব ও সার্থক কাজের মূল প্রেরণা। এদের সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রতিটি ক্ষীণতাতেই তাদের ক্রিয়াকলাপ একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত মাঝে মাঝে। নানাবিধ স্থানীয় পরিস্থিতির প্রভাবও পড়ত কম নয়।

নিকোলাই রোয়েরিখের গ্রন্থ, প্রবন্ধ, আবেদনাদি যা তাঁর উদ্যোগে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রচার লাভ করে তাতে সর্বদাই প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর স্বাদেশিকতা। বিশ্বের সাংস্কৃতিক ভান্ডারে রাশিয়ার অবদান, রুশ শিল্প ও সাহিত্যের কথা, বিজ্ঞান ও টেকনিকের ক্ষেত্রে রাশিয়ার কৃতিত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাতে। এবং সেটা শুধু অতীত নিয়ে নয়, বর্তমান প্রসঙ্গেও অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের কর্মকান্ড নিয়েও, যার ছাপ পড়েছে কোনো না কোনো রূপে রোয়েরিখের নামের সঙ্গে জড়িত সবকিছুতেই।

তিরিশের দশকে যখন রুশী শিল্পীর আন্তর্জাতিক সামাজিক ক্রিয়াকলাপ খুবই বেগবান হয়ে ওঠে, তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল বিশেষ রকমের উত্তেজিত। ফ্যাসিস্ট জার্মানি দাবি করতে শুরু করেছে 'বাঁচার জায়গা', সজোরে চালিয়েছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত জার্মানির আগ্রাসনী পরিকল্পনা সমর্থন করছে পশ্চিমী শক্তিরা। ১৯৩৬ সালে শান্তি রক্ষার আবেদন জানালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রোয়েরিখ চুক্তির সমস্ত কমিটি তা সমর্থন করে। রোয়েরিখকে কবি লেখেন:

'মানবজাতির সম্মুখে বর্তমানে যত সমস্যা আছে শান্তির সমস্যা তার ভেতর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমের দেশে বর্বরতার যে নতুন তরঙ্গ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করছে তার সামনে আমাদের সমস্ত প্রয়াসকে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। সমস্ত দেশে সমরবাদের জঘন্য অভিব্যক্তিতে দেখছি ভয়াবহ ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। যাকে সভ্যতা বলে তার অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস হারাতে বসেছি। কিন্তু কিছু একটা করার প্রয়াস থেকে আমরা নিবৃত্ত হতে পারি না, কেননা তাতে অন্তিমটাই ঘনিয়ে আসবে। বর্তমানে আমি আপনার মতোই আলোড়িত ও উদ্বিগ্ন এবং এইটুকু কেবল আশা করতে পারি যে রক্তস্নাত হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ব হয়ে উঠবে নির্মলতর। কিন্তু এই শঙ্কার দিনে তেমন দিব্যবাণী সহনে বড়ো বেশি সাহসের প্রয়োজন। আপনার জীবন নিবেদিতপ্রাণ, আমি ভরসা করি যে মানবজাতি ও সংস্কৃতির সেবা চালিয়ে যাবার জন্য আপনি দীর্ঘায়ু হবেন।'

নিকোলাই রোয়েরিখের শিল্পেও প্রতিবিম্বিত

হয়েছে চুক্তির কথাটা। তাঁর তিরিশের দশকের অনেক ক্যানভাসেই দেখা যাবে 'শান্তির নিশানের' প্রতীকচিহ্ন। চুক্তির জন্য বিশেষ করে রচিত হয়েছিল তাঁর 'অরিফ্লামা' (১৯৩১) ছবি, শিল্পী নিজে যার রুশী নাম দিয়েছিলেন 'হেমশিখা রাণী'। ছবিতে আছে মাদোনার মূর্তি, হাতে 'শান্তির নিশান'।

এক দিক থেকে 'অরিফ্লামা'কে সমাধিকারের নারী আন্দোলনে রোয়েরিখের সাড়া বলেও ধরা যায়। সমস্যাটা এখনো বহু দেশে বর্তমান আর এ শতকের প্রথম দশকগুলোয় তা ছিল বিশেষ তীব্র। স্বাধিকারের সংগ্রামে নারীদের সমর্থনে দাঁড়ান রোয়েরিখ। বহু নারী সংগঠনও আবার তাদের পক্ষ থেকে শিল্পীর সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, বিশেষ করে তাঁর চুক্তি এবং 'শান্তির নিশানের' পোষকতা করে। রোয়েরিখ নামাঙ্কিত নারী সমিতির উদ্দেশে 'নারীদের প্রতি' প্রবন্ধে শিল্পী লেখেন: 'আপনারা নারীরাই তো শান্তির নিশান বয়ন করে মেলে ধরবেন। জীবনের উন্নয়নের প্রহরায় আপনারা দাঁড়াবেন নির্ভয়ে। প্রতিটি উনানে আপনারা জ্বালিয়ে তুলবেন অপরূপ, সৃষ্টিশীল, বরাভয় আগুন। রূপের কথা আপনারাই প্রথম শোনাবেন সন্তানদের। সংস্কৃতি — এই পুণ্যময় শব্দটি উচ্চারণ করবেন আপনারাই।'

যুদ্ধের বাস্তব বিপদ টের পাচ্ছিলেন রোয়েরিখ এবং তাঁর চুক্তিকে প্রণোদিত করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বেশি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের উল্লেখ করতে থাকেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রগতির পরাক্রান্ত দুর্গ বলে। ব্রিটিশ উপনিবেশে দিন কাটাচ্ছেন বলে এবং তাঁর প্রতি ভারতের অবৈধ প্রভুদের মনোভাব কী জানা থাকায় তাঁকে অবিশ্যি তাঁর মতামত প্রকাশ করতে হয়েছে কিছুটা সতর্কতা রেখে, কিন্তু সে মতামতের গতি আসলে কোন দিকে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ দেন নি তিনি। শিল্পীর বহুসংখ্যক প্রবন্ধ ছাড়াও তার একটা সংশয়াতীত দৃষ্টান্ত হতে পারে তাঁর 'সন্ত সিয়েৰ্গি' (১৯৩২) ছবিটি। এটি প্রথমে ছিল প্রাগে ভ. বুলগাকভ* প্রতিষ্ঠিত রুশ সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক মিউজিয়মে। সেখান থেকে এসে পড়ে মস্কোর ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারিতে। রুশ দেবপট অঙ্কনের কিছু কিছু বিন্যাসরীতি অবলম্বনে রোয়েরিখ সিয়েৰ্গি রাদোনেজ্‌স্কিকে এঁকেছেন পরিপূর্ণ, বিশাল পৃষ্ঠপটে। নিম্নভাগে স্লাভ যুক্তাক্ষরে পাদলিপি: 'তিন বার রাশিয়া রক্ষার নির্বন্ধ তোমার। প্রথম বার দ্মিত্রি দনস্কইয়ের আমলে, দ্বিতীয় বার অশান্ত যুগে, আর তৃতীয় বার...' শেষের তিনটি ডট দিয়ে শিল্পী কী বলতে চেয়েছেন তাতে কারো সন্দেহ থাকে না।

রোয়েরিখ ছিলেন ঐতিহাসিক ও প্রত্নবিদ কিন্তু সিয়েৰ্গিকে তিনি কদাচ আঁকেন নি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে। তাঁর কাছে সিয়েৰ্গি রুশ জনগণের আত্মিক শ্রমাশ্রিত ও সামরিক কীর্তির মূর্ত্যায়ন। আর শিল্পী যে ছবি আঁকলেন সেটা স্বদেশের ওপর ঘনায়মান বিপদে যথাসময়ে শিল্পীর জীবন্ত প্রতিক্রিয়া, যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় রাশিয়া বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসবে, এই অটল প্রত্যয়ের প্রকাশ।

ভারত পর্বে রোয়েরিখের সৃষ্টিতে এশীয় অভিযাত্রায় শ্বসিত প্রসঙ্গের প্রাধান্য থাকলেও একান্ত তাতেই তিনি সীমিত থাকেন নি, সজীব সাড়া দিয়েছেন বিশ্বের ঘটনাবলিতে। এই উদ্দেশ্যে আগের মতোই তিনি কাজে লাগিয়েছেন অতিকথা আর রূপকথার উপাদান, তাকে ফুটিয়েছেন বাস্তববাদী পটে কিন্তু দৃশ্যের রোয়েরিখ-সুলভ মানবিক বোধে মণ্ডিত করে।

---

* ভ. ফ. বুলগাকভ, ভাষাবিদ ও লেখক। লেভ তলস্তোয়ের একান্ত সচিব। ১৯২৩ সাল থেকে বাস করেন প্রাগে, ১৯৪৮ সালে ফিরে আসেন সোভিয়েত ইউনিয়নে।

রোয়েরিখের বিদেশে অঙ্কিত চিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবের সঙ্গে কিংবদন্তির সংশ্লেষ। আগেকার পর্বের সঙ্গে তার তফাৎ এই যে সুদূর পূর্বপুরুষ বা আধা-অতিকথার নায়কদের দৃষ্টি দিয়ে তিনি আর অতীতকে চাক্ষুষ করতে চাইছেন না। ওদের তুলে ধরে তিনি মানবেতিহাসের মূল্যায়ন করছেন বর্তমানের অবস্থান থেকে। অতীত যুগের যে কিংবদন্তি রোয়েরিখ ফুটিয়ে তুললেন তাতে দেখা দিল একটা জীবনধর্মী দার্শনিক মর্মার্থ।

'প্রাচ্যের নিশান' ('প্রাচ্যের গুরুগণ') চিত্রমালায় তা বিশেষভাবে সূচিত। ১৯২৫ সালে কাশ্মীরে থাকার সময় পর্যটন দিনলিপিতে শিল্পী লেখেন:

''প্রাচ্যের নিশান' গড়ে উঠেছে এই নিয়ে: ১) জীবনের উৎসমুখে 'বিজয়ী বুদ্ধ'; ২) জ্যোতি পরিবেষ্টিত পর্বত শীর্ষে 'নায়ক মজেস'; ৩) আত্মশক্তিতে খাটছেন 'নির্মাতা সিয়েৰ্গি'; ৪) হিমবাহের মধ্যে 'হিমালয়ের প্রহরী'; ৫) নির্বাসন বরণে 'ন্যায়পর কনফুসিয়াস'; ৬) যাত্রীদের বান্ধব 'এন্নো স্যোকাকু' (জাপান); ৭) সূর্যোদয়ে দেবকণ্ঠ শনাক্ত করা 'শ্রুতিসিদ্ধ মিলারেপা'; ৮) মহাকালের মুখোমুখি 'স্পর্ধিত দোজে'; ৯) লোকালয়ের কল্যাণে অবিলম্বিত 'কল্যাণী বাণ সারাথা'; ১০) শেরেস্তা জিব্রাইলের সংবাদ, কিংবদন্তি — 'হিরা পর্বতে মহম্মদ'; ১১) 'নাগবিজয়ী নাগার্জুন' নাগসরোবরে নাগরাজের সংকেত দেখছেন; ১২) 'ওইরত — শাদা বুরখানের বার্তাবহ' — আলতাইয়ের লোককথা। এবং ইতিমধ্যেই যা মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে —১৩) 'বিশ্বজননী'; ১৪) 'খ্রিস্টের সংকেত'; ১৫) 'লও সে'; ১৬) 'জন কা পা'; ১৭) 'পদ্মসম্ভব'; ১৮) 'মহাপাত্র'; ১৯) 'প্রাচীন নাগ'।'

এই চিত্রমালা যাকে রোয়েরিখ মাঝে মাঝে বলেছেন 'স্যুইট', তার ভেতরে যে নির্দিষ্ট একটি ভাবনা ছিল তা তার বিশালতায় ও বহুমুখিতায় একটি ক্যানভাসে ফোটানো অসম্ভব। কিন্তু উল্লিখিত সিরিজের চৌহদ্দির মধ্যেও সে ভাবনা পুরো প্রকাশ করা রোয়েরিখের পক্ষে সহজ হয় নি। সাধারণত তিনি তার পরিপূরণ করতেন নতুন নতুন ছবি দিয়ে যা মূলত তাঁর কল্পনার প্রলম্বন। একথা 'তার দেশ', 'মৈত্রেয়', 'প্রাচ্যের গুরুগণ' এবং রুশী ও বিদেশী পর্বে আঁকা আরো অনেক চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রোয়েরিখের চিত্রকল্পনা কী অসাধারণ ব্যাপক এবং এশিয়ায় আগমনের মুহূর্তেই সেখানকার জনগণের ধর্মীয় দর্শন ও অতিকথা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল কতটা, 'প্রাচ্যের নিশান' সিরিজটি তার পরিচায়ক। ভারতে মাত্র এক বছর কাটিয়েই তিনি শুধু ভারতীয় নয়, মঙ্গোলীয়, তিব্বতী, আরবীয়, আলতাই-এর, চীনা এবং অবশ্যই রুশীয় প্রসঙ্গের ছবি নিয়ে খাটতে থাকেন।

স্বয়ং নিকোলাই রোয়েরিখ যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন তা অসাধারণ মূল্যবান আরো এই দিক থেকে যে সিরিজের ছবিগুলির নাম করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় শিল্পী তাঁর চরিত্রদের ঠিক কীভাবে দেখেছিলেন, একেবারেই বিভিন্ন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর যুধ্যমান ধর্মের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাদের মূর্তি গড়ে কী লক্ষ্য তিনি অনুসরণ করেছিলেন সিরিজে।

'প্রাচ্যের নিশান' সিরিজে গোঁড়া ধর্মীয় প্রসঙ্গের অনস্তিত্ব খুবই লক্ষণীয়। তার জায়গায় তিনি এনেছেন জনশ্রুতি, অপ্রামাণিক অশাস্ত্র। যেমন কনফুসিয়াসকে তিনি দেখিয়েছেন নিগ্রহের কবলিত, সিয়ের্গি তাঁর চোখে 'আত্মশক্তিতে খাটছেন', বুদ্ধের আহ্বানে বৈরাগ্য নেই, আছে ঐহলৌকিক জীবনে কীর্তির জন্য আকুতি, রণপ্রিয় মহম্মদ মরুভূমিতে একাকী। রোয়েরিখের

চরিত্রগুলির আধ্যাত্মিকতা ও আর্যপ্রেরণা ঐশ্বরিক নয়, মানবিক।

সমগ্রভাবে সিরিজটিতে প্রকাশ পেয়েছে মানবজাতির ঐক্য, শ্রম ও বীরকীর্তির নৈতিকতার কথা। প্রথম বৃহৎ এশীয় অভিযাত্রার পর শিল্পীর আঁকা অন্যান্য ছবিতেও এই কথাটাই প্রধান।

শিল্পীর চোখে সমস্ত অতিকথাই হল অতীতের স্মরণিকা, শ্রেয় ভবিষ্যতের স্বপ্নে জনচেতনার রূপায়ণ। কতকগুলি ক্ষেত্রে তিনি তাতে দেখেছেন প্রাচীনদের আশ্চর্য প্রাকৃতিক জ্ঞানের রূপকধর্মী উপস্থাপন, যে জ্ঞানের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের কাছে এখনো অজ্ঞাত। তাই রোয়েরিখের শিল্পপ্রতিমার সবখানি জটিলতা পর্যবসিত নয় অতিকথার একটা আলাদা ব্যাখ্যায়, এ হল অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্পর্ক নিয়ে শিল্পীর দার্শনিক মননের নান্দনিক উপলব্ধির প্রয়াস।

কারাভান জীবনের দৃশ্য, যাযাবর ছাউনি, লৌকিক উৎসব, স্থানীয় অধিবাসী ও তাদের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে নিসর্গচিত্র — পর্যটনকালে এ সবেতেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় শিল্পীর, তা রূপ নেয় তাঁর ক্যানভাস ও সাহিত্যকর্মে।

যেমন ১৯২৩ সালের একটি লেখায় রোয়েরিখ ভাগ্য গণনার একটি রেওয়াজের বর্ণনা দেন যার সঙ্গে রুশী লৌকিক রীতির সাদৃশ্য আছে। গঙ্গার স্রোতে দীপান্বিত সরা ভাসিয়ে নিজেদের ভাগ্য অনুমান করে মেয়েরা। দুই দশক পরে এই প্রসঙ্গ নিয়ে দেখা দিল 'গঙ্গায় প্রদীপ' (১৯৪৫) চিত্র, নীলাভ সবুজ বর্ণ আর অঙ্কনের মূর্তিময়তায় তা মুগ্ধ করে দর্শকদের।

খুবই কৌতূহলোদ্দীপক একটি ছবি 'তীর — পত্র' আঁকা হয়েছে আগুনে-লাল বর্ণপাতে। ইচ্ছে থাকলে এতেও 'প্রাচ্য নিগূঢ়বাদের' সমস্ত লক্ষণই আবিষ্কার করা সম্ভব। একটা খাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে শরসন্ধান করা হচ্ছে গভীর উপত্যকায়। খুবই পরিষ্কার যে অত উঁচু থেকে কোনো লক্ষ্যবেধই হতে পারে না, ধানুকী নিশ্চয় লড়ছে কায়াহীন প্রেতযোনির সঙ্গে। কিন্তু যাচিয়ে দেখলে ব্যাপারটা অনেক সহজ। রোয়েরিখ এঁকেছেন পাহাড়ের উঁচু চারণক্ষেত্র থেকে বাড়িতে সংবাদ পাঠাবার একটা প্রণালী যা আজো প্রচলিত। প্রয়োজনীয় খবর দিয়ে চিঠি বাঁধা হয় তীরে, আর নিপুণ হাতে ছাড়লে তা কয়েক মিনিটের মধ্যে পোঁছে যাবে স্বগ্রামে।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে অন্য প্রকারভেদের ছবি আছে শিল্পীর। দুর্গম পার্বত্য খাদ দিয়ে কিংবদন্তির দেশ শম্বলে খবর পাঠাচ্ছে তীরন্দাজ।

রোয়েরিখের শিল্পে বাস্তবানুগ নিসর্গ, ঐতিহাসিক ও দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্য বার বার মিশে থাকে অতিকথাশ্রিত উপাদানের সঙ্গে। এতে তাঁর শিল্পের মূল্যায়নে দেখা দেয় অতি বিপরীত সব মতামত, তবে শিল্পী নিজে কিন্তু কোনো আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধে পীড়িত নন। দিনলিপিতে তিনি বলেছেন: 'লোকে লেখে যে আমার মতবিশ্বাস কারো জানা নেই। কী বাজে কথা! বহু আগেই আমি আমার জীবনবোধ ব্যক্ত করেছি। তা বেশ, আরেকবার তার পুনরুক্তি করা যাক... পার্থিব উৎপাতের সমস্ত ঝঞ্ঝা সবিজয়ে উত্তীর্ণ হয় মহান শিল্পের মূল্যবোধ। আমরা যখন প্রেমে, সৌন্দর্যে, কর্মে জোর দিই তখন জানা থাকে যে আমরা আন্তর্জাতিক ভাষার একটা সূত্র বলছি। এই যে সূত্রটা রয়েছে যাদুঘরে আর রঙ্গমঞ্চে, প্রতিদিন তাকে জীবনের অন্তর্গত হতে হবে। সৌন্দর্যের পতাকায় খুলে যাবে সমস্ত 'পবিত্র তোরণ'। সৌন্দর্যের পতাকা নিয়ে আমরা চলি আনন্দভরে। সৌন্দর্যে আমরা জয়লাভ করব। আমরা সৌন্দর্যের পূজারী। সৌন্দর্যেই আমাদের ঐক্য। আর সত্যের পথকে অনুভব করে আমরা আসন্নকে স্বাগত করব স্মিতমুখে।'

রোয়েরিখের চিত্ররীতির ওপর অবশ্যই প্রভাব ছিল প্রাচ্যের। ভারতের চিত্রকলা নিবিড়ভাবে জড়িত ভারত নাট্যের সঙ্গে যেখানে মুদ্রা আর বর্ণের অনুষঙ্গ খুবই কঠোর, যুগ-যুগের প্রথাসিদ্ধতায় তাতে নিহিত হয়েছে এক-একটা অর্থব্যঞ্জক তাৎপর্য। রোয়েরিখের সৃষ্টিতে এটাই ভারতের অবদান, এখনো তার অধ্যয়ন হয় নি বিশেষ।

রোয়েরিখের ছবিতে আলো আর বর্ণ শুধু অচ্ছেদ্যই নয়, তারা ভাব ও আবেগেরও বাহক।

কিন্তু একথা ভাবলে ভুল হবে যে রোয়েরিখ প্রাচ্যের, বিশেষত ভারতের শিল্প ঐতিহ্যকে পুরোপুরি শিরোধার্য করেছিলেন। এটা কেবল তাঁর সৃষ্টিকর্মকে সমৃদ্ধ করেছে যেমন আগে করেছিল বাইজানটাইন, প্রাচীন রুশী চিত্রকলা অথবা পশ্চিমী শিল্পাচার্যদের কিছু কিছু আবিষ্কার। সমস্ত প্রভাব ও ঋণ গ্রহণেই তিনি সাতিশয় সার্থকতায় বিকশিত করে তুলতেন তাঁর মৌলিক বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব চিত্রশৈলী, নিজস্ব স্টাইল।

'উরস্বতী' ইনস্টিটিউট বছর পাঁচেক কাজকর্ম চালাতে না চালাতেই রোয়েরিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার আমন্ত্রণ পেলেন। ভূমিক্ষয়ে বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল মার্কিন কৃষির। এদিকে 'উরস্বতী' ইনস্টিটিউট থেকে যে উদ্ভিদসংগ্রহ পৌঁছেছিল আমেরিকার গবেষণা প্রতিষ্ঠানাদিতে তার ভেতর ছিল মধ্য এশিয়ায় সংগৃহীত খরা সইবার মতো নানা জাতের গাছপালা। তাতে আকৃষ্ট হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ, সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মৃত্তিকার উর্বর স্তরের হানিনিবারক গাছ গাছড়ার বীজ সংগ্রহের জন্য অভিযান সংগঠনের প্রস্তাব এল রোয়েরিখের কাছে।

নিকোলাই রোয়েরিখ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে ১৯৩৪ সালে আমেরিকায় যাত্রা করেন অভিযান সংক্রান্ত প্রশ্নাদি আলোচনার জন্য। সাধারণ আর্থিক ও টেকনিকাল ব্যাপারগুলো ছাড়াও পথ নির্বাচন রোয়েরিখের কাছে ছিল একটা মুশকিলের প্রশ্ন। ১৯২৫—১৯২৮ সালে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তাঁর এ আশঙ্কার হেতু ছিল যে খোটান অথবা লাসা হয়ে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি পৌঁছবার পথ তাঁর ক্ষেত্রে বন্ধ।

আমেরিকায় হর্ষ-বিষাদের নানা ঘটনাই রোয়েরিখ দেখলেন, শুনলেন। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির সাফল্য, চুক্তির অগ্রগতি খুশি করেছিল তাঁকে। কিন্তু পশ্চিমী জীবনের সাধারণ ধারা, নৈতিক অবনতি, মুনাফার জন্য উদ্দাম ধাবনে তিনি বিমর্ষ বোধ করেছিলেন। অর্থনৈতিক সংকট থেকে যে মন্দা চলছিল তাতে জ্ঞানপ্রচারণী কাজও রেহাই পায় নি। সক্ষোভে শিল্পী লেখেন:

'ডঃ ব্রাইটন আমায় স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ১৯৩০ সালে আমেরিকায় ,আমি তাঁকে বলেছিলাম: 'বর্বরদের কাছ থেকে সাবধান'। তারপর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে বহু বর্বর। ফিনান্সের চাপে অনুষ্ঠিত হয়েছে অপ্রতিকার্য অনেক দুষ্কর্ম... লজ্জার কথা, লজ্জার কথা। শিকাগোতে নগরের শিক্ষকদের বেতন দেবার জন্য নাকি কিছুই নেই। নিউ-ইয়র্কে গির্জা বিক্রি হয়েছে নিলামে। ক্যানসাস সিটিতে দরাদরি করে বিকিয়েছে ক্যাপিটোলি। কত মিউজিয়ম আর স্কুলই না বন্ধ! বিজ্ঞান ও শিল্পের কত কর্মীই না বহিষ্কৃত! তাহলেও ঘোড়দৌড় দেখতে এসেছিল পাঁচ লক্ষ লোক! লজ্জার কথা, লজ্জার কথা!'

নিউ-ইয়র্কে রোয়েরিখ মিউজিয়মও চলছিল গুরুতর বৈষয়িক টানাটানির মধ্যে। সংকটের প্রভাব পড়েছিল তার আয়ে, এতে ভবন নির্মাণের ঋণ পরিশোধ আটকে যাচ্ছিল। আদালতের শরণ নিয়ে সেটা মুলতবি রাখা গিয়েছিল কয়েক বছর।

মনে হল সংকট বুঝি কাটল। কিন্তু দুশ্চিন্তা ঘটাল ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর কিছু সদস্য, বিশেষ করে লুই হর্শের আচরণ। ইনি দেখতেন আর্থিক দিকটা।

এই ব্যবসায়ীটি কয়েক বছর আগে রোয়েরিখ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটির ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখান এবং যেসব আর্থিক সমস্যা বিজ্ঞান ও শিল্পের লোকেরা সাধারণত এড়াতে পারলে বাঁচেন, তাতে ইনি প্রথম দিকে কম সাহায্য করেন নি। কয়েক বছরের মধ্যে মিউজিয়মের সমস্ত অর্থনৈতিক দিকটা কুক্ষিগত করেন হর্শ। নিউ-ইয়র্কের কারবারী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর, অট্টালিকা নির্মাণের তদারকি আপনা থেকেই এসে পড়ে তাঁর কর্তৃত্বে।

রোয়েরিখ যখন দীর্ঘকালীন অভিযাত্রায় ছিলেন, হর্শ তখন বাড়ির পরিকল্পনা বদলিয়ে আরো পাঁচটা তলা যোগ করেন তাতে। কিন্তু বাড়ির আয় তাতে বাড়ে নি, শুধু বেড়েছিল ব্যাঙ্কের কাছে দেনা। সেই কারণে হর্শ ও তাঁর পক্ষের কিছু লোক ফ্ল্যাটের ভাড়া বাড়ানো, বার সমেত একটি রেস্তোরাঁ খোলা এবং সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী প্রতিষ্ঠানের জন্য জায়গা কমাবার সিদ্ধান্ত নেন। রোয়েরিখের সমর্থনে পরিচালক পরিষদ তার তীব্র বিরোধিতা করে। দেখা দিল চূড়ান্ত রকমের উত্তেজিত পরিস্থিতি।

রোয়েরিখ নিউ-ইয়র্ক এলে হর্শ তাঁর ব্যবসায়িক পরিকল্পনা থেকে যেন-বা বিরতই হলেন। শুধু তাই নয়, রোয়েরিখের আসন্ন অভিযাত্রায় সক্রিয় অংশও নিলেন তিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি মন্ত্রী, ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম উদ্যোক্তা জি. ওয়ালাসের সঙ্গে ভালো পরিচয় ছিল হর্শের। তাঁর কাছ থেকেই অভিযাত্রার বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য আমেরিকায় আসার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন রোয়েরিখ। অভিযাত্রার সমস্ত প্রশ্নই মীমাংসিত হয় কার্যকরীভাবে। তদুপরি ওয়ালাস এবং হর্শ সংস্কৃতি রক্ষার চুক্তিকে প্রণোদিত করারও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেত যে হর্শ পরিচালক পরিষদের আস্থা ফিরিয়ে এনে আগের মতোই আর্থিক ব্যাপারগুলো চালাতে চাইছেন। তবে তেমন সহজ ছিল না হর্শকে সরানো। অট্টালিকা নির্মাণে তিনি শেয়ার বাজারের কিছু কারবারীকে ভেড়ান এবং তাদের সঙ্গে একত্রে হাত করেন বেশ মোটা রকমের শেয়ার, যাতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ভোট দেবার অধিকার থাকে তাঁদের।

নিউ-ইয়র্কে নিকোলাই রোয়েরিখের সময় কেটে যাচ্ছিল অতি দ্রুত। সকাল সকাল উঠে অক্লান্ত খাটার অভ্যাস তাঁর যায় নি। নিউ-ইয়র্কে রোয়েরিখ মিউজিয়মের সহসভাপতি জ. ফস্‌দিক শিল্পী সম্পর্কে বলেছেন:

'ও'র আমেরিকা আসার দিনটা থেকে তাঁর কাছে আগত বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছি আমি, তাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপের সময়েও উপস্থিত থেকেছি প্রায়ই। স্বল্পবাক্‌ হলেও নিকোলাই রোয়েরিখ ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রের সমস্যাদি অন্তরের সঙ্গে প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করতেন, অথচ আপোসে যেতেন না কখনো।

'সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি আর টেলিফোন আসত অবিরাম। আমার সঙ্গে তিনি অনেক খেটেছেন, লিখতেন, শ্রুতিলিখন দিতেন, আলোচনা করতেন প্রয়োজনীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপার নিয়ে। এমনকি স্পষ্টতই যাঁরা তাঁর শত্রু, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেও আপত্তি করতেন না। তাঁদের কথা শুনতেন ধীরস্থির চিত্তে, শুভেচ্ছার সঙ্গে, নিজের পরামর্শ দিতেন তারপর সখেদে বলতেন, যতই করি পরামর্শ তো ওরা নেবে না, যাবে নিজেদের বাঁকা পথে, চোট খেয়ে

কপাল ফোলাবে। আশ্চর্য মৃদু কিন্তু অব্যর্থ পরিহাস করতে পারতেন তিনি। অল্প কয়েকটা কথায় সহকর্মীদের গাফিলতি দেখিয়ে দিতেন এবং এমনভাবে যে তারাই হেসে উঠত সর্বাগ্রে। রোয়েরিখের সঙ্গে কাজ করা ছিল সহজ এবং আনন্দের ব্যাপার, সময় কেটে যেত অলক্ষ্যে, যদিও মাঝে মাঝে মনে হত উনি দিনকে লম্বা করে দিতেন, এতই কাজ সারতেন তার ভেতর।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোয়েরিখ থাকেন নি বেশি দিন। ১৯৩৪ সালের ২১ এপ্রিল বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁদের তিনি বলেছিলেন:

'...দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর দিকে তাকান। কী আমরা দেখি প্রথম পৃষ্ঠায়? দেখি যুদ্ধ, অপরাধ, ধ্বংস, বিদ্বেষের খবর নিয়ে বিরাট বিরাট শিরোনাম। তার মানে কি এই নয় যে খুনজখম, ভাঙচুর, বীভৎসতার সংবাদেই আধুনিক সমাজের আগ্রহ। এরূপ অবস্থায় শুধু লোকে নয়, উঠতি পুরুষেরাও ছোটো থেকেই এই শিক্ষায় মানুষ হচ্ছে যে যুদ্ধ, মানববিদ্বেষ, হত্যা, বিষপ্রদান এবং যতকিছু অপরাধ সোচ্চার শিরোনামের যোগ্য, স্থান পায় তারা প্রথম পাতায় আর ইতিবাচক যাকিছু তাদের যেন সামাজিক গুরুত্ব নেই।'

১৯৩৪ সালের মে মাসে নিকোলাই রোয়েরিখ নতুন অভিযাত্রার নেতৃত্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন জাপানে। তাতে ছিলেন ইউরি রোয়েরিখ এবং ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু উদ্ভিদ্‌বিদ। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল বালিয়াড়িতে জন্মানো উদ্ভিদের বিশ্লেষণ এবং যেসব জাত মরুর বিস্তার ঠেকাতে পারে তাদের সংগ্রহ।

রোয়েরিখ লিখেছেন: 'এ কাজটা গুরুত্ব ও উদ্যোগ সহকারে হাতে নেবার সময় হয়েছে। বন এবং সাধারণভাবে উদ্ভিদ জগতের প্রতি মানুষের অজ্ঞ ও হিংস্র আচরণের ফলে মরুভূমি বেড়ে উঠেছে একটা অশুভ আয়তনে। দেখে অদ্ভুত লাগে যে তরুহীনতা ক্রমেই ঘুচিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর রক্ষণী ও হিতকর উপরিভাগ।'

অভিযাত্রার কাজের প্রথম ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয় মাঞ্চুরিয়ার উত্তরাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ থেকে তদবিরের দৌলতে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র পাওয়া গেল টোকিওতে। অভিযাত্রার সঙ্গে রোয়েরিখ মাঞ্চুরিয়ায় এসে এগুতে থাকলেন উত্তর-পশ্চিম দিকে।

প্রায় দালাই-নর হ্রদ পর্যন্ত এল অভিযাত্রা। বার্গার স্তেপভূমি, খিনগান গিরিশিরার পশ্চিম মালভূমির নিরীক্ষায় আবিষ্কৃত হল জলাভাব সহনশীল কয়েক জাতের গুল্ম এবং পশুখাদ্যের উপযোগী দানাশস্যের দুর্মর উদ্ভিদ। ঔষধি গাছগাছড়া সংগ্রহ নিয়েও কাজ চলে এবং প্রাচীন গাঞ্চুর মঠে পাওয়া গেল তিব্বতী ওষুধের এক অতি দুর্লভ পুঁথি। সেটি নকল করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সোভিয়েত সীমান্তের কাছাকাছি এসে পড়ল অভিযাত্রা। রোয়েরিখের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর কড়া নজর রেখেছিল জাপানী কর্তৃপক্ষ, প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করে তারা অভিযাত্রার গতিবিধির স্বাধীনতা সংকুচিত করে, প্রয়োজনীয় মালপত্রের স্বাভাবিক সরবরাহে বাধা দেয়।

ক্রমবর্ধমান অসুবিধার কারণ বোঝার জন্য ১৯৩৪ সালের জুলাইয়ে রোয়েরিখকে যেতে হল হার্বিনে।

হারবিনে প্রায় পাঁচ মাস থেকেও রোয়েরিখ কিছু করে উঠতে পারলেন না। চীনা ভূখণ্ডে অভিযাত্রা নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের সঙ্গে কথা কয়ে নিতে হল তাঁকে। এই করে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে রোয়েরিখ এলেন পিকিঙে, সেখানে উত্তর-পশ্চিম চীনের অঞ্চলগুলিতে আরো দীর্ঘকালীন দ্বিতীয় যাত্রার জন্য প্রস্তুতি শুরু হল।

কিন্তু হারবিনে রোয়েরিখের উপস্থিতির কথা একটু বিশদে বলা আবশ্যক। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অন্তর্ঘাতের মুখোমুখি এসে পড়লেন তিনি, দেখলেন শ্বেত দেশান্তরীদের আত্মবিক্রীত ওপরমহল কীভাবে তাদের অসাধু কাজকর্ম চালাচ্ছে।

নির্বিকার থাকতে পারেন নি রোয়েরিখ। দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিতে থাকেন তিনি, প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর সহযোগিতায় হারবিনে গঠিত হয় চুক্তি ও 'শান্তির নিশানের' দূর প্রাচ্য কমিটি।

রোয়েরিখের ক্রিয়াকলাপে সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াশীল দেশান্তরী চক্রটার পক্ষ থেকে একরাশ মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করা হয়, আর তাদের সমর্থন করে স্থানীয় জাপানী পত্রিকা 'হারবিন টাইমস'। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে মাঞ্চুরিয়া ফেরার অনুমতি চাইলেন শিল্পী। মন্ত্রক সৌজন্য সহকারে জানাল: 'যাকিছু ঘটেছে তা সবই পত্রিকার কর্মী এবং হারবিনস্থ রুশী দেশান্তরীদের শত্রুস্থানীয় গ্রুপটার পরিপূর্ণ অজ্ঞতা ও অনুপলব্ধির ফল। এরূপ রিপোর্ট আমাদের কাছে থাকায় আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পেরে আমরা সুখী যে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর হবে না।'

এটা নেহাৎ একটা মামুলী কূটনৈতিক স্তোকের মতো যা প্রমাণিত হয় যখন দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ আর চুক্তির প্রসঙ্গাদি নিয়ে রোয়েরিখ হারবিন থেকে 'পবিত্র প্রহরা' বইটি প্রকাশ করতে যান।

বইটি যখন ছাপা হয়ে গেছে, জাপানী সেন্সর তখন আটক করে তার সমস্ত কপি। পরে ১৯৩৬ সালে ভারত থেকে রোয়েরিখ ইউরোপে লিখে পাঠান যে হারবিন থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে বইটি মাঞ্চুরিয়ায় নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকাভুক্ত। ছয় মাস না যেতেই রোয়েরিখ জানতে পেলেন যে একটি পুস্তকব্যবসায়ী ফার্ম কপিগুলির একাংশ কায়দা করে প্যারিসে পাঠিয়ে দিতে পেরেছে, সেখানে তা বিক্রি হচ্ছে।

১৯৩৪ সালের নভেম্বরে হারবিন ছাড়েন রোয়েরিখ কিন্তু সচকিত ভিমরুলের চাক শান্ত হতে পারে নি। সেই থেকে রোয়েরিখ সম্পর্কে যত কিছু অভিসন্ধিপরায়ণ কল্পনা ও মিথ্যা লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার অব্যর্থ সূত্র এসেছে হারবিনের দেশান্তরীদের কাছ থেকে। তাদের কলমবাজেরা বিশেষ কেরদানি দেখিয়েছে রোয়েরিখের 'গুপ্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘ', তার 'স্বধর্ম ত্যাগ' ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ নিয়ে হল্লা তুলে। ইয়েলেনা ইভানোভনা রোয়েরিখের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে তিনি আদিয়ারের অধ্যাত্মবাদী কেন্দ্রের পরিচালিকা, তাঁর উদ্দেশ্য 'সত্যকার খিস্টে ধর্ম' উচ্ছেদ করা, অথচ সত্যি বলতে কি ইয়েলেনা ইভানোভনা আদিয়ারে যান নি পর্যন্ত।

রোয়েরিখের দেশাত্মবোধ এবং তাঁর সোভিয়েত অনুরাগী মনোবৃত্তির প্রতি খুবই শত্রুতা পোষণ করে রুশ দেশান্তরীদের পাণ্ডারা। রোয়েরিখের নামের সঙ্গে জড়িত বহু সমিতি সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রসঙ্গে মৈত্রীর অবস্থান নেয় এবং দেশান্তরীদের নতুন পুরুষেরা ছিল তাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি সহানুভূতিশীল। স্বয়ং নিকোলাই রোয়েরিখ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সতর্ক করে বলেন যে গোষ্ঠীগুলির পক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব অবলম্বন হল তাঁর ব্যক্তিগত সমর্থনের অত্যাবশ্যক শর্ত।

তিরিশের দশকে দেখা গেছে কীভাবে কারো সংশোধনাতীত সোভিয়েত-বিরোধিতা বা ফ্যাসিজমের প্রতি দরদের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলে রোয়েরিখ এমনকি তাঁর বহু বছরের সহকর্মীর সঙ্গেও মেলামেশা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন।

ঘোঁট পাকানো দেশান্তরী রাজনীতিবাজদের

গলায় রোয়েরিখ এমনই কাঁটা হয়ে ঠেকেছিলেন যে শিল্পীর মৃত্যুর পরেও তারা ক্ষমা করতে পারে নি স্বদেশের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিণাম বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর দূরদৃষ্টি। ১৯৫৬ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'রুসকায়া মিস্‌ল্‌' নামে সোভিয়েত-বিরোধী শ্বেত দেশান্তরী পত্রিকায় ছাপা হয় সের্গেই মাকোভ্‌স্কির প্রবন্ধ: 'কে ছিলেন রোয়েরিখ?' এবং 'রোয়েরিখ সম্পর্কে আরো কিছু'। সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সময়টা। বহু কাল রোয়েরিখ সম্পর্কে নীরব থাকার পর স. মাকোভ্‌স্কি আচমকা তাঁর কথা পাড়লেন সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর মরণোত্তর প্রদর্শনীর ঠিক কিছু আগে। এটা যে আকস্মিক কিছু নয় তা বোঝা যায় প্রবন্ধলেখক যে পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন তা থেকে। এসবই হল ডাইনে বাঁয়ে রোয়েরিখের হীরক বিতরণ, কোটিপতিদের পক্ষ থেকে কল্পনাতীত টাকায় রোয়েরিখের ছবি ক্রয়, এবং তাঁকে নিয়ে পুস্তক প্রকাশ, সিংহাসনারূঢ় রোয়েরিখের সামনে পুণ্যলোভীদের হামাগুড়ি নিয়ে শ্বেত দেশান্তরী সেই শস্তা আষাঢ়ে গল্প। এইসব 'রত্নরাজির' সঙ্গে মাকোভ্‌স্কি নিজের পক্ষ থেকে এই তথ্য যোগ দিয়েছেন যে নিকোলাই রোয়েরিখ 'লাতভীয় ডাইন' আর 'বড়োরুশী বেনিয়ার' বংশধর, 'ভাসা ভাসা তাঁর শিক্ষা', 'ধীশক্তিতে দুর্বল', ইংরেজি ভাষা জানেন না, প্রেততত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠে বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়েছেন।

এই অপার গাঁজাখুরি ছাড়াও লেখক এক বিদ্বেষপরায়ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, যথা: যে মার্কিন ক্রোড়পতিদের তিনি বোকা বানিয়েছিলেন তাদের চোখ খোলায় নাকি 'ভরাডুবি' হয়েছে রোয়েরিখের। প্রবন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ না রেখে দাবি করা হয় যে রোয়েরিখ 'সেখানে (ভারতে — লেখকবৃন্দ) সবকিছু সভ্যতা থেকে অনেক দূরে সপরিবারে আটকে পড়েছেন, থাকেন সেখানে 'স্বহস্তে' খেটে খাওয়া শবজি-চাষী জমিদারের মতো, কাজে লাগান সেখানকার লোকেদের যারা এখনো পড়ে আছে আধা-ভূমিদাস অধীনতায়'।

রোয়েরিখের ছবি যখন ভারত থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পথে তখন মাকোভ্‌স্কি কৃত এ 'আবিষ্কার' হারবিনের মহিলাদের শপথ করা সাক্ষ্যের চেয়ে কিছুটা গুরুতর, যাঁরা নাকি সুঙ্গারি নদীর জলের ওপর দিয়ে রোয়েরিখকে হেঁটে যেতে দেখেছেন। সেটা আরো এইজন্য যে লেখক স্বয়ং পাছে অবোধ্য থেকে যান (এবং এ ধরনের সুপ্রাকৃত নির্লজ্জ মিথ্যার কারণটা বোঝা সত্যিই তত সহজ নয়) এমনতরো আশংকায় তাড়াতাড়ি করে 'মেলে ধরেছেন নিজের তাস', প্রশ্ন তুলেছেন: 'শিল্পী-মনস্বী ও আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা রোয়েরিখ ডুবে গেলেন কেন?' জবাবটা তাঁর তৈরিই ছিল: 'তিব্বতের পথে রোয়েরিখ যখন মস্কোয় আসেন, বিপদটা ঘাড়ে এসে পড়ে তার কিছু পরেই। সম্ভবত কারণটা এখানেই...' এবং এই 'অনুমানের' অব্যবহিত পরেই মাকোভ্‌স্কি আশ্বাস দিয়েছেন মস্কো সফর মারফত রোয়েরিখ যে সন্দেহের উদ্রেক করেছিলেন তা 'অসঙ্গত'।

কিন্তু ফেরা যাক রোয়েরিখের থেমে যাওয়া অভিযাত্রায়। পিকিঙে তাকে পুনঃসজ্জিত করে রোয়েরিখ ১৯৩৫ সালের মার্চে কালগান হয়ে রওনা দিলেন গোবি মরুভূমির সীমান্তের দিকে। গোবির প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি দেখা গেল জলাভাব সহনশীল উদ্ভিদ সংগ্রহের পক্ষে চমৎকার জায়গা। অভিযাত্রা কাজ চালাল কখনো খিনগান পাহাড়তলিতে, কখনো মরুভূমির গভীরে বহু দূরে চলে গিয়ে। কয়েক মাস ধরে পরীক্ষিত হয় ভূমিক্ষয় রোধের সংগ্রামে মূল্যবান তিন শতাধিক

জাত, সংগৃহীত হয় বহু ঔষধি গাছগাছড়া, বীজের প্রায় ২,০০০ পার্শেল পাঠানো হয় আমেরিকায়।

বরাবরের মতোই রোয়েরিখ অভিযাত্রাকালে স্কেচ করেন অনেক, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালান, ভাষাতত্ত্ব ও লোকযান বিষয়ে মালমশলা সংগ্রহ করেন। সতেরো মাসের মধ্যে রোয়েরিখ 'দিনলিপির পাতা'র জন্য লেখেন দু'শ বাইশটি স্কেচ। তার অনেকগুলিতে আছে অভিযাত্রার বর্ণনা, কয়েকটিতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রশ্নও আলোচিত হয়েছে।

১৫ এপ্রিল গোবি মরুর বালির মাঝখানে অভিযাত্রী শিবিরের ওপর উড়ল 'শান্তির নিশান'। এই সময়ে নিয়মিত সম্মেলনের পর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট এবং দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রপতিরা সই দেন রোয়েরিখ চুক্তিতে। রেডিওতে রুজভেল্ট বলেন:

'বিশ্বের সমস্ত দেশ কর্তৃক এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পেশ করে আমরা চেষ্টা করছি যাতে তার সর্বস্বীকৃতি হয়ে দাঁড়ায় বর্তমান সভ্যতা রক্ষার অতি জরুরী নীতি। দলিলের ভাষ্যাংশের চেয়েও তার তাৎপর্য গভীর।'

আর নিকোলাই রোয়েরিখ চুক্তি স্বাক্ষরের দিনটা উপলক্ষে পর্যটন বৃত্তান্তে লিখলেন: 'বারম্বার এই উক্তিতে ক্লান্ত হব না যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছাড়াও প্রয়োজন জনসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সাংস্কৃতিক মূল্যে ছোটো থেকে বড়ো সমস্ত জীবনকেই সুশোভিত ও সমুন্নত করে। তাই তার জন্য সক্রিয় প্রযত্ন নিতে হবে সবাইকেই।'

সাফল্যের সঙ্গে অভিযাত্রা শেষ করে রোয়েরিখ সাংহাইয়ে এলেন ১৯৩৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। এলেন খুবই উদ্বিগ্নচিত্তে কেননা গ্রীষ্মের শেষাশেষি নিউ-ইয়র্কস্থ মিউজিয়মের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, আর এমন কথা শিল্পীর কানে এসেছিল যে তাঁর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সংগঠন থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা বিতাড়িত হয়েছেন। সাংহাইয়ে সমর্থিত হল খবরটা। তাড়াতাড়ি করে ইউরি ও নিকোলাই রোয়েরিখ রওনা দিলেন ভারতে।

অচিরেই কুলুতে পৌঁছলেন তাঁরা। নিউ-ইয়র্কের ঘটনাবলির বিশদ বিবরণ সেখানে তাঁরা পেলেন। জানা গেল, হর্শ যিনি অমন সাগ্রহে মিউজিয়মের আর্থিক দিকটা চালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, অট্টালিকার আয় নিয়ে পরিচালকদের সঙ্গে সংঘাতের পর তিনি বুঝেছিলেন যে অতি উঁচু পদের সহযোগী ছাড়া কিছুই তিনি করে উঠতে পারবেন না। গগনচুম্বী সৌধটি এবং মিউজিয়মের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী পুরোপুরি আত্মসাৎ করার মতলব ফেঁদেছিলেন তিনি। একটু গা ঢাকা দিয়ে রইলেন সুযোগের অপেক্ষায়। রোয়েরিখের অভিযাত্রাকে তিনি গণ্য করলেন তেমন সুযোগ বলে। তাই এ অভিযাত্রা সংগঠনে মার্কিন কারবারীটি অতটা উদ্যোগী ও তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

অভিযাত্রা উত্তর চীনের সুদূর মরু অঞ্চলে সরে যেতেই অট্টালিকাটি হাত করার একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা কাজে লাগাতে শুরু করলেন হর্শ। অচিরেই জোটালেন এই অসাধু কিন্তু খুবই 'বাণিজ্যিক' দুষ্কর্মটার সহায়ক। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং মার্কিন কৃষি বিভাগের মন্ত্রী জি. ওয়ালাস।

দু'জনে শুরু করলেন রোয়েরিখকে তাঁর নিউ-ইয়র্কস্থ সহকর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা নিয়ে। সে উদ্দেশ্যে অভিযাত্রার অবস্থিতি বিষয়ে অতি গোলমেলে সব খবর দেওয়া হতে থাকল কৃষি বিভাগ মারফত আর সবচেয়ে গহন পথ দিয়ে অভিযাত্রা নিয়ে যাবার নির্দেশ গেল নিকোলাই রোয়েরিখের কাছে।

মিউজিয়মের কাজকর্ম থেকে রোয়েরিখকে সাময়িকভাবে সরিয়ে দেবার পর 'শীর্ষস্থানীয় চুক্তিবদ্ধ পক্ষেরা' তাঁদের মতলব হাসিল করতে নামলেন। ব্যাপারটা ঘটল বিদ্যুদ্‌গতিতে কেননা আগেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন হর্শ। গগনচুম্বী অট্টালিকাটার নিয়ন্ত্রক শেয়ার ছিল সাত জন: ন. ক. রোয়েরিখ, ইয়ে. ই. রোয়েরিখ, জ. গ. লিখ্‌টমান, ম. ম. লিখ্‌টমান, ফ. র. গ্রাণ্ট, ল. হর্শ এবং ন. হর্শের মধ্যে বণ্টিত। রোয়েরিখ দম্পতি আর্থিক ব্যাপার চালাবার পূর্ণ অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন পরিচালকমণ্ডলীকে। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতারণা করে হর্শ রোয়েরিখ দম্পতি, লিখ্‌টমান দম্পতি এবং গ্রাণ্টের শেয়ার লিখিয়ে নেন নিজের স্ত্রীর নামে। প্রতিষ্ঠাতারা সেটা অনুমান করতে পারেন নি কেননা আগে থেকেই তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল যে মিউজিয়ম বিনা ক্ষতিপূরণে তুলে দেওয়া হবে রাষ্ট্রের হাতে, আর সে ব্যবস্থা করার ভার ছিল হর্শের ওপর। ধরে নেওয়া হয় যে সেই ব্যবস্থাই তিনি করছেন।

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মে হর্শ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা নিয়ন্ত্রক শেয়ার অধিকারীদের 'বৈধ' স্বত্ববলে কোনোরকম জানানি না দিয়ে মিউজিয়মের পরিচালক পরিষদ থেকে অপসারিত করেন নিকোলাই রোয়েরিখ এবং আর চারজন প্রতিষ্ঠাতাকে। এক রাতের মধ্যেই হর্শ মিউজিয়ম থেকে রোয়েরিখের সমস্ত ছবি (সংখ্যায় সহস্রাধিক) পাচার করে নতুন তালা লাগাবার পরই মাত্র পরিচালকেরা তাঁদের বরখাস্তের খবর জানতে পারেন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকে দেবার সিদ্ধান্ত সমেত সমস্ত দলিলপত্রও নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

হর্শ এবং তাঁর সহদুষ্কর্মীদের ভয় ছিল না কোনো। 'স্বাধীন উদ্যোগের' আইনের দিক থেকে অপকর্মটা শাস্তিযোগ্য নয়। রোয়েরিখ আমেরিকায় এলে হয়ত সত্যোদ্‌ঘাটনে সহায়তা করতে পারতেন, কিন্তু প্রতিকার হত না ব্যাপারটার। তাছাড়া রোয়েরিখের আগমন ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারত ধুরন্ধর কারবারীরা। তাদের হিতার্থে খুঁজে বার করা হল আইনের কী একটা ধারা, যাতে অভিযাত্রার জন্য রোয়েরিখ যে টাকা পেয়েছিলেন তাতে প্রকাণ্ড একটা রাষ্ট্রীয় শুল্ক চাপতে পারে। সেটা শোধ করেই তিনি নির্ভয়ে দেখা দিতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আর শোধ না করলে গ্রেপ্তার হবেন এমন হুঁশিয়ারি পেলেন রোয়েরিখ।

পরিচালকদের অপসারণ করায় হর্শের বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা হয় নিউ-ইয়র্কে, কিন্তু ফল মেলে নি কিছু।

কুলুতে নিউ-ইয়র্কের ব্যাপারটায় বিশদ আলোকপাত করে এবং কী করণীয় তার পরামর্শ দিয়ে বিস্তর চিঠি এসে পড়েছিল রোয়েরিখের জন্য। দিনলিপিতে তিনি লিখলেন:

'মার্কিন 'ক্রিয়াকলাপ' সম্পর্কে বড়ো বেশি লেখা হচ্ছে না কি? কিন্তু নানা চিঠি এসেছে, ইচ্ছে হচ্ছে বিরলতম এক ডাকাতির মূল কথাটা সংক্ষেপে বলতে। মিউজিয়ম নিয়ে অতি সূক্ষ্ম এক জালিয়াতি ফাঁদে হর্শ। সরকারকে সে ভুল বোঝায় এবং অভিযাত্রার টাকার ওপর কী একটা ট্যাক্স নিয়ে মামলা ঠোকে যদিও সবাই জানে যে অভিযাত্রার টাকায় ট্যাক্স বসে না। মনে মনে হর্শ ভালোই জানে যে মিথ্যে বলছে, জোচ্চুরি করছে, কিন্তু সে এক খাঁটি মার্কিন দুর্বৃত্ত। ভালোই সে জানে যে কর্মকর্তাদের পুরো একটা গোষ্ঠীকে লুট করে তাদের গড়া কর্মযজ্ঞ থেকে তাদেরই বিতাড়িত করা কতটা হীন কাজ, কিন্তু গ্যাঙ্গস্টারবৃত্তির নীতিমালারই জয়। মন্ত্রীদের মধ্যে এমন সব লোক পাওয়া যায় যারা রহস্যময়

কারণবশত টেলিফোন করে করে জ্বালায় বিচারকদের, অন্যায্য রায় দেবার দাবি করে। ন্যায়বিগর্হিত বিচারকদের কথা বলে আর কী হবে! কিন্তু বিশেষ মজার ব্যাপার এই যে লোকে চমৎকার জানে যে হর্শ জোচ্চোর, বোঝে তার সমস্ত কারসাজি আর ধড়িবাজি, অথচ চুপ করে থাকে... কী দাঁড়াচ্ছে? একদল দুমুখো, দ্বিতীয় দল মুখ বুঁজে থাকে, তৃতীয়রা আপোস খোঁজে! যেন সু আর কু আপোসে দিন কাটাতে পারে।'

নিকোলাই রোয়েরিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান নি। নিউ-ইয়র্কের ঘটনায় কিছু সহকর্মীর প্রতিক্রিয়ার খতিয়ান টেনে তিনি 'দিনলিপির পাতায় খোজা নাসিরুদ্দিন সম্পর্কে বহুল প্রচারিত একটি গল্প উদ্ধৃত করেছেন: খোজার গাধাটি যখন চুরি যায়, পড়শীরা তাকে খুব ভর্ৎসনা উপদেশ দান করে। কেউ বললে আরো মজবুত চাবি লাগিয়ে বাড়ি ঘিরে উঁচু পাঁচিল তোলা দরকার। কেউ বললে গৃহকর্তা বড়ো নিশ্চিন্তে ঘুমায়। এসব শুনে টুনো খোজা হিতৈষীদের বললে: 'আপনারা ঠিক কথাই বলছেন, তবে সবই অতীত নিয়ে, আজকে আপনাদের কথায় কোনো লাভ আর হবে না। তা থেকে শুধু দাঁড়াচ্ছে এই যে সব দোষ আমার, চোরের কোনো দোষ নেই।'

৯। 'ওদের সঙ্গে থাকতে পারলে হত...'

১৯২৬ সালে রোয়েরিখকে হঠাৎ মস্কোয় দেখে তাঁর পরিচিতদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

'নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ, আপনি কি তাহলে বরাবরের মতো দেশে চলে আসা স্থির করলেন?'

শিল্পী জবাব দিয়েছিলেন:

'কিন্তু আমি তো বিদেশে বাসা পাতি নি। আমি ঘুরে বেরিয়েছি, নতুন ভ্রমণও ঠিক করছি, কিন্তু রাশিয়া থেকে একেবারে চলে যাওয়ার কথা আদৌ আমার মাথায় আসে নি।'

রোয়েরিখ নিজে যে হিসেব করেছেন তাতে তাঁর জীবনটা এইরকম: বেয়াল্লিশ বছর — রাশিয়া; সতের — ভারত; ফিনল্যান্ড — দু'বছর; আমেরিকা — তিন; চীন — দুই; তিব্বত — দেড়; মঙ্গোলিয়া — এক; ফ্রান্স — এক; ইংলন্ড — সোয়া বছর; সুইডেন — ছ' মাস; সুইজারল্যান্ড — ছ' মাস; ইতালি — তিন মাস। তাছাড়া তিনি গেছেন জার্মানি, হল্যান্ড, বেলজিয়ম, মিশর, জিবুতি, জাপান, হংকং, সিংহল, জাভা, বালি, ফিলিপাইন।

তবে ১৯৩৪—১৯৩৫ সালের অভিযাত্রার পর রোয়েরিখ ভারত আর ছাড়েন নি। ক্রমাগত অভিযাত্রায় ক্লান্ত হয়েছিলেন বলে নয়, কারণ তোড়জোড় শুরু করেছিলেন স্বদেশে ফেরার জন্য। প্রথম দৃষ্টিতে যা মনে হয়, ব্যাপারটা ছিল তার চেয়ে অনেক জটিল। বিদেশে তাঁর সাংস্কৃতিক কাজ গুটিয়ে আনতে, সাংস্কৃতিক মূল্য রক্ষার চুক্তির যে কথাটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা ছেড়ে দিতে তিনি চান নি। 'উরস্বতী' ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যেসব বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা ছিন্ন করারও ইচ্ছে ছিল না তাঁর। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরবেন ঠিক করেছেন একথা খোলাখুলি ঘোষণা করলেই বিদেশে তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ওপর আঘাত হানার মতো লোকের অভাব হত না।

দলিলপত্র সত্বর তৈরি হবে এমন ভরসাও ছিল না রোয়েরিখের। ঔপনিবেশিক ভারতে সোভিয়েত কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিল না তখন, আর লন্ডন মারফত কিছু করার তো কথাই ওঠে না।

খাস ভারতে নিকোলাই রোয়েরিখের ছিল বিপুল জনপ্রিয়তা। সেখানকার প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাম্প্রতিক জীবন অনুশীলন করে শিল্পী ভারতের ঐতিহ্যগত বিশ্ববীক্ষা এতটা আত্মস্থ করেছিলেন যে তিনি যেমন কুলু উপত্যকার সাধারণ লোকেদের কাছে তেমনি দেশের প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছেও হয়ে উঠেছিলেন তাদের আপন জন।

ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রদর্শনীতে লোক হত প্রচুর, বহু মিউজিয়মে তাঁর আঁকা ছবি ছিল, কতকগুলিতে তো স্মারক কক্ষই ছিল তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে। অনেক ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বেরুত রোয়েরিখের প্রবন্ধ, তাঁকে নিয়ে লেখা সন্দর্ভ। তদুপরি শিল্পীর নামের সঙ্গে সাধারণত যোগ করা হত 'গুরু', এমনকি 'গুরুদেব' বিশেষণ। জওহরলাল নেহরু, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, এস. সরস্বতী, স্বামী রামদাস, ও. গাঙ্গুলী, স্বামী ওঙ্কারনাথ, স্বামী জগদিশ্বরানন্দ, এস. বর্মা, এস. কে. চ্যাটার্জি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এন. মেহতা, এন. বসু, আর. ট্যান্ডন, এইচ. ভট্টাচার্য, সি. সিঙ, আর. রাওল, এ. গোবিন্দ, কে. তাম্পি, অসিত কুমার হালদার, জগদীশ বসু প্রভৃতি বহু ভারতীয় দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী ছিলেন তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত অথবা পত্রালাপ চালাতেন। প্রায়ই তাঁর কাছে অনুরোধ আসত বইয়ের ভূমিকা লিখে দিতে, অথবা কোনো একটা প্রসঙ্গ নিয়ে রেডিওতে বলতে বা কাগজে লিখতে।

ভারতীয় জনগণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রোয়েরিখ লাভ করেছিলেন এইজন্যও যে ভারতের ভবিষ্যতে তাঁর বিশ্বাস ছিল, সমর্থন করতেন তাঁর মুক্তি আন্দোলনের নায়কদের, ভারতের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কৃতিত্ব প্রচার করে লেখা ছাপাতেন বিদেশে। এসবের ফলে রোয়েরিখকে বিশ্বাস করার যথেষ্ট ভিত্তি ছিল ভারতের পুরোধা ব্যক্তিদের, তাঁর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের পোষকতা করতেন তাঁরা। একবার অভিযাত্রা থেকে ফেরার পর রোয়েরিখকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

'...মধ্য এশিয়ায় সুকঠিন অভিযাত্রার পর আপনি নিরাপদে আপনার আশ্রমে ফিরেছেন বলে আনন্দিত। আপনাকে ঈর্ষা না করে পারি না। পৃথিবীর সুদূর যেসব অঞ্চলে আপনি থেকে থেকেই আপনার বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালান সেখানকার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির তুলনা হয় না। আমার বয়স হওয়ায় এবং শিক্ষায়তনে কাজের ফলে প্রকৃতির ওপর বীরচিত্ত মানুষের বিজয়ের বৃত্তান্ত পড়েই চরিতার্থ করতে হয় আমার কৌতূহল। আশা করি অচিরে এ অভিযাত্রার মনোহর কাহিনী শুনতে পাব আপনার নিজের মুখ থেকেই। আপনি উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী হয়েছেন, একটু ভয় পাই আপনাকে সমতলে ডাকতে। কিন্তু আমাদের এখানে এখন শীতকাল, খুব সম্ভব এই সময়টার গরম আপনার সইবে। অশেষ আনন্দ পাব যদি আপনি এসে দিন কয়েক কাটান আমার আশ্রমে। এখানকার আন্তর্জাতিক আবহাওয়া আপনার ভালো লাগবে আর শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কাজ চলছে সেটা আপনার কাছে নিঃসন্দেহেই আকর্ষণীয় হবে বলে আমার ধারণা। বিশ্বাস করুন, আমি জীবনে যা কিছু করেছি তা আপনাকে দেখাতে পারলে সত্যিকার তৃপ্তি পাব।'

অন্তর্মঙ্গোলিয়া থেকে ফেরার পর কুলুতে নিকোলাই রোয়েরিখের দিন বয়ে চলল শ্রমের অভ্যস্ত ছন্দে। বাড়ির সবাই উঠতেন সকাল সকাল, প্রাতরাশের পর চলে যেতেন যে যার কাজের জায়গায়। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কিছুটা বিরতি ছাড়া সবাই খাটতেন সন্ধে অবধি। তারপর আশেপাশে বৈকালী ভ্রমণ, চলতি ঘটনা আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আলোচনা। রুটিন ভঙ্গ হত কেবল অভ্যাগতদের আগমনে। গ্রীষ্মের মাসগুলোয় তেমন আগমন কম হত না, কিন্তু শীতে পথের দুর্গমতার দরুন অতিথির দর্শন মিলত কালে-ভদ্রে।

১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে 'আমার জীবন॥ দিনলিপির পাতা'র জন্য নিকোলাই রোয়েরিখ লেখেন ৭৫০টি স্কেচ। 'আমার জীবন'

নামক লিখনমালার চরিত্র আত্মজীবনীমূলক। শিল্পী সেটা এমনকি কালানুক্রমেই সাজাতে চেয়েছেন, শুরু করেছেন অতি বাল্যকাল থেকে। তাহলেও এই বৃহৎকলেবর সিরিজটার মূল প্রসঙ্গ রয়ে গেছে বিজ্ঞান ও শিল্পের কাজ, নৈতিক ও নান্দনিক লালন, চলতি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে তাঁর ভাবনা।

জীবনের অর্থ অন্বেষণে শিল্পী ডুব দিয়েছেন যুগ যুগের গভীরে, স্থিরদৃষ্টিতে তাঁকে তাকাতে হয়েছে ভবিষ্যতে, মনোনিয়োগ করেছেন প্রকৃতির প্রহেলিকায়, মানুষের সৃষ্টি সম্ভাবনায়।

রোয়েরিখের সাহিত্যকর্মে অনেকটা জুড়ে আছে নৈতিকতা, তার নিয়মানুগতা, শিল্পীর মতে যার সাদৃশ্য থাকা চাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আরো সাধারণ নিয়মের সঙ্গে। তাই নৈতিকতার সমস্যাদিকে রোয়েরিখ ক্রমাগত যুক্ত করতে চেয়েছেন পারিপার্শ্বিক বিশ্বের পরিজ্ঞানের সঙ্গে। তিনি লিখেছেন: 'সততাশ্রয়ী পরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণে কত কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস থেকেই না রেহাই মেলে। সামাজিক সম্পর্কের নতুন নতুন ক্ষেত্র উদ্ঘাটিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে অনুমানের দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক অন্বেষণে।'

রোয়েরিখ মানতেন যে নৈতিকতা ব্যাপারটার সারবস্তু বদলে যায় কালক্রমে। বর্ণমালা থেকে কোনো অচল হয়ে পড়া অক্ষর খারিজ করলে যদি চিৎকার ওঠে, সেটা কোনো ট্রাজেডি নয়। কিন্তু জীবনযাত্রার যে ধারায় অধিকাংশ লোকে বঞ্চিত হয় জ্ঞান, অগ্রণী ধারণা, বৈষয়িক নিশ্চিন্ততা থেকে, সেটা ট্রাজেডির চেয়েও বেশি, সেটা সার্বিক বিপর্যয়ের দ্বারদেশ। এ ধরনের ব্যবস্থার সাফাই গাওয়া, তাকে রক্ষা করাকে রোয়েরিখ অপরাধ বলে গণ্য করতেন, তা পরিবর্তনের জন্য ক্রিয়াকলাপ তাঁর চোখে ছিল কর্তব্য।

রোয়েরিখের কাছে আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবত্তার মাপকাঠি ছিল 'জীবন্ত নৈতিকতা' — সমাজের প্রতি যে মানুষ নিজের পূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন তার দৈনন্দিন আচরণের নৈতিকতাকে রোয়েরিখ এই বলে অভিহিত করেছিলেন। নিজের লেখাগুলোয় তিনি নির্ভয়তা, আস্থা, শুভেচ্ছা, প্রেম, ন্যায়পরতা, অপক্ষপাতিত্ব, দূরদৃষ্টি, কর্মসংকল্প, আশাবাদ, সাধারণ স্বার্থে আত্মত্যাগে সম্মতি প্রভৃতি ইতিবাচক নৈতিক বর্গ এবং স্বার্থপরতা, ভীতি, নিষ্ঠুরতা, সন্দেহপ্রবণতা, নৈরাশ্যবাদ, নিষ্ক্রিয়তা, হৃদয়হীনতা, ভণ্ডামি, দুর্মুখতা, শুভেচ্ছাহীনতার মতো নেতিবাচক বর্গ নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন। রোয়েরিখের মতে এইসব বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে স্থান পেয়ে সমগ্রভাবে আটকে রাখে অথবা সহায়তা করে মানুষের বিবর্তনে।

দৈনন্দিন নৈতিক-লালনিক কাজের দাবি করতেন রোয়েরিখ: 'চেতনার প্রসার ঘটাতে হবে অতি ধৈর্যসহকারে এবং অক্লান্তভাবে। কেবল বেশ একটা ব্যবধানের পরই চোখে পড়ে ভালোর দিকে বিশ্ববীক্ষার পরিবর্তন হল কতটা। চেতনার প্রসার কোনো তড়িঘড়ি অলৌকিক সন্ধানের ব্যাপার নয়, এ হল অন্তরের সমৃদ্ধি আর এই অর্থে গোটা দৈনন্দিনতায় প্রয়োগ করা সম্ভব নতুন প্রসারিত চেতনা।'

প্রতি যুগে নবায়িত মূর্ত-নির্দিষ্ট লক্ষ্যের বাইরে কর্তব্য, মঙ্গল, মর্যাদা, সম্মান, বিবেক, সুখ — এ জিনিসগুলো এমনিতে কোনো সারার্থ ধরে না। সামন্তপ্রভুর কর্তব্য আর ন্যায়পরতা মেলে না স্বাধীন মেহনতীর কর্তব্য আর ন্যায়পরতার সঙ্গে, আত্মতুষ্ট বেনিয়ার মর্যাদার সঙ্গে মেলে না আত্মত্যাগী স্রষ্টার মর্যাদা। 'সাধারণভাবে' লোকহিতৈষণার ডাকে খুব একটা বিশ্বাস ছিল না রোয়েরিখের। আলোকপ্রাপ্ত মানববাদের সঙ্গে

এরূপ আহ্বানের প্রায়ই কোনো মিল থাকে না। মানববাদ মানে 'সাধারণভাবে' শুধু মানুষকে ভালোবাসা নয়, মানুষকে ভালোবাসার জন্য উদ্দেশ্যময় কর্ম।

মানবিক মূল্যবোধের মুখ্য এমনকি নির্ধারক তাৎপর্যে উৎফুল্ল হলেও নিকোলাই রোয়েরিখ বিশ্বের সেই বস্তুময়তা অগ্রাহ্য করেন নি, যাতে প্রকাশ পায় মানবিক আত্মিকতা। সম্পত্তির আসক্তিকে ধিক্কার হেনেও শিল্পী সেইসঙ্গে ধিক্কার দিয়েছেন নিষ্ফল কৃচ্ছ্রসাধনকে। জীবনানন্দের জয়গান করলেও উনি সতর্ক করেছেন গায়ে ফু দিয়ে বেড়ানোর বিরুদ্ধে। নির্ভীকতার প্রশস্তি গাইলেও তিনি অবিমৃষ্যকারিতার প্রশ্রয় দেন নি। কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ততাকে প্রথম স্থান দিলেও কোনো আপ্তবাক্যের অন্ধ ভক্তি তাঁর কাছে ছিল অশ্রদ্ধেয়। মানবিক আচরণের মূল্যায়নে তিনি দুটি নিরিখকে অত্যাবশ্যক গণ্য করতেন — সংকল্পের পূর্ণ চেতনা এবং সাধারণ উপকারিতা: 'প্রতিটি শ্রম হওয়া উচিত যুক্তিসিদ্ধ। পরিষ্কার থাকা চাই তার লক্ষ্য। শ্রমকারীর যদি জানা থাকে যে তার প্রতিটি ক্রিয়া মানবজাতির পক্ষে হিতকর হবে, তাহলে শক্তিও তার অনেক বেড়ে ওঠে, রূপ নেয় একান্ত প্রত্যয়জনক অভিব্যক্তিতে। শ্রম সর্বদাই অপরূপ। যত তা হবে সুচিন্তিত, ততই তার উৎকর্ষও বাড়বে, দেখা দেবে আরো বেশি সামাজিক কল্যাণ... আবার, এবং বারবার বলি, মানুষ যদি না জানে কেন সে দ্রুততম বায়বীয় পোতে পাক খাচ্ছে স্যারা পৃথিবীর ওপর, তাহলে স্বয়ং সূর্য, মহাদেশের সমস্ত সৌন্দর্য তার কাছে হয়ে দাঁড়াবে চুল্লির টিন ঢাকনি।'

জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত সহযোগিতা, যার শুরু যৌথের প্রাথমিক কোষকেন্দ্রে — পরিবারে, এটাকে রোয়েরিখ মনে করতেন এ কালের অনুজ্ঞা: 'পারিবারিক, বান্ধবীয় ও সামাজিক পারস্পরিকতা ছাড়া কোন কথা ওঠে রাষ্ট্রের? সহজীবনের ভিত্তি কাঁপালে অন্য সমস্ত ভিত্তিই ঝাঁকুনি খায়।'

বিশেষ করে শিল্পী যৌথ শ্রমের সমস্যায় মন দিয়েছেন ঘন ঘন, তাই এ দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে কী করা হয়েছে সে বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় আগ্রহের কারণ বোধগম্য। জীবনের নৈতিকতা যুগের পুরোগামী সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, রোয়েরিখের এই দৃঢ় প্রত্যয়ের সাক্ষ্য তাঁর স্কেচ 'বিশ্ব এগিয়ে চলেছে'। এতে তিনি বলেছেন: 'কিছুদিন আগে আমরা জনৈক প্রমুখ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম গণতন্ত্র কী বস্তু। তিনি হেসে উঠে বললেন: 'নির্দিষ্ট সময়টিতে যা সুবিধাজনক'। তার মানে অর্থটা নিরাকার। কিন্তু সামাজিক (বলাই বাহুল্য যে রোয়েরিখ বোঝাতে চাইছেন সমাজতান্ত্রিক — লেখকবৃন্দ) ব্যবস্থাটা সুনির্দিষ্ট ব্যাপার। ইউনিয়ন, সমবায়, এক কথায় রুস্ এখন যা করে উঠতে পেরেছে সবই কথাটার অন্তর্গত। সামাজিক ব্যবস্থার কর্মকর্তারা সর্বাগ্রে সহৃদয়, প্রতিবেদনশীল সাধারণ মঙ্গলের কর্মী। অবিশ্বাস, সন্দেহ, কার্কশ্য, বন্যতার মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা বেড়ে উঠতে পারে না। অকপট পারস্পরিক সাহায্য, মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি সম্ভ্রম, হিতৈষণা হল যৌথ শ্রমের ভিত্তি।'

টাকা, নিকোলাই রোয়েরিখের কথায় যা কিনা 'আধুনিক দুনিয়ার কলঙ্কের রসিদ', তার প্রতিপত্তিতে গড়া সমাজ মৃত্যুদণ্ডিত বলে মনে করতেন তিনি। একবার খননকার্যে অদ্ভুত একটা ছোরার আকারবিশিষ্ট প্রাচীন চীনা মুদ্রা আবিষ্কৃত হলে শিল্পী মন্তব্য করতে ভোলেন নি: 'তা আমাদের অবনতি, নৈরাশ্য, বাজেট ফেল-এর এই কালে মুদ্রা-ছুরির গূঢ়ার্থটা খুব যুৎসই হত... মানবজাতির ঐতিহাস থেকে আমরা পাই কেমন-যেন সতর্কচিহ্নের মতো প্রতীকের

সম্মিলন। ছুরি একটা নিষ্ঠুর বেধক প্রতীক, কিন্তু মুদ্রাচিহ্নটা তার সমস্ত আপেক্ষিকতা নিয়েও স্বর্গীয় হয়ে উঠবে না।'

রোয়েরিখ প্রায়ই বলতেন যে টাকা জমিয়ে রাখার সিন্দুক মানুষের আত্মিক বিবর্তনের সবচেয়ে কুটিল শত্রু। পরগাছাসুলভ জীবনযাত্রার উৎস অর্থলোলুপতার বিপরীতে তিনি খাড়া করতেন নতুন রূপের যৌথ শ্রমের প্রগতিশীল তাৎপর্যকে: 'মুদ্রাপ্রতীকের ভরাডুবির দিনগুলোয়, বিশ্বের সর্বশক্তিমান স্বর্ণদেবের পতনের দিনগুলোয় বিশেষরূপে অভিনন্দিত করা উচিত প্রতিটি সমবায়ী উদ্যোগকে, যা মানুষের শ্রমকে এগিয়ে দিচ্ছে সত্যকার মূল্যবোধ বলে। স্বার্থচিন্তাহীন শ্রমের উৎকর্ষ অবিরাম আত্মোন্নতির মধ্যে এমন বহু আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে যা অচল হয়ে পড়া শর্তাধীন উপায়ের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে।' শিল্পীর এই মতামত সমর্থিত হয় তাঁর স্বদেশে সমাজজীবনের আমূল পরিবর্তনে।

রোয়েরিখের মানববাদ এবং তাঁর শিল্পের নৈতিক ধারা সম্পর্কে অনেক দিন থেকে এমন একটা মত প্রচলিত যেন ওগুলি স্বতোদৃশ্যমান। তাঁর ছবিতে লোকজীবনের দৃশ্য, অতিকথার নায়কদের মূর্ত্যায়ন, সামরিক ও শ্রমীয় শৌর্যের প্রশস্তি, এমনকি নিসর্গচিত্রণ যাই থাক, তাতে নান্দনিক ও নৈতিক ধরনের কী একটা অতিরিক্ত মূল্যায়িত বিভব নিবদ্ধ। সৌন্দর্যের লালনমূলক ভূমিকাকেই তো শিল্পী গণ্য করেছেন মহত্তম মূল্যবোধ বলে: 'বিদ্যালয়ে জীবনের নীতিমালার পাঠক্রম, মননৈপুণ্যের পাঠক্রম প্রবর্তনের কথা আমরা বলি। সৌন্দর্যের সাধারণ পরিজ্ঞান অনুশীলন ছাড়া উক্ত দুই পাঠক্রম অবশ্যই ফের হয়ে দাঁড়াবে নিষ্প্রাণ হরফ। অপরূপে পরিপুষ্ট না হলে নৈতিকতার জীবন্ত বোধ পরিণত হবে মৃত আপ্তবাক্যে।'

শিল্পী বলেছেন: 'সজীব নৈতিকতা সজীব হয় কেবল তার কাছে যার মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকে অপরূপের বাণী।' তাঁর চিত্রকলাতেও অপরূপ কখনো নীরব থাকে নি। রোয়েরিখের ছবি 'বিশ্বদর্শনে' যতই আকীর্ণ হোক, গায়ে পড়া সাহিত্যিকতায় তিনি ছিলেন বিরাগী। তাঁর শিল্পকর্মের আবেগমন্ডনে তাঁর দার্শনিক মর্মার্থ ক্ষুণ্ন হয় না, বরং তার নান্দনিক প্রভাবে দূর হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা।

রোয়েরিখের ছবি নিয়ে চিন্তা ও বিতর্ক করা সম্ভব, সংগ্রহ করা যায় ঐতিহাসিক অতীত বা সুদূর দেশ বিষয়ে সত্য পরিচয়, কিন্তু বিচারের প্রয়োজন ছাড়া এমনিতেই মুগ্ধ হওয়া চলে। জ্ঞান এবং অনুভূতি তাঁর সৃজনে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যে রোয়েরিখ স্বয়ং প্রায়ই এই দুটো অর্থকে প্রকাশ করেছেন এক কথায় — 'অনুভবজ্ঞান'।

আজো পর্যন্ত রোয়েরিখের সৃষ্টির সঠিক গণনা করা যায় নি। শেষের দিকে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি শিল্পী নিজে যে তালিকা করেছেন তাতে আছে দেড় সহস্রাধিক ছবির নাম। তদুপরি এই পর্বের এমন কিছু ছবিও পাওয়া গেছে যা কেন জানি লিপিবদ্ধ করেন নি শিল্পী।

বিদেশস্থ রুশী শিল্পীদের মূল্যায়নে সাধারণত রুশী ও প্রবাসী এই দুই পর্বের তুলনা প্রচলিত। বিভাগের খুবই সার্থক এই নীতি কিন্তু রোয়েরিখের ক্ষেত্রে খাটে না। 'পায়ের তলায় মাটি না পাবার' বোধে পীড়িত হতে হয় নি রোয়েরিখকে।

বিশেষত পশ্চিমে যে বাহ্যিকতা চালু হয়েছিল রোয়েরিখকে তা স্পর্শ করে নি। ১৯৩৯ সালে তিনি লিখেছেন:

'সারিয়ালিজম (অধিবাস্তববাদ) এবং নানাবিধ বহু 'ইজমের'ই কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সময় হলে

যাকে বলা হয় রিয়ালিজম তাতে যে লোকে ফিরেছে তা লক্ষ্য করা সম্ভব। একথাটায় বোঝা হয় বাস্তবের আলেখ্য। এখন রুশী জনগণ যত কিছু 'ইজম' ঝেঁটিয়ে দূর করে রিয়ালিজম নিয়েছে। এ সিদ্ধান্তে ফের জানান দিচ্ছে রুশী টনক। দুর্বোধ্যের কানাগলিতে পথ না হারিয়ে লোকে বাস্তবকে জানতে ও ফোটাতে চাইছে। লোকের প্রাণ ভালোই জানে যে রিয়ালিজম থেকেই সব পথ খোলা। একান্ত বাস্তব সৃজন হতে পারে বর্ণাঢ্যতায় অপরূপ, হতে পারে রূপাবয়বে অমোঘ, মন-কাড়া মর্মবস্তুতে তা ভয় পাবে না।'

রোয়েরিখের দর্শনচিন্তার ব্যাপ্তি পুরোপুরি প্রসারিত হয়েছে তাঁর শিল্পদৃষ্টিতেও। বড়ো বড়ো ভারতীয় সমালোচকেরা এ বিষয়ে একমত যে বিশ্ব শিল্পে রোয়েরিখই প্রথম হিমালয়ের আশ্চর্য রাজ্য সত্যি করেই দেখাতে পেরেছেন, প্রাচ্য জনগণের অন্তর তিনি উন্মোচিত করেছেন তাঁর ছবিতে।

প্রাণের মধ্যে স্বদেশভূমির রূপ এবং তার প্রতি ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ রেখে শিল্পী একই রকম অন্তর্ভেদিতায় রূপায়িত করতে পেরেছেন অন্যান্য দেশের জনগণের হৃদয়ের গভীরতা। বিরল এই গুণটা রোয়েরিখ এতটা আয়ত্ত করেছিলেন যে বিহ্বল বোধ করেছে তাঁর স্বদেশবাসীরা, আর পরদেশীদের কাছে তিনি পেয়েছেন বিদেশাগতের পক্ষে অভাবিত কৃতজ্ঞতা।

বিদেশে রোয়েরিখ যা এঁকেছেন তা লক্ষ্য করলে সন্দেহ থাকে না যে রুশ প্রসঙ্গ তিনি গৌণ স্থানে ঠেলে দেন নি কখনো। তিনি যে রুশ শিল্পের লোক, এটায় তিনি জোর দিয়েছেন বরাবর, রোয়েরিখের 'রুশীয়তার' জন্যই তাঁর বিশ্বখ্যাতি জুটেছিল হিমালয়ের অপূর্ব চিত্রমালার বহু আগেই এবং এ চিত্রমালাতেও বিদেশীদের চোখে তাঁর জাতীয় মর্মার্থ ঝাপসা হয় নি। ১৯৩৮ সালে বার্ণেট-ডি. কনলান লেখেন: 'রোয়েরিখের ওপর রুশ প্রেরণার প্রভাব নিয়ে আমি আলোচনা করলাম কেননা তাঁর কাজের বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক প্রকৃতি নিয়ে কথা বলা হয়েছে খুবই বেশি। অবশ্যই রোয়েরিখ বিশ্বজনীন। কিন্তু তাঁর তুলনা করা যায় এক বিশাল মহীরুহের সঙ্গে যা একটা জায়গায় গভীর শিকড় নামিয়ে সারা বিশ্বের চতুর্দিকে প্রসারিত করে দিয়েছে তার অপরূপ শাখাপ্রশাখা।'

রোয়েরিখ সম্পর্কে প্রখ্যাত স্পেনীয় শিল্পী ইগ্নাসিও সুলোআগার উক্তিও মনোযোগ্য: 'মহান শিল্পী! তাঁর শিল্প এই সাক্ষ্য দেয় যে রাশিয়া থেকে সারা বিশ্বে এসে পড়ছে কী একটা শক্তি — তার পরিমাপ করতে, কথা দিয়ে তার সংজ্ঞা দিতে আমি অপারগ, কিন্তু তা সত্য।'

রোয়েরিখের বিদেশে আঁকা ছবির রুশী বিভাগটা আজো পর্যন্ত যথেষ্ট বিশ্লেষিত হয় নি। বিশের দশকে তিনি এঁকেছেন 'আঙিনা॥ পুরনো নভগোরদ', 'নভগোরদের গির্জা', 'রুশী কুটির', 'ইয়ারিলো'র উপত্যকা', 'সন্ত গ্লেব', 'সন্ত নিকোলাই', 'সাদকোর দরবার', 'পবিত্র কুঞ্জ' প্রভৃতি ছবি এবং শেষত তাঁর নামকরা 'সাঙ্কেতা' চিত্রমালা। তিরিশের দশকে দেখা দেয় 'সিয়েগি॥ পথের গির্জা', 'নভগোরদের মন্দির', 'সিয়েগি'র মন্দির', 'সন্ত সিয়েগি', 'সিয়েগি'র তপোভূমি', 'জ্ভেনিগোরদ', 'বীরকীর্তির মুখে', 'স্ভিয়াতোগোর', 'নাস্তাসিয়া মিকুলিচ্না', রুশ লোককথা অবলম্বনে চিত্রগুচ্ছ। চল্লিশের দশকে আঁকেন, 'আলেক্সান্দর নেভ্স্কি', 'মহাবীরদের জাগরণ', 'ইয়ারোস্লাভ', 'দুঃসাহসী ম্স্তিস্লাভ', 'নভগোরদের সমাধিক্ষেত্র' এবং আরো অনেক ছবি। এর সঙ্গে যোগ করা উচিত মঞ্চের জন্য রোয়েরিখের কাজ। মঞ্চসজ্জার স্কেচ থেকে রোয়েরিখ প্রায়ই ছবি বানিয়েছেন এবং স্বাধীন সৃষ্টিকর্ম হিশেবে

তা ছড়িয়ে পড়েছে মিউজিয়মে মিউজিয়মে।

অঙ্কন শৈলী এবং আভ্যন্তরীণ রণনের দিক থেকে তাঁর বিদেশে আঁকা ছবি ও 'সিন্ধুপারের অতিথি', 'নীপার তীরের স্লাভ', 'কের্জেনেৎসের লড়াই', 'গণকিনী' ইত্যাদির বেশ কিছুটা তফাৎ আছে। সেটা এইজন্য নয় যে রোয়েরিখ সাধারণভাবেই বদলে গিয়েছিলেন, এইজন্যও বটে যে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও তিনি বদলেছেন স্বদেশেরই সঙ্গে সঙ্গে। ভারতে 'নাস্তাসিয়া মিকুলিচ্না' নিয়ে কাজ করবার সময় তিনি 'দিনলিপির পাতা'য় লিখেছেন:

''নাস্তাসিয়া মিকুলিচ্না' — রুশ নারী আন্দোলনের মহনীয় ভবিষ্যৎ মূর্তি — বহুকাল থেকে আমাদের আপন। রুশ জনগণ, ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে নারী আন্দোলন বৈশিষ্ট্যসূচক। এ আন্দোলন বেড়ে উঠেছে মৌলিক ধরনে, তাই হওয়া উচিত। নারীরা তাদের স্বীয় স্থান অধিকার করেছে পরাক্রমে, প্রাচীন গাথায় বেপরোয়া বীরাঙ্গণার মতো। জনগণ নিজেদের সংকল্পে দেখিয়েছে সুস্থ, সফল নির্মাণ।'

মূলত তাঁর শেষ শিল্প পর্বের সমস্ত 'রুশীয়তা'কে বলা যায় জনগণের কীর্তির উদ্দেশে বীরকাব্যমালা, বিজয়মন্ত্র স্তোত্র, স্বদেশের মহান ভবিষ্যতের আবাহন। প্রাগ থেকে ভ. ফ. বুলগাকভ সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছেন জানতে পেরে তিরিশের দশকের শেষে রোয়েরিখ তাঁকে লেখেন: 'বিশ্বাস করি যে আপনাকে আমাকে ফের মিলতে হবে এবং এখনো বড়ো একটা আশা — একসঙ্গে খাটতে হবে। খুব ইচ্ছে করছে অন্তিম বছরগুলো না খুইয়ে ঠিক ওখানেই কাজে লাগাব সমস্ত কর্মোদ্যোগ, ঠিক সেইসব তরুণদের জন্যই যারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির সেবা করছে।'

পশ্চিমী শক্তিদের মিউনিক রফায় খুবই উষ্মা বোধ করেছিলেন রোয়েরিখ। এই ঘটনা নিয়ে ১৯৩৯ সালে লেখা স্কেচটির নামটাই এদিক থেকে বৈশিষ্ট্যসূচক — 'আত্মা বিক্রয়'। শিল্পী তাতে লেখেন:

'বিভিন্ন, মাঝে মাঝে খুব সাড়ম্বর নামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কুকর্ম, মানবজাতির পক্ষে যা কলঙ্কজনক। উদাত্ত ভাষায় বলা হচ্ছে সীমান্তের পরিবর্তন, নানাবিধ সংযুক্তির কথা, কেউ কেউ 'রাজ্যগ্রাস' শব্দটার উচ্চারণ থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারছে না। আর খাসা করে আঁচড়ানো চুলের এইসব সাক্ষাৎকারে কারো স্মরণ করার সাহস হচ্ছে না যে নির্লজ্জের মতো বেচে দেওয়া হচ্ছে মানুষের আত্মা।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম কামান গর্জন শোনা গেল। রোয়েরিখ তাঁর দিনলিপিতে লিখলেন: 'অবশ্যই এ যুদ্ধ এখনই শুরু হল তা নয়। ১৯৩৬ সালেই তা দানা বাঁধতে শুরু করে অশুভ আক্রোশে। অশ্রুতপূর্ব এক বিকট আগ্রাসনে তখনই রক্ত ঝরিয়েছে চীন। তখনই যন্ত্রণার্ত হয়েছে স্পেন, আবিসিনিয়া... জবরদস্তির তালিকা ছিল দীর্ঘ। ছিল সর্বনাশের বিক্ষেপের জন্য স্তম্ভিত করা যুক্তি। প্রধান কামান গর্জন তখন হয় নি যখন জনমত তার প্রত্যাশা করছিল। এটা কি আশা করব যে অতীতের অমানুষিক শিক্ষা অন্তত অংশত বিদ্যমান অবস্থাকে ভালোর দিকে ফেরাবে? অশুভ মতদ্বৈধ তেমন আশায় উৎফুল্ল করে সামান্যই। ১৯১৪ সালের ১ অগস্ট আমরা মিলেছিলাম মন্দিরে, ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর মিললাম হিমালয়ের সামনে। সেটাও মন্দির, এটাও মন্দির। সেখানে বিশ্বাস হয় নি মানবিক উন্মত্ততায়, এখানেও মন মানতে চায় না যে আরো একটা পার্থিব বীভৎসতা শুরু হল...'

ছিন্ন হয়ে গেল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ। নীরব হয়ে গেল প্রচুর পত্রালাপ। বিভিন্ন দেশের

বিজ্ঞানীদের সহযোগে চলার ভরসায় গড়া 'উরস্বতী' ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম হয়ে উঠল অচল। ১৯৪০ সালের জুলাইয়ে রোয়েরিখ এই বর্ণনা দিয়েছেন:

'প্রথমে আমরা ছিন্ন হয়ে গেলাম ভিয়েনা, পরে প্রাগ থেকে। কাটা পড়ল ওয়ারশ... ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠল বলটিক অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ। সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে অদৃশ্য হল পত্রালাপ থেকে। চুপ করে গেল ব্রিউগে। নীরব হয়ে গেল বেল্গ্রেড, জাগ্রেব, ইতালি। শেষ হয়ে গেল প্যারিস। আমেরিকা রইল তিন নয়ের রাজ্য পেরিয়ে, চিঠি সেখানে আদৌ পেঁাছলে যেত চারদিকের সমুদ্র পেরিয়ে এবং দীর্ঘকাল আতিথ্য নিতে হত সেন্সর বিভাগে... দূর প্রাচ্য স্তব্ধ। সুইজারল্যান্ড থেকে শাউব-কথ বিশ্বে মে-তেও তাঁর বইয়ের জন্য মালমশলা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সুইজারল্যান্ডও হয়ে দাঁড়াল যাদু করা দেশ। কিছুই চলবে না। স্বদেশেও চিঠি লেখা অসম্ভব অথচ ওখান থেকে গাছগাছড়ার কথা জানতে চাইছে। কে জানে কী চিঠি গেছে... শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেল যে খাস ভারতেই সেন্সর শুরু হয়েছে। দেখা গেল যে কুলুর সেন্সর-কর্তা আর কেউ নয়, স্থানীয় পুলিসই। পুরো শিক্ষিত কি? নিজের পরীক্ষক বৃত্তি সে জাহির করেছে আমার কাছে আসা চিঠির ভেতর অবহেলাবশত নিজের নোটটিও গুঁজে দিয়ে... কাজের সমস্ত ডালপালা কাটা পড়ছে দেখে কষ্ট হয়। নতুন শাখাও গজাবে না। নতুন কিছু হবে কি, কিন্তু কবে?'

বৈজ্ঞানিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে রোয়েরিখের নামের সঙ্গে জড়িত সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী সংগঠনগুলির অধিকাংশও বিকল হয়ে পড়ল। তাঁর পক্ষে এসব আরো বেশি পীড়াদায়ক হয়েছিল এই কারণে যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পেছিয়ে গেল তাঁর স্বদেশে ফেরা।

সংঘর্ষে ভারত সরাসরি বিপন্ন হয় নি। চলতি শিল্প প্রদর্শনীগুলি পর্যন্ত বন্ধ হয় নি এখানে। রোয়েরিখের ষাটটির বেশি ছবি তখনো বাইরে ঘুরছে। গেছে তা ত্রিবান্দ্রম, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, বারাণসী, এলাহাবাদ, এখন রওনা দিয়েছে লাহোরে। আমন্ত্রণ এসেছে কলকাতা আর কলম্বোতে প্রদর্শনী করার জন্য। কিন্তু রোয়েরিখের মন অন্য দিকে। ১৯৪০ সালের জুনে তিনি লেখেন:

'রুশ ইতিবৃত্তাদি অধ্যয়ন করে এবং প্রাচীন সাহিত্য যা মোটেই তেমন কম নয় যতটা মাঝে মাঝে দুরভিসন্ধিবশত দেখাবার চেষ্টা হয় তার পরিচয় নেবার পর কেবল আরো সচেতনভাবে এই হুংকারের পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে 'খবরদার!' একেবারে ইদানীংকার কাল পর্যন্ত রুশ ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে গেলে কেবল এই রুদ্র হুঁশিয়ারিতেই আরো বেশি নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব। বিশেষ করে তা ধ্বনিত হয়েছে আত্মত্যাগ করে বহু দেশকে সাহায্য করার মর্মস্পর্শী রুশী আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। এখন সেই সাবেকী দৃঢ়োক্তিটাই হয়ে উঠছে প্রোজ্জ্বল... রুশ জনগণের জন্য যারা অস্ত্রধারণ করে তারা সবাই এটা অনুভব করে নিজেদের মেরুদণ্ডে। কোনো অনিষ্টাশংকা নয়, একথা বলেছে জনগণের হাজার বছরের ইতিহাস। ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে গেছে দুর্বৃত্ত ও জয়লোভীরা, আর রুশী জনগণ তাদের সীমাহীন অহল্যা ভূমিতে খুঁড়ে তুলেছে নতুন ধনভাণ্ডার। তাই হওয়ার কথা। ইতিহাসে রক্ষিত আছে একটা উচ্চতম ন্যায়পরতার সাক্ষ্য যা বহুবার রুদ্র হুঙ্কার দিয়েছে 'খবরদার!''

প্রতিদিন রেডিও খুলে শিল্পী প্রতীক্ষা করতেন করাল সংবাদের... অচিরেই তা এল, দুঃসহ পঙক্তিতে তা স্থান পেল দিনলিপিতে: 'জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ। স্বদেশের প্রতিরক্ষা — সেইটে যার

কথা লেখা হয়েছিল পাঁচ বছর আগে... ওদের সঙ্গে থাকতে পারলে হত!'

অগ্নিপরীক্ষার দিনে 'আমি দেশের সঙ্গে আছি' শুধু এমন একটা ঘোষণার চাইতে অপরিমেয় বেশি কিছু নিহিত আছে এই 'ওদের সঙ্গে থাকতে পারলে হত' কথাটায়। পুরনো আর নতুন — এই দুই শিবিরে বিশ্বকে ভাগ করতে অভ্যস্ত শিল্পীর কাছে যুদ্ধে রাশিয়ার জড়িয়ে পড়ার অর্থ ছিল জ্যোতি আর তিমিরের মধ্যে নির্ণায়ক সংঘাত। এখানে সন্দেহ ছিল না কোন পক্ষ জিতবে। মুহূর্তের জন্যও সন্দিহান হওয়ার মানে অতিবাহিত জীবনের সমস্ত সত্য নাকচ করে দেওয়া। আর বোঝাই যায় যে ভবিষ্যৎ বিজয় সম্পর্কে আস্থাবাণী শোনাতে ব্যগ্র হবেন রোয়েরিখ।

১৯৪০ সালেই স্বদেশের রণগরিমার প্রাক্‌চেতনায় তিনি এঁকেছিলেন 'মহাবীরদের জাগরণ' আর 'আলেক্‌সান্দর নেভ্‌স্কি'। যুদ্ধের বজ্রধ্বনি হতেই দেখা দিল 'ইগরের অভিযান'। এটা স্মরণীয় প্রাচীন রুশ সাহিত্য অবলম্বনে কোনো অনুচিত্রণ নয়। নায়কদের কোনো বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেন নি রোয়েরিখ, ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি আঁকতে যান নি। তাঁর শুধু একটি লক্ষ্য — রুশ জনগণের সামরিক শৌর্যের মহিমা আর তাদের অনিবার্য দুঃখভোগের জন্য শোক প্রকাশ। সোনালী-হলুদ আকাশের পটে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ইগরের যোদ্ধৃদলের কালচে সিলুয়েট। আগুনের মতো জ্বলছে তাদের গাত্রাবরণ আর ঢাল। ক্যানভাসের নিচের দিকে সবখানি জুড়ে পদাতিক আর অশ্বারোহীর ঘন সারি। দুর্গের তোরণ থেকে বেরিয়ে তারা মিলিয়ে গেছে দিগন্তে। যোদ্ধৃদলের ওপর পতপত করছে নানান ধ্বজা, দুলছে লম্বা লম্বা বল্লম। হলুদ আকাশ যা সূর্যগ্রহণ ফোটাবার জন্য অমন অপ্রত্যাশিত সাহসে শিল্পী নির্বাচন করেছিলেন তা ওপরে পরিণত হয়েছে গাঢ় নীলে, সেখানে জ্বলছে রাহুগ্রস্ত সূর্যের স্বর্ণ বলয়। হলুদ, কালচে নীল আর লাল রঙের অসাধারণ আবেগান্বিত বর্ণসমন্বয় জয়জয়ন্তীতে নিনাদিত। তাতে আছে যেমন অবধারিত ক্ষতির বেদনা তেমনি অন্তিম বিজয়ের ঘোষণা।

যুদ্ধের সময় রোয়েরিখ বার বার জাতীয় বীর্যের প্রসঙ্গ ও প্রতিমা অবলম্বন করেছেন। তিনি আঁকেন 'রুদ্র', 'গরিনিচ', 'মিকুলা', 'মহাবীর', 'দুঃসাহসী মস্তিস্লাভ', 'রেদেদিয়া'র সঙ্গে মস্তিস্লাভের দ্বন্দ্বযুদ্ধ', 'বিজয়ী', 'পার্টিজান', নতুন করে আঁকেন 'নাস্তাসিয়া মিকুলিচ্‌না', 'স্‌ভিয়াতোগোর', 'বরিস আর গ্লেব' প্রভৃতি ছবি।

আগেকার আঁকা প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি রোয়েরিখের শেষ জীবনের সৃজনে যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে, সেটা অকারণে নয়। ইউরোপ ও আমেরিকার মিউজিয়মে রেখে আসা তাঁর অনেক ছবির মালিক তিনি নিজে। হর্শ নিউ-ইয়র্কের মিউজিয়ম বেদখল করায় এবং ইউরোপের নগরে নগরে যুদ্ধের সংহার লহরী বয়ে যাওয়ায় যেসব ছবি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যেতে পারতেন তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল অনেক। অথচ নিজ জনগণকে শিল্পী উপহার দিতে চাইছিলেন তাঁর মনন আর বহু বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস। তাই তাঁর প্রিয় বিষয়গুলি ফের আঁকতে শুরু করেন তিনি। এইভাবে পূর্বোক্ত ছবিগুলি ছাড়াও দেখা দেয় 'মধ্যনিশা', 'আর্মাগেড্ডন' (১৯৪০), 'ব্রহ্মপুত্র', 'প্রতীক্ষমাণা' (১৯৪১), 'নির্মাতা সিয়েগি' (১৯৪৩), 'পয়গম্বর', 'সান্ত্বনা' (১৯৪৪), 'মনে রেখো!' (১৯৪৫) প্রভৃতি চিত্র, ফের আঁকতে থাকেন হিমালয় ও মধ্য এশিয়ার বহু নিসর্গদৃশ্য।

হিটলারী জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, রোয়েরিখ তার আগেই ষাট পেরিয়েছেন। অটুট স্বাস্থ্য তাঁর কখনোই ছিল না, ১৯৩৯ সাল থেকে তা বেশ ভেঙে পড়তে থাকে। পুরনো ব্যাধির সঙ্গে জুটল হৃৎপিণ্ডের তীব্র দৌর্বল্য। কিন্তু রোয়েরিখের কর্মোদ্যোগ কিছুতেই ক্ষান্ত হবার নয়। দিনলিপিতে তিনি লিখলেন: 'আদেশ এসেছে, আর ইচ্ছা ক্ষীণ হয় নি।'

জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের আগে পর্যন্ত তাঁর নামের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানাদি বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে সতর্কতার দরকার ছিল, কিন্তু এখন তিনি নিজেকে খোলাখুলি ঘোষণা করলেন রাশিয়ায় নব ব্যবস্থার পক্ষপাতী বলে, প্রকাশ করলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পলিসি সমর্থন করে প্রবন্ধাদি, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব নিয়ে লিখলেন অনেক।

ভারতে নিকোলাই ও স্ভিয়াতোস্লাভ রোয়েরিখের কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনী হয়। ছবি বিক্রিরও ব্যবস্থা ছিল তাতে। প্রাপ্ত টাকার বেশির ভাগটাই পাঠানো হয় সোভিয়েত রেড ক্রস এবং লাল ফৌজের জন্য। রুশ ফ্রন্টে যুদ্ধ বাধার শুরুতেই রোয়েরিখের দুই পুত্রই লাল ফৌজের কাতারে স্বেচ্ছাসৈনিক হিশেবে যোগ দেবার আনুষ্ঠানিক আবেদন পাঠালেন। স্ভিয়াতোস্লাভ রোয়েরিখ প্রদর্শনীর আয়োজন এবং লাল ফৌজের জন্য টাকা তোলার ব্যবস্থা ছাড়াও বক্তৃতা এবং রেডিওতে ভাষণ দিতেন, তুলে ধরতেন ফ্যাসিস্ট জার্মানির ধ্বংসে সোভিয়েত দেশের নির্ণায়ক ভূমিকা।

নিকোলাই রোয়েরিখের ৭০ বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে 'কিতাবিস্তান' প্রকাশভবন তৈরি করে তাঁর প্রবন্ধসংকলন 'হিমবাত', এর দাক্ষিণা যায় সোভিয়েত রেড ক্রসে। বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত এই চতুর্দশ পুস্তকে 'রুশাখ্যায়িকা' নামে এক বিশেষ বিভাগে নিবদ্ধ হয় তাঁর যুদ্ধকালীন দেশাত্মবোধক রচনাগুলি। 'ভোক্স' (সারা ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংস্থা) মারফত তা পৌঁছয় মস্কোয়। যুদ্ধ সমাপ্তির এক বছর আগে রোয়েরিখ তাঁর 'রুশী যুগ' প্রবন্ধে লিখেছেন:

'মানুষের ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব এক ঘটনা ঘটেছে। সারা বিশ্বে বেড়ে উঠেছে বন্ধুরা। শত্রুরা হায়-হায় করে বিদায় নিয়েছে। বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচকেরা কামড়েছে তাদের বিষাক্ত জিব। 'রুস' শুধু রণক্ষেত্রে যশোলাভ করেছে তাই নয়, মেহনতে এবং সামরিক চাপের মধ্যেও এখন অপরূপ এক ভবিষ্যৎকে গড়ে পিটে তোলার কাজও শুরু করতে পেরেছে।'

লাল ফৌজের প্রতিটি জয়যাত্রার খবরে উল্লসিত হতেন রোয়েরিখ। সোভিয়েত জনগণের সামরিক ও শ্রমভিত্তিক কীর্তি নিয়ে তাঁর 'দিনলিপির' অনেক পাতাই লেখা।

১৯৪২ সালে ঘোরতর যুদ্ধের কালে নিকোলাই রোয়েরিখ কুলুতে স্বাগত করেন জওহরলাল নেহরুকে। দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন: 'ভারত-রুশ সংস্কৃতি সমিতি নিয়ে কথা হল, এখন হিতকর, গঠনমূলক সহযোগিতার কথা ভাবার সময় এসেছে। তিন সপ্তাহ বাদে ইন্দোরের মহারাজা আমাদের কাছে আসবেন। অনুরোধ করবেন যেন পণ্ডিতজী আমেরিকায় যান। ওখানে যেতে সাড়ে চার দিন, ফিরতেও তাই। সেখানে আলাপের জন্য একটা দিন। অবশ্যই পণ্ডিতজী যাবেন না। আন্দোলনের নেতা দশ দিন অনুপস্থিত থাকবেন, এখন কি সেই সময়? তাছাড়া কীই-বা হবে এমন সফরে?'

তখনো স্তালিনগ্রাদের লড়াই হয় নি, হিটলারী

দ্বুষ্প্রয়াসের ওপর তখনো ভরসা করে আছে অনেক রাজনীতিবাজ আর হিমালয়ের নির্জনে রুশ শিল্পী নিজের মতো করে দেখছেন নতুন দুনিয়ার ভাগ্য, যেখানে জয়লাভ করবে বশীভূত জাতির বহুপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতা, ভারতের মুক্তি যোদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করছেন তাই নিয়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল, রোয়েরিখ তখন দুই পরাক্রান্ত শক্তি — রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতায় সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানান তাঁর পুরনো সহযোগীদের কাছে। ১৯৪২ সালে রোয়েরিখ মিউজিয়মের পরিচালকদের উদ্যোগে নিউ-ইয়র্কে গঠিত হয় আমেরিকা-রুশ সাংস্কৃতিক সমিতি (আরুসাস)।

এ সমিতির ক্রিয়াকলাপের পেছনে বেশ টের পাওয়া যেত রোয়েরিখের অভিজ্ঞ হাত। জনগণের নৈকট্য বিধানে এটা ছিল শিল্পীর যথাসাধ্য অবদান আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অকৃত্রিম মিত্রদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া ভার রোয়েরিখের নাম যার কাছে অজানা।

যুদ্ধের সুকঠিন কালে স্বদেশের কোনো একটা উপকারে লাগার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে কর্তব্য পালন করলেন বলে রোয়েরিখ অনুভব করতে পারতেন, কিন্তু প্রাণের মধ্যে তাঁর ছিল ব্যথা আর কাতরতা যা প্রকাশ পেয়েছে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যে: 'ওদের সঙ্গে থাকতে পারলে হত।'

যুদ্ধের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে, তা থেকে দেখা দেয় একটা বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের বোধ। এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সাহিত্যিক রচনায়। এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর স্কেচ 'টাওয়ারে' (১৯৪৪)। তাতে পর্যবেক্ষণ ঘাঁটির প্রহরীর কাহিনী শুনিয়েছেন তিনি: 'টাওয়ারটা ঠান্ডা। ঠিক যেন বিস্মৃত, পরিত্যক্ত, নিষ্প্রয়োজন। পাগলাটে গোলা হয়ত ভূতলশায়ী করবে গোটা পাইন গাছ আর তার রক্ষণী ঝালরকে। তখন সম্পূর্ণ হবে ব্যাপারটা, বোধ হয় সম্পূর্ণ হবে আরো ভালো করে আর টাওয়ারটা হয়ে দাঁড়াবে একেবারেই অনাবশ্যক। অনাবশ্যকতার অনুভূতি কষ্টকর। কে জানে, একেবারেই সবাই চলে গেল নাকি? বদলে নিল না তো নির্মিতটা? নিঃসঙ্গ টাওয়ারের কথা ভুলে গেল না তো? এবং জানি যে ভুলবে না, জানি যে টাওয়ারের খুবই দরকার আছে। কিন্তু টাওয়ারের ওপরে বড়ো ঠান্ডা। বাতাস হাড়-কাঁপানো... হুল্লোড়েরা চ্যাঁচাচ্ছে: 'এই, ওহে চালের ওপরকার বক, আমরা এখানে বোমা মারছি আর আপনি পাইন গাছের মোচা ছুড়ে ছুড়ে ফেলছেন।' হাসছে, বোঝে না টাওয়ারের গুরুত্ব। জানে না কী একলা লাগে টাওয়ারের ওপরে। বিস্মৃত! অথচ জানা আছে যে দরকার, তাহলেও থেকে থেকে মাথা চাড়া দেয় অনাবশ্যকতার বোধ। চেষ্টা করো নিজেকে বোঝাতে যে নির্জনতার মধ্যেও তুমি আছ প্রয়োজনীয় প্রহরায়...' 'জীবনে টাওয়ার অনেক' — এবার নিজেই উত্তম পুরুষে বলছেন — 'অতি প্রয়োজনীয় প্রহরা অনেক। জরুরী কাজ করছে তারা। তাহলেও টাওয়ারের ওপরে একলা লাগে। শুনছ কি তোমরা? সাড়া দিচ্ছ কি?'

যুদ্ধের শেষের দিকে রোয়েরিখ ফের মঞ্চসজ্জায় আত্মনিয়োগ করেন। লাল ফৌজের অসামান্য বিজয়ে রুশী সবকিছুর প্রতি বিপুল আগ্রহ দেখা দেয় বিদেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসী ব্যালেমাস্টার ল. মিয়াসিনের খেয়াল হল কয়েকটা রুশী ব্যালে নতুন করে মঞ্চস্থ করবেন। তার সজ্জায় অংশ নিতে তিনি অনুরোধ করলেন রোয়েরিখকে। শিল্পীর কাছ থেকে স্কেচ পেয়ে ১৯৪৪ সালে মিয়াসিন তাঁকে লিখে পাঠান:

'প্রিয়বর, নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ, 'রাজা ইগরের' জন্য যে স্কেচগুলি পাঠিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ওগুলো পাওয়া আমার কাছে এক মহোৎসব। আকাশের সোনালী গমক অপূর্ব। জ্বলছে তা রাশিয়ার বিজয়গরিমায়, গভীর রঙে প্রতিবিম্বিত করছে অবাধ্য পলোভেৎসদের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এরকম অপরূপ ভাষ্যে ব্যালেটির নবায়ন একটা অনাবিল আনন্দের উপলক্ষ হবে তেমন সকলের কাছেই যারা রুশ ব্যালে জানে ও তার কদর করতে পারে। এখন 'পবিত্র বসন্ত'কেও নবায়িত করার ইচ্ছে হচ্ছে আমার। প্রথমে ভেবেছিলাম ১৯২৯ সালে সুরকার সঙ্ঘ কৃত উপাদানগুলি ব্যবহার করব, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা আর টিকে নেই। নতুন স্কেচ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে পারি কি?'

'পবিত্র বসন্তের' জন্য পাঁচটি এবং 'রাজা ইগরের' জন্য ছয়টি স্কেচ করেছিলেন রোয়েরিখ। সেগুলি কাজে লাগে কেবল শিল্পীর মৃত্যুর পর পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি স্টকহোল্মের 'রাজকীয় অপেরা', প্যারিসের 'গ্রান্দ অপেরা' থিয়েটার এবং মিলানের 'লা স্কালা'-তে।

১৯৪৫ সালে রোয়েরিখের 'পবিত্র বসন্ত' ক্যানভাসটি কেন দেখা দিল তার কারণ বোঝা যায় মিয়াসিনের চিঠি থেকে। বিন্যাসের দিক দিয়ে ছবিটি 'তুষারিকার' জন্য আগে আঁকা স্কেচের কাছাকাছি: মেয়েরা দল বেঁধে গাইছে, নাচছে। লাল নক্সা তোলা তাদের শাদা পোশাক বৈপরীত্যে ফুটে উঠেছে গাঢ় পান্না রঙের পটে। তাদের মাথায় মেঠো ফুলের মুকুট। যে টিলায় নৈবেদ্য দানের পাথর আছে তাতে সোনালী রঙের ছিটে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে 'নির্বাচিতা', হাতে ফুলের মালা। পাহাড়তলিতে আর গাছেদের চুড়োয় রোদের উজ্জ্বল ঝলক। নিচের দিকে ডান কোণে লাল-শাদা সাজ করা একদল বাদক আর চাষী। কুমারী মূর্তিগুলির সুডৌল রেখা, টিলা, গাছ, পাথরের সিল্যুয়েট সেই সঙ্গে সবুজ সোনালী লাল আর চোখ ধাঁধানো শাদার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মানুষ ও প্রকৃতির উল্লাসের এক অপরূপ ছবি। পবিত্র বসন্ত, তামস শক্তির ওপর বিজয়ের বসন্ত, আশার বসন্ত, মানবিক আনন্দের পুনরুজ্জীবনের বসন্ত। এই ছবিটি দিয়ে রোয়েরিখ উদ্‌যাপন করেন পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের অবসান, নিজ জনগণের প্রোজ্জ্বল উৎসব।

যুদ্ধের বছরগুলোর চাপে ঘন ঘনই স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছিল রোয়েরিখের। দিনলিপিতে তিনি নিজেকে বুঝিয়েছেন: 'অসুখ বাধিও না... আধ শতকে অসুখ কম হয় নি। আর বিপদ পেরিয়ে এসেছি কত। জলে তলিয়েছি, শীতে জমেছি -- কী যে না ঘটেছে বলা কঠিন। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয় নি। গেছি দুর্গম গিরিসঙ্কট দিয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আর ওপরে ওঠা যাবে না কিন্তু উচ্চতাও জয় করা গেল। মাঝে মাঝে অতল গহ্বরের ওপর সঙ্কীর্ণ কার্নিস দিয়ে যাবার সময় পাহাড় যেন ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছে, তাহলেও এগিয়েছি আমরা, কার্নিস পড়ে থেকেছে পেছনে। বরফের ছুটন্ত চাঙড় ভরা নদীতে মাথা ঘুরে উঠেছে কিন্তু ওপর দিকে চেয়ে থেকেছি পরিত্রাতা দূরেছে... অসুখ বাধিও না, দেখতে হবে মহান দিনগুলোকে। তা হবেই হবে!'

স্বদেশের বিজয়ের মহান দিনগুলো দেখলেন নিকোলাই রোয়েরিখ, লিখলেন: '...নতুন হয়ে উঠেছে রুস। সার্বজনীন জোয়ারে হয়ে দাঁড়িয়েছে মহাশক্তি। পরাক্রান্ত প্রবাহে জাতিগুলির সার্থক মিলমিশ ইউনিয়ন ঘটিয়েছে অশ্রুতপূর্ব এক বিজয়... আর মনে পড়ল বহুদিন বিগত স্কুলের বছরগুলোর কথা যখন রুসের সেবা করার আকুলতায় বুক ফেটে যেত... ভোলা

চলবে না আমার 'বার্তাবহ' ছবি প্রসঙ্গে তলস্তোয়ের অনুজ্ঞা: 'হাল ধরে রাখতে হবে উজানের দিকে, তাহলে নদী পেরুনো যাবে।' স্বদেশের গরিমায় যেমন পেরেছে দাঁড় ধরেছে লোকে।'

...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কামান গর্জাতেই রোয়েরিখ নতুন করে চুক্তিটা এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ শুরু করেন।

১৯৪৫ সালের ৬ ডিসেম্বর নিউ-ইয়র্কস্থ চুক্তি ও 'শান্তির নিশান' কমিটি থেকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে কাজ শুরু হয় নতুন করে। গোটা ১৯৪৬ সাল যাবৎ কমিটি পুরনো যোগসূত্রগুলো ঠিকঠাক করে নেয়, নতুন শক্তিকেও টানে চুক্তির ব্যাপারে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে নিউ-ইয়র্ক থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে কমিটির ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দেওয়া হয়। এই বছরেই সাংস্কৃতিক ঐক্যের সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় চুক্তিকে।

যুদ্ধ শেষ হতেই শিল্পী সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে যাবার তোড়জোড় শুরু করেন। প্রথমে ব্যাপারটা চলছিল ঢিমে তালে। পত্র-বিনিময় হত আমেরিকা মারফত, মাঝে মাঝে চিঠি যেতেই লেগে যেত তিন মাস। কিন্তু বিমান যোগে পত্র-প্রেরণের ব্যবস্থাটা নতুন করে শুরু হওয়ায় স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে ওঠে নিবিড়। স্‌ভিয়াতোস্লাভ ও ইউরি রোয়েরিখ প্রায়ই দেখা করতেন দিল্লিতে আগত সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে। নিকোলাই রোয়েরিখের অতীব আনন্দের কারণ ঘটিয়ে তাঁদের কয়েকজন কুলুতেও দর্শন দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গে সাংবাদিক ও. অরেস্তভ স্মরণ করেছেন:

'সুদূর ভারতের কোথায় চিরন্তন তুষারের সীমান্তে সমস্ত রুশী রেওয়াজ ও অভ্যাস অক্ষুণ্ণ রেখেছে এমন এক রুশী পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিচিত্র বৈকি... পলিতকেশ, শ্মশ্রুল, প্রশান্ত, চিন্তামগ্ন ন. ক. রোয়েরিখ বসে ছিলেন তাঁর স্টুডিওতে, আমাকে জানালেন তাঁর অন্তরের গহন বাসনা — স্বদেশে, রাশিয়ায় ফেরার কথা।'

ই. এ. গ্রাবার, ভ. ফ. বুলগাকভ প্রভৃতির নিকট পত্র থেকে দেখা যায় দেশে ফেরার জন্য রোয়েরিখ কী প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। সেখানেও তাঁর অপেক্ষায় ছিল লোকে। শিল্পী ই. এ. গ্রাবার তাঁকে লেখেন: 'তোমার রুশী হৃদয়ের কাছে রুস ছিল সর্বদাই আপন। তোমার অপূর্ব শিল্পকর্মের প্রত্যেকেই তোমার বিপুল সৃজনশক্তি নিবেদন করেছ তাকে। রুশী শিল্পীরা তাই কখনোই তোমাকে আপন না ভেবে পারে নি, আমাদের মিউজিয়মগুলির সেরা সেরা দেয়ালে সর্বদাই টাঙানো থাকে তোমার সৃজন। বিদেশে তোমার সাফল্য আমরা উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করি এবং বিশ্বাস রাখি যে তুমি একসময় ফিরবে আমাদের মধ্যে।'

ভারতের এক ঐতিহাসিক ঘটনার দিনে রোয়েরিখ ছিলেন সেখানে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন ভারতকে ডোমিনিয়ন অধিকার দিতে বাধ্য হয়, স্বাধীন বিকাশের পথ নেয় ভারতবর্ষ। পূর্ণ হল শিল্পীর আরো একটা গহন স্বপ্ন — 'কুহেলী ঢাকা আলবিঅন'* রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে যে নিশ্ছিদ্র যবনিকা টাঙিয়েছিল তা মিলিয়ে গেল। কিন্তু এসবের আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান — দুই রাষ্ট্রে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার ব্রিটিশ কুচক্রের সঙ্গে যে সাম্প্রদায়িক রক্তস্নান শুরু হয়েছিল, তাতে।

দাঙ্গায় দেশের স্বাভাবিক জীবনধারা বানচাল হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে গেল ডাক আর টেলিগ্রাফের

* ব্রিটেনের প্রাচীন কেলটিক নাম। — অনু:

কাজ। নিখোঁজ হল বহু জরুরী চিঠি, তার-যোগে রোয়েরিখের অনেক জিজ্ঞাসার কোনো জবাব এল না। শিল্পীর আত্মীয়রা তাঁর টলায়মান স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত আর একেবারে নিরপরাধদের গণহত্যার খবর চেপে যেতেন তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু সেটা বিশেষ সফল হয় নি। নিচে গোলাগুলির আওয়াজ এসে পেঁছত রোয়েরিখের বাড়ি পর্যন্ত, আশেপাশের পড়শীরা বিপদ এড়াবার জন্য আশ্রয় নিত তাঁর গৃহতলে।

এলাকার সবাই ছিল শিল্পী পরিবারের প্রতি সশ্রদ্ধ। হামলার কোনো চেষ্টাই হয় নি। তাহলেও রাতে বসাতে হয়েছে সশস্ত্র পাহারা। নিজের অপার বিশ্বপ্রেম সত্ত্বেও রোয়েরিখ কখনো জঙ্গী অজ্ঞতার করুণায় ভরসা করেন নি, ক্ষিপ্ত বাঘের বিরুদ্ধে তুলসী পাতা হাতে যাবার উপদেশ দেন নি কাউকে। বহুদিন থেকেই রোয়েরিখ জানতেন যে ন্যায়কর্মে উদ্যত তরবারির প্রশস্তি বর্জন করে মানবতার প্রচার আর মৃতের জন্য স্বস্তিবচনের মধ্যে তফাত নেই বিশেষ।

১৯৪৭ সালের জুলাইয়ে কিছু পুরনো রোগের প্রকোপ বাড়ায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, শয্যা গ্রহণ করতে হয় রোয়েরিখকে। অক্টোবরে ফের তিনি কর্মঠ। অসুখের সময় জরুরী কাজ জমেছিল অনেক। পুরোদমে চলছিল স্বদেশে ফেরার জন্য গোছগাছ। শিল্পীর নিজে বাছাই করা চার শতাধিক ছবি তাঁর তত্ত্বাবধানে প্যাক করা হচ্ছিল বোম্বাই এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠাবার জন্য।

এইসব ঝামেলায় মনে রইল না ডাক্তারের হুঁশিয়ারি যে সবরকমের অতিক্রান্তি এড়ানো দরকার। শয্যাত্যাগ করেই যেতেন ইজেলের দৈনন্দিন কাজে, চোখ ধাঁধানো পার্বত্য তুষারে ঝলকিয়ে উঠত ক্যানভাস। তার পটে রোয়েরিখ আঁকছিলেন উড়ন্ত ঈগল। এটা 'গুরুর আদেশ' নামে বিখ্যাত ছবিটার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু ছবি শেষ হতে পারে নি... ১৯৪৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রোয়েরিখ।

দুই দিন পরে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়েরিখের চিতা জ্বলল তাঁর বাড়ির কাছে। পরে সে জায়গায় মহত্তোমহীয়ান হিমালয়ের সামনে স্থাপিত হয় তুষারাবৃত শিলা থেকে স্খলিত একটা বড়ো পাথর। তার সামনের দিকে খোদাই করা আছে:

'ভারতের মহান মিত্র মহাঋষি নিকোলাই রোয়েরিখের দেহ এখানে দাহ করা হয় ৩০ মঘর, ২০০৪ বিক্রমাব্দে, যা ১৯৪৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সমার্থক। ওঁ রাম।'

শিল্পীর জীবনকথা ভেবে পাথর-মিস্ত্রি নিজে থেকে স্মৃতিস্তম্ভের উল্টোপিঠে দেগে দিয়েছে:

'পাহাড়ী শিলার এই খণ্ডটা এখানে আনা হয়েছে বহু দূর থেকে।'

আর কৃতজ্ঞ মানবজাতির স্মৃতিতে চিরকাল ধ্বনিত হবে নিকোলাই রোয়েরিখের এই কথা:

'যা ছিল, ছিল, ভবিষ্যৎকে তা যেন আচ্ছন্ন না করে। নৈরাশ্যবাদী হওয়া কলঙ্কের কথা। পরিপূর্ণ আস্থায় তাকাব ভবিষ্যতের দিকে। উত্তম ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখেছি বৃথা নয়। প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা তাকে আহ্বান করি। অনুভব করি যে এই অপরূপ ভবিষ্যৎটা সম্ভবপর। সম্ভবপর তা বাস্তবতার অমোঘতায়, দৈনন্দিন শ্রমের উৎকর্ষ, আনন্দিত সৃজন ও লোকহিতের প্রয়াসে। আর সাধারণের কল্যাণ, সাধারণের অরুণোদয়ের জন্য মানবিক প্রয়াস রয়েছে কম নয়। প্রতিটি উদয়ই ডাক দিচ্ছে চলো আগে, আগে, আগে!'

ন. ক. রোয়েরিখের জীবন ও ক্রিয়াকলাপের প্রধান ঘটনাবলি

১৮৭৪ — পিটার্সবুর্গে ২৭ সেপ্টেম্বর (৯ অক্টোবর) জন্ম।

১৮৮৩ — পিটার্সবুর্গে ক. মাই জিমনাসিয়মে যোগদান।

১৮৯৩ — শিল্প অকাদেমি এবং পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে যোগদান।

১৮৯৭ — 'বার্তাবহ' ছবির জন্য শিল্পী আখ্যা লাভ।

১৮৯৮ — বিশ্ববিদ্যালয় সমাপ্ত। 'কান্তিকলা ও ললিত শিল্পোৎপাদন' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

১৯০০ — প্যারিসে শিল্প শিক্ষার পরিপূরণ।

১৯০১ — শিল্প প্রণোদন সমিতির সেক্রেটারি। ইয়েলেনা ইভানোভ্না শাপোশ্নিকোভার সঙ্গে বিবাহ।

১৯০২ — ১৯০৫ — পিটার্সবুর্গ, মস্কো ও বিদেশে প্রদর্শনী।

১৯০৬ — শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। প্যারিসের শারদীয় সালোঁর সভ্য।

১৯০৯ — রুশ শিল্প অকাদেমির সদস্য।

১৯১০ — নবায়িত 'শিল্প জগত'-এর সভাপতি।

১৯১২ — 'পবিত্র বসন্ত' নিয়ে স্ত্রাভিন্স্কির সঙ্গে কাজ।

১৯১৬ — স্বাস্থ্যের কারণে সপরিবারে কারেলিয়ায় গমন।

১৯১৮ — শিল্প প্রণোদন সমিতির বিদ্যালয়ের কাজকর্ম পুনর্গঠনের জন্য পেত্রগ্রাদে আগমন।

১৯১৯ — ফিনল্যান্ড থেকে লন্ডন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯২০ — ১৯২২ — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী ক্রিয়াকলাপ।

১৯২৩ — মে মাসে নিউ-ইয়র্ক ত্যাগ করে ইউরোপ ঘুরে ভারতবর্ষে যাত্রা।

১৯২৪ — সিকিম ও ভুটানে বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রা।

১৯২৫ — ১৯২৮ — মধ্য এশিয়ায় বৃহৎ অভিযাত্রা; ১৯২৬ সালে মস্কো, আলতাই ও বুরিয়াত স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে পর্যটন।

১৯২৯ — ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ। সাংস্কৃতিক মূল্য রক্ষার রোয়েরিখ চুক্তি প্রকাশ।

১৯৩১ — ১৯৩৩ — 'উরস্বতী' ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। কুলু

উপত্যকার সীমান্তাঞ্চলে অভিযাত্রা।

১৯৩৪ — ১৯৩৫ — মাঞ্চুরিয়া ও চীনে বৃহৎ অভিযাত্রা।

১৯৩৬ — ১৯৪০ — পুর্ণোদ্যমে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীয় ক্রিয়াকলাপ। ১৯৩৬ সাল থেকে ভারতে স্থায়ী বাস।

১৯৪১ — ১৯৪৪ — লাল ফৌজের সাহায্যে প্রদর্শনী ও ছবি বিক্রয়। সংবাদপত্রে দেশাত্মবোধক লেখা। আমেরিকা-রুশ সাংস্কৃতিক সমিতির সম্মানী সভাপতি।

১৯৪৬ — স্বদেশ যাত্রার আয়োজন। সোভিয়েত শিল্পীদের সঙ্গে পত্রালাপ।

১৯৪৭ — ১৩ ডিসেম্বর, জীবনাবসান।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

ন. ক. রোয়েরিখের রচনা

রচনা সংকলন, ১ম খণ্ড, ম., সিতিন প্রকাশনী, ১৯১৪

'মোরির ফুল', বার্লিন, ১৯২১

'আশীর্বাদের পথ', রিগা, ১৯২৪

'এশিয়ার বক্ষস্থল', নিউ-ইয়র্ক, ১৯২৯

'অগ্নিগর্ভ দুর্গ', প্যারিস, ১৯৩২

'পবিত্র প্রহরা', হারবিন, ১৯৩৪

'ভবিষ্যতের তোরণ', রিগা, ১৯৩৬

'অবিনাশী', রিগা, ১৯৩৬

'দিনলিপির পাতা' (২৫টি স্কেচ), 'অক্তিয়াব্‌র', ১৯৫৮, ১০ম সংখ্যা

'দিনলিপির পাতা' (৮টি স্কেচ), 'নাশ সভ্রেমেন্নিক', ১৯৬৭, ৭ম সংখ্যা

'দিনলিপির পাতা' (১৮টি স্কেচ), 'প্রমেতেই', ৮ম খণ্ড, ম., ১৯৭১

'দিনলিপির পাতা' (১১টি স্কেচ), 'কনতেক্‌স্‌ত্‌', ১৯৭৩', ম., ১৯৭৪

নিকোলাই রোয়েরিখ। লিপি। কবিতা। ম., ১৯৭৪

ন. রোয়েরিখ। 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার থেকে', ম., ১৯৭৪

ন. রোয়েরিখ। 'আলতাই-হিমালয়', ম., ১৯৭৪

ন. রোয়েরিখ। 'হৃদয় জ্বালো', 'মলোদায়া গ্‌ভারদিয়া' সংকলন, ম., ১৯৭৫

'Adamant', নিউ-ইয়র্ক, ১৯২৪

'La Joie de l'Art', প্যারিস, ১৯২৮

'Shambala – The Resplendent', নিউ-ইয়র্ক, ১৯৩০

'Altai Himalaya', লণ্ডন, ১৯৩০

'Flame in Chalice', নিউ-ইয়র্ক, ১৯৩০

'Heart of Asia', নিউ-ইয়র্ক, ১৯৩০

'Realm of Light', নিউ-ইয়র্ক, ১৯৩২

'Fiery Stronghold', বস্টোন, ১৯৩৫

'Joy of Art', অমৃতসর, ১৯৪২

'Beautiful Unity', বোম্বাই, ১৯৪২

'Himavat', এলাহাবাদ, ১৯৪৭

Himalayas – The Abode of Light', বোম্বাই, ১৯৪৭

Nicholas Roerich. The Invincible, নিউ-ইয়র্ক, ১৯৭৪

রঙিন প্রতিচিত্র

১॥ পুত্তলিকা। ১৯০১। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

২॥ সিন্ধুপারের অতিথি। ১৯০১। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো।

৩॥ নিপার তীরের স্লাভ। ১৯০৫। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৪॥ অন্তরীক্ষে যুদ্ধ। ১৯১২। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৫॥ আকাশের আদেশ। ১৯১৫। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৬॥ রোগত্রাতা পান্তেলেইমন। ১৯১৬। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো।

৭॥ সন্ত নিকোলাই। ১৯১৬। কিয়েভ রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, কিয়েভ।

৮॥ তিনটি পুলক। ১৯১৬। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৯॥ পবিত্র দ্বীপ। ১৯১৭। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

১০॥ 'পবিত্র বসন্ত'। মঞ্চসজ্জার স্কেচ। ১৯১২। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

১১॥ 'পিয়ের গ্যুন্ট'। মঞ্চসজ্জার স্কেচ। ১৯১২। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

১২॥ 'ভগিনী বিয়াত্রিস'। মঞ্চসজ্জার স্কেচ। ১৯১৪। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

১৩॥ আসন্নের ধ্বজা। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।

১৪॥ লাল ঘোড়া। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।

১৫॥ সুখের ঘোড়া। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।

১৬॥ মৈত্রেয় - বিজয়ী। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।

১৭॥ গুহামহিমা। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।

১৮॥ প্রাচীরের দুর্গ। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।

১৯॥ নির্জনের কানাকানি। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।

২০॥ কাল পুরুষ। ১৯২৭। গোর্কি রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি।

২১॥ আশ্রম - সিংহল, ১৯৩১। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো।

২২॥ চেনরেজি। ১৯৩১। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো।

২৩॥ গুপ্ত-চৌহান। ১৯৩১। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো।

২৪॥ গেসেরের খড়্গ। ১৯৩২। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো।

২৫॥ বিশ্বরক্ষয়িত্রী। ১৯৩৩। বগ্‌দানোভা'র সংগ্রহ।

২৬॥ পরিনির্বাণ। ১৯৩৫—১৯৩৬। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

২৭॥ হুন সমাধি। ১৯৩৫—১৯৩৬। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

২৮॥ পয়গম্বর (হিরা পর্বতে মহম্মদ)। ১৯৩৮। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

২৯॥ উড়ন্ত গালিচা। ১৯৩৯। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৩০॥ মধ্যনিশা। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৩১॥ হিমানীর ধনভান্ডার। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৩২॥ বিজয়ের আলো। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৩৩॥ চাটু গোম্পা। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৩৪॥ প্রতীক্ষমাণা। ১৯৪১। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৩৫॥ ইগরের অভিযান। ১৯৪২। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৩৬॥ বরিস ও গ্লেব। ১৯৪২। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৩৭॥ পবিত্র বসন্ত। ১৯৪৩। নভোসিবির্স্ক আঞ্চলিক চিত্র গ্যালারি, নভোসিবির্স্ক।

৩৮॥ পার্টিজান। ১৯৪৩। বগ্‌দানোভা'র সংগ্রহ।

৩৯॥ নাস্তাসিয়া মিকুলিচ্‌না। ১৯৪৩। নভোসিবির্স্ক আঞ্চলিক চিত্র গ্যালারি, নভোসিবির্স্ক।

৪০॥ পার্বত্য হ্রদ। ১৯৪৪। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৪১॥ কৃষ্ণ। ১৯৪৬। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৪২॥ লাসা। ১৯৪৭। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৪৩॥ গঙ্গায় প্রদীপ। ১৯৪৫। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

৪৪॥ মনে রেখো! ১৯৪৫। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ИБ № 2757

Редактор русского текста *З. В. Федотова*
Контрольный редактор *В. Н. Горонова*
Художник *В. В. Ерёмин*
Художественный редактор *В. С. Камкина*
Технический редактор *В. А. Юрченко*
Корректор *А. К. Кожина*

Сдано в набор 7.02.1978 г.
Подписано в печать 30.07.1979 г.
Формат 70×90 1/16. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Бенгали». Печать высокая.
Условн. печ. л. 11,11+3,8 печ. л. вклеек.
Уч.-изд. л. 16,95. Тираж 1170 экз. Заказ № 126.
Цена 2 руб. 79 коп. Изд. № 24435.

Издательство «Прогресс»
Государственного Комитета
СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва 119021, Зубовский бульвар, 17.

Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография № 7 «Искра революции»
«Союзполиграфпрома» Государственного
Комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва 121019, пер. Аксакова, 13.

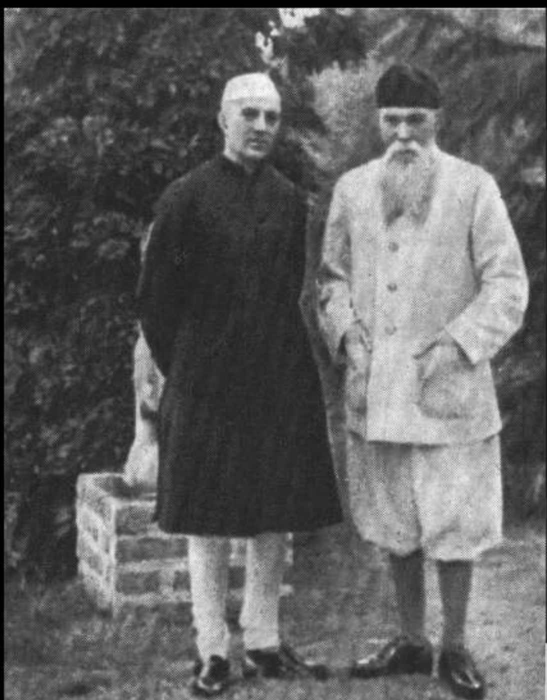
প. বেলিকভ
ভ. কনিয়াজেভা

নিকোলাই রোয়েরিখ

নিকোলাই রোয়েরিখ



কুল্লু'তে ন. রোয়েরিখ
ও জওহরলাল নেহরু



সিন্ধুপারের অতিথি
(একাংশ)

